প্রসঙ্গ: মহাভারত

হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রসঙ্গ : মহাভারত

হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়

শশধর প্রকাশনী
১০/২ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০০৯

প্রকাশিকা :
রমা বন্দ্যোপাধ্যায়
শশধর প্রকাশনী
১০/২ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট
কলিকাতা ৭০০০০৯

প্রথম প্রকাশ : কলিকাতা পুস্তক মেলা ১৯৮৯

প্রচ্ছদ : গৌতম রায়

মুদ্রাকর :
গোপালচন্দ্র পাল
স্টার প্রিন্টিং প্রেস
২১/এ রাধানাথ বোস লেন
কলিকাতা-৭০০০০৬

মূল্য : ৪০'০০ (চল্লিশ টাকা)

Prasanga : Mahabharata
by Dr. Hiranmoy Bandopadhyay
Published by Sasadhar Prakashani
10/2, Ramanath Majumder Street
Calcutta-700 009

Price : Rupees Forty only (40'00)

উৎসর্গ

আমার সহৃদয় শিল্পতত্ত্ব-অনুরাগী
তরুণ সুহৃদ্
ডঃ হীরেন্দ্রনারায়ণ সরকারকে
দিলাম

ভূমিকা

দীর্ঘকাল ধরে বিরাট মূল মহাভারত পড়বার একটি ইচ্ছা পোষণ করতাম। সে ইচ্ছা পূরণ হল প্রাচীন বয়সে অবসর জীবন যাপন কালে। পড়ে মুগ্ধ হলাম। মহাভারতের অনুক্রমনিকা পর্বে বলা হয়েছে যে বিরাট আকার হেতু ভারি হওয়ায় এবং মহৎ ভাবনায় ভূষিত হওয়ায় তার নাম হয়েছে মহাভারত। 'মহত্ত্বাচ্চ ভারতাচ্চ মহাভারত মুচ্যতে'। দ্বিতীয় যুক্তি অবিসম্বাদিত সত্য। তার বিরাটত্ব চাক্ষুষ প্রকটিত। এই বিরাটত্বের কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে মনে অনেক প্রশ্নের উদয় হল। তাদের সন্তোষজনক সমাধানের চেষ্টা না করে মনে শান্তি পাইনি। তারই ফলশ্রুতি এই গ্রন্থখানি।

এইভাবে বহু আয়াসসাধ্য মহাভারত সম্বন্ধে বহু তথ্য আবিষ্কার করে তাদের স্থায়ী রূপ দেবার ইচ্ছাই বর্তমান গ্রন্থের প্রেরণা। অতিরিক্তভাবে মহাভারতের প্রকৃত পরিচয় পেয়ে যে আনন্দ লাভ করেছি তা ভাগ করে ভোগ করবার ইচ্ছা জেগেছে। সে প্রচেষ্টা কতখানি সফল হয়েছে তা বিচারের ভার সহৃদয় পাঠকের ওপর।

শশধর প্রকাশনীর উপদেষ্টা শ্রীঅমিয় কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রকাশনের ভার নিয়ে আমাকে বিশেষ আনন্দ দিয়েছেন। কারণ, তার সমধর্মী আমার রচিত গ্রন্থ 'প্রসঙ্গ রামায়ণ' ও 'যতমত ততপথ' এখান হতেই প্রকাশিত হয়েছিল। মহৎ সাহিত্য প্রচারে তাঁর আগ্রহ দেখে আমি মুগ্ধ হয়েছি।

হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়

১লা বৈশাখ ১৩৯২

বরণীয় কবি স্মরণীয় কবিতা : সম্পাদনা : রমাপ্রসাদ দে	৬.০০
বিংশতি কবিতা : ডিরোজিও অনুবাদ : রমাপ্রসাদ দে ও মঞ্জুষ দাসগুপ্ত	৬.০০
সচিত্র রবিনহুড : আলোক দেব	২০.০০
সপ্তকন্যার কাহিনী : সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়	২০.০০
চারজন এবং একজন ঐ	২২.০০
কার্নিশে যাযাবর দিন : বরুণ চৌধুরী	১৫.০০

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়

প্রাথমিক কথা

১

মহাভারতের প্রকৃতি

আমাদের দেশ ভারতবর্ষ বিশাল দেশ। তার ভৌগলিক প্রকৃতি নানা বৈচিত্র্যে পূর্ণ। বিরাট পর্বত, প্রশস্ত নদী, বিশাল অরণ্য যেমন এখানে পাওয়া যায়, তেমন তা নানা মনোরম ভূখন্ড দ্বারা বিচিত্রিত। দক্ষিণে কন্যাকুমারীর শিলাখন্ড যেখানে তিনটি সমুদ্রের ধারা একত্র মিলিত হয়ে যেমন ভাবগম্ভীর পরিবেশ রচনা করেছে, নীলগিরির কোলে আশ্রিত বিশাল অরণ্য যেমন আমাদের হৃদয়কে স্পর্শ করে, তেমন পুরীর সমুদ্রতটে তরঙ্গের অবিরাম আষ্ফালন আমাদের নয়নকে রঞ্জিত করে। একদিকে রাজস্থানের মরুভূমির রিক্ততা যেমন প্রকট, অপর দিকে গঙ্গা ও সিন্ধুর অববাহিকা তেমন শস্যমন্ডিত হয়ে শ্যামল শোভা ধারণ করে।

কিন্তু ভারতের যে বৈশিষ্ট্য সবার থেকে বেশী দৃষ্টি আকর্ষণ করে তা হলো ভারতের উত্তর সীমায় অতন্দ্র প্রহরীরূপে দন্ডায়মান তুষার কিরীট ভূষিত হিমালয় নামে পর্বতমালা। এই নগাধিরাজকে মহাকবি কালিদাস অকারণে দেবতাত্মা বলেন নি। আকারে যেমন তা বিরাট, ভারতের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণে তেমন তার একটি গৌরবময় ভূমিকা আছে। তা যেমন উত্তর সীমায় প্রহরীর মত দাঁড়িয়ে ভারতের স্বাতন্ত্র্যকে চিহ্নিত করেছে, তেমন আর্য

বর্তের ভূমিকে উর্বর করেছে। মরসুমী-বায়ু-বাহিত মেঘের গতি রোধ করে বারিপাত সুনিশ্চিত করে তা ভারতের মানুষের শস্য উৎপাদনে সহায়তা করেছে। উত্তর ভারতের সকল নদীর তা উৎসভূমি। তাদের জলে পুষ্ট হয়ে অববাহিকা শস্যমন্ডিত হয়েছে। তাদের তটভূমিতে কত জনপদ, কত নগরী গড়ে উঠেছে। হিমালয়ের এই মহৎরূপ, এই কল্যাণরূপ সত্যই তার বিরাটত্বের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে।

ভৌগোলিক ক্ষেত্রে ভারতে হিমালয়ের যে স্থান ভারতীয় সাহিত্য জগতে মহাভারত সেই স্থান অধিকার করে। দুই বিষয়ে হিমালয়ের সহিত তা তুলনীয়। হিমালয়ের বিরাটত্বের সঙ্গে তার বিরাটত্বের তুলনা চলে। পর্বতের মধ্যে হিমালয় নগাধিরাজ বলে স্বীকৃত। সমগ্র সংস্কৃত সাহিত্যে মহাভারত বিরাটতম গ্রন্থ। তার শ্লোক সংখ্যা আশি হাজারের উপরে। আকারে কোনও গ্রন্থ তার ধারে কাছে আসতে পারে না। তুলনায় রামায়ণের শ্লোকসংখ্যা মাত্র ২৪,০০০। পুরাণদের মধ্যে শ্রীমদ্ভাগবত বিরাট গ্রন্থ। তার শ্লোক সংখ্যা ১৮,০০০।

হিমালয়ের কল্যাণরূপের সঙ্গেও অনুরূপ ভাবে মহাভারতের কল্যাণরূপের তুলনা চলে। তার মহৎ চরিত্রগুলি স্মরণাতীত কাল হতে ভারতবাসীর নৈতিক সচেতনতাকে পুষ্ট করেছে। তার নানা বিচিত্র উপাখ্যানগুলি পরবর্তী কালের লেখকদের উপজীব্য হয়েছে। তার মধ্যে আশ্রিত গীতা একটি উচ্চমানের দার্শনিক গ্রন্থ যা সংসারের পথে দিগ্‌ভ্রান্ত মানুষকে ঠিক পথে পরিচালিত করছে।

ঠিক বলতে কি বিশ্বের কোনও প্রাচীন সাহিত্যেই মহাভারতের সঙ্গে বিরাটত্বে তুলনীয় গ্রন্থ মিলবে না। গ্রীক সাহিত্যে রচিত হোমারের দুই মহাকাব্য 'ইলিয়ড' এবং ওডিসি; বড় গ্রন্থ; কিন্তু মহাভারতের পাশে তারা একান্তই ছোট। হিমালয়ের পাশে আল্‌পস পর্বতের মত। লাতিন ভাষায় রচিত ভার্জিলের

ইনীয়ড বিরাট গ্রন্থ; কিন্তু মহাভারতের তুলনায় তা ছোট। ঠিক বলতে কি ইনীয়ড, 'ওডিসি' এবং ইলিয়ডকে' এক সঙ্গে ধরলেও তারা আকারে মহাভারতকে হারাতে পারে না।

মহাভারতের এই বৈশিষ্ট্যের পরিচয় তার আদি পর্বের গোড়াতেই বেশ সুন্দর ভাষায় দেওয়া হয়েছে। সেখানে তার আকারের বিরাটত্ব এবং আলোচ্য বিষয়ের মহত্ত্ব উভয়ের কথাই উল্লেখ করা হয়েছে। প্রাসঙ্গিক শ্লোকটি এই ঃ

তদা প্রভৃতি লোকেঽস্মিন্ মহাভারত উচ্যতে।
মহত্ত্বে চ গুরুত্বে চ ধ্রিয় মানং যতোঽধিকম্ ॥
মহত্ত্বাদ্ ভারত্বাচ্চ মহাভারতমুচ্যতে। (১)

অর্থাৎ, সেইদিন হতে এই গ্রন্থটির নাম মহাভারত হয়েছে; কারণ এতে মহত্ত্ব এবং গুরুত্ব গুণ বেশ বর্তমান। মহত্ত্ব ও ভারত্বের জন্যেই তার মহাভারত নাম। এখানে 'মহত্ত্ব' শব্দটির প্রয়োগ তার আলোচ্য বিষয়ের নীতিগত উৎকর্ষের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। আর ভারত্ব গুণটি তা যে বিরাট হওয়ায় ওজনে বেশী ভারি তার প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

এই দুটি বৈশিষ্ট্যের মধ্যে মহাভারতের আকারে বিরাটত্বই বিশেষ কৌতূহলের বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। তার মহত্ত্ব অবশ্য উপেক্ষার বস্তু নয়; তবে তার বিরাট আকার আমাদের বেশী দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং তাকে ঘিরে নানা প্রশ্ন উদয় হয়।

প্রথমেই প্রশ্ন ওঠে এই বিরাটত্বের কারণ কি? সাধারণত একটি গ্রন্থ গড়ে ওঠে ব্যক্তি বিশেষের রচনাকে ভিত্তি করে। কাজেই তা আকারে বড় হলেও সীমিত হতে বাধ্য। অবশ্য বর্তমান কালে এমন দৃষ্টান্তও দেখা যায় যে একই লেখক একটি বিষয়কে নিয়ে সারাজীবন গবেষণা করে বিরাট গ্রন্থ রচনা করে গেছেন। যেমন আরনোল্ড টয়নবি রচিত পৃথিবীর

১। মহাভারত।১।১।২৭৩-৭৪

ইতিহাস। কিন্তু প্রাচীন কালে তা সম্ভব ছিল না।

অবশ্য সংকলন গ্রন্থও বিরাট আকার ধারণ করতে পারে। বর্তমান কালে প্রকাশিত বিশ্বকোষগুলি তার সুন্দর উদাহরণ। তাতে বহু বিষয় সম্বন্ধে বহু বিশেষজ্ঞের রচনা সংকলিত হয়ে একত্র স্থাপিত হয়ে বিরাট আকার ধারণ করে। সেকালেও যে তার তুলনীয় দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না তা নয়। যেমন ঋগ্‌-বেদ সংহিতা বিভিন্ন ঋষির রচিত নানা দেবতার উদ্দেশে নিবে-দিত প্রার্থনার একটি বিরাট সংকলন গ্রন্থ। এই রচনাগুলিকে সূক্ত বলা হত। এমন এক হাজার সূক্তের সংকলন নিয়ে বিরাট ঋগ্‌বেদ সংহিতা গড়ে উঠেছে।

মহাভারতের কিন্তু এই দুই শ্রেণীর বিরাট আকারের গ্রন্থ হতে প্রকৃতিগত ভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়। তা কোষগ্রন্থও নয়, সংকলনগ্রন্থও নয়। তার পরিকল্পনা একটি কাহিনী রূপে। সাধারণ মানুষের ধারণা তাতে একলক্ষ শ্লোক আছে; কিন্তু তা ঠিক নয়। দেখা যায় আঠারটি পর্বের সব শ্লোক জড়িয়ে হিসাব করলে আশী হাজারের কিছু অধিক শ্লোক পাওয়া যায়। হরিবংশের শ্লোকগুলি যোগ করলে তার শ্লোকসংখ্যা একলক্ষের কাছাকাছি যায়। কিন্তু মহাভারতেই তা খিল অর্থাৎ পরবর্তী কালে সংযুক্ত হয়েছে বিবেচনা করে বর্জিত হয়েছে। তবু মহাভারত বিরাট গ্রন্থ। সেকালের পরিবেশে একজন মাত্র লেখক এমন বিরাট গ্রন্থ রচনা করবার সামর্থ্য রাখতেন না।

সুতরাং অনুমান করতে হয় যে মহাভারত বিরাট আকার ধারণ করেছে দীর্ঘকাল ধরে সংযোজনের ফলে। কিন্তু যে হেতু মহাভারতের আলোচ্য বিষয় একটি কাহিনী, তার যান্ত্রিক ভাবে সংযোজন ঘটেনি; তা ঘটান হয়েছে মূল কাহিনীর সঙ্গে নানা উপকাহিনী বা প্রসঙ্গ সংযুক্ত করে। মহাভারতের মূল কাহিনী কুরুবংশের দুই শাখার মধ্যে বিরোধ হেতু একটি মহাযুদ্ধ, সর্বা-ত্মক ধ্বংস যার পরিণতি। সে ক্ষেত্রে সংযোজন ঘটতে পারে দুই

সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল এক লক্ষ।

এই প্রসঙ্গে মহাভারতের ক্রমবর্দ্ধমান আকারের তিনটি অবস্থায় তিনটি শ্লোকসংখ্যার উল্লেখ পাই। প্রথম অবস্থায় তার শ্লোক সংখ্যা ছিল ৮,৮০০; দ্বিতীয় অবস্থায় তা বর্দ্ধিত হয়ে দাঁড়ায় ২৪,০০০ শ্লোকে এবং পরিণত আকারে শ্লোক সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল একলক্ষ। এই বিবরণটি মহাভারতের আদি পর্বের অন্তর্ভুক্ত অনুক্রমণিকা পর্বে সৌতির মুখে স্থাপিত হয়েছে। তিনি বলছেন,

অষ্টৌ শ্লোক সহস্রানি অষ্টৌ শ্লোক শতানি চ।
অহং বেদ্মি শুকো বেত্তি সঞ্জয়ো বেত্তি বান বা ॥
(১।১।৮১)

অর্থাৎ ব্যাস প্রথম যে মহাভারত রচনা করেন তাতে আট হাজার আটশত শ্লোক ছিল। এই শ্লোকগুলি আমি জানি, শুক জানেন এবং সঞ্জয় হয় ত জানেন।

সৌতি আর ও বলছেন ঃ

উপাখ্যানৈঃ সহ জ্ঞেয়মাদ্যং ভারতমুত্তমম্।
চতুর্বিংশ সাহস্রীং চক্রে ভারত সংহিতাম্ ॥
(১।১।১০২)

অর্থাৎ ব্যাস ভারত সংহিতা নামে প্রথম যে গ্রন্থ রচনা করেন তাতে চব্বিশ হাজার শ্লোক ছিল এবং তাতে উপাখ্যান সংযুক্ত ছিল।

আরও বলা হয়েছে আরও দুটি সংস্করণ ছিল। একটির শ্লোক সংখ্যা ছিল ষাট হাজার (১।১।১০৫) তার পরে আর একটি সংকলন গ্রন্থ ছিল যার শ্লোক সংখ্যা একলক্ষ। সেই সংকলনটি মনুষ্য সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে।

সুতরাং উপরের বিবরণ হতে এই তথ্য পাওয়া যায় যে মহাভারতের কাহিনীর আকার বিভিন্ন সময় পরিবর্দ্ধিত হয়েছিল। প্রথম অবস্থায় তা তুলনায় ছোট ছিল, মোট শ্লোক সংখ্যা ছিল ৮৮০০। দ্বিতীয় অবস্থায় পরিবর্দ্ধিত হওয়ায় তার শ্লোক সংখ্যা ২৪,০০০

ভাবে। প্রথম আলাপ আলোচনা প্রসঙ্গে স্বতন্ত্র আখ্যান তার মধ্যে প্রাসঙ্গিক ভাবে স্থাপিত হতে পারে। দ্বিতীয়ত নানা আলোচনা কাহিনীর কোনও বিশেষ পরিবেশকে অবলম্বন করে স্থাপন করা যেতে পারে। প্রথমটির সুন্দর দৃষ্টান্ত মিলবে রাম সম্পর্কিত উপাখ্যানে। রামায়ণের সমগ্র কাহিনীর একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ মহাভারতে পাওয়া যাবে। সেটি বনপর্বে মার্কণ্ডেয় ঋষির মুখে স্থাপিত হয়েছে। পাণ্ডবগণ যখন পাশাখেলায় পরাজিত হয়ে বনবাসী হয়ে জীবন যাপন করছিলেন, তখন জয়দ্রথ সেখানে গিয়ে পাণ্ডবদের অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে দ্রৌপদীকে হরণ করে নিয়ে যান। সেই প্রসঙ্গে যুধিষ্ঠিরকে প্রবোধ দেবার জন্য মার্কণ্ডেয় তাঁকে রামায়ণ কাহিনী শোনান।

দ্বিতীয়টির উৎকৃষ্ট উদাহরণ ভগবদ্‌গীতা। ভীষ্মপর্বের আঠারটি অধ্যায় জুড়ে এই দার্শনিক তত্ত্বকথা সেখানে স্থাপিত হয়েছে। পরিবেশটি বিস্ময়কর এবং নাটকীয়। কুরুক্ষেত্রে যখন দুই পক্ষের সৈন্য যুদ্ধ আরম্ভ করবার জন্য প্রস্তুত হয় দাঁড়িয়ে আছে, তখন অর্জুন আবিষ্কার করলেন তিনি যাঁদের সহিত যুদ্ধ করতে উদ্যত তাঁরা সকলেই তাঁর আত্মীয় বা বন্ধু। তাঁর মমতাবোধ তখন এমন প্রবল হয়ে উঠল যে তিনি আত্মীয়দের সহিত যুদ্ধ করতে অস্বীকার করলেন। তিনি বললেন, সামান্য পৃথিবীর জন্য কেন ত্রৈলোক্যের আধিপত্য লাভ ঘটলেও তিনি জ্ঞাতিদের সহিত যুদ্ধ করতে পারবেন না। তখন কৃষ্ণ তাঁর মনকে কর্তব্য পালনের জন্য প্রস্তুত করতে যে উপদেশ দিলেন তাই হল ভগবদ্‌গীতা যা সমগ্র মহাভারত গ্রন্থটিকে অপরিসীম মহিমায় মন্ডিত করেছে।

এই ভাবেই মহাভারতের সহিত শত শত বৎসর ধরে সংযোজনের ফলে তার আকারের পরিবর্দ্ধন ঘটেছে। মহাভারতের আদিপর্বের অনুক্রমণিকা হতেই এই প্রতিপাদ্যের সমর্থন মিলবে। সেখানে বলা হয়েছে যে পরিণতিতে উপাখ্যান সহ তার শ্লোক

হয়। তার পরের সংকলনের শ্লোক সংখ্যা ছিল ৬০,০০০।* সবার শেষে পরিণত রূপে তার শ্লোক সংখ্যা দাঁড়ায়ে একলক্ষ।

আরও জানা যায় মহাভারতের বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন নাম ছিল। মহাভারতের ভাষ্যকার নীলকন্ঠ এই কথা বলেছেন। তিনি বলেন প্রথম অবস্থায় তার নাম ছিল 'জয়'। নাম দেখে অনুমান করা যায় তার বর্ণনীয় বিষয় ছিল কুরুবংশের দুই শাখার মধ্যে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ। তাই তার আদিরূপ। তখনই সম্ভবত তার শ্লোক সংখ্যা ছিল ৮,৮০০। পরবর্তী কালে নানা উপাখ্যানের সংযোজনের ফলে তার শ্লোক সংখ্যা বর্দ্ধিত হয়ে ২৪,০০০ হয়। তখনই যে তার নাম হয় ভারত তা উপরে উদ্ধৃত শ্লোকে উল্লিখিত হয়েছে (উপাখ্যানৈঃ জ্ঞেয়মাদ্যং ভারতম্)। তাতে সম্ভবত কুরু-বংশের বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া ছিল! দুষ্যন্তের পুত্র ভরত হতে এই বংশের আরম্ভ বলে কুরুবংশকে ভারতবংশও বলা হত। সম্ভবত এই সংকলনে ভারতবংশের বিবরণ ছিল বলে তার নামে হয় 'ভারত'। ষাট হাজার শ্লোকের সংকলনটির কোনও সন্ধান পাওয়া যায় না। পরিণত রূপে মহাভারতের শ্লোক সংখ্যা একলক্ষ ছিল বলে উল্লিখিত হয়েছে। এও উল্লিখিত হয়েছে যে তখন তার নাম হয় মহাভারত। আমরা মহাভারতের যে প্রাচীন পুঁথিগুলি পাই তাদের শ্লোক সংখ্যা কিন্তু ৮১,০০০ এর কিছু উপরে। তবে যে একটা জনশ্রুতি আছে যে মহাভারতের শ্লোক সংখ্যা একলক্ষ ছিল তা উপরে উদ্ধৃত দ্বিতীয় শ্লোক দ্বারা সমর্থিত হয়। পরিণত রূপে তাতে শুধু নানা আখ্যায়িকা সংযোজিত হয়নি নানা তত্ত্বকথা এবং নানা ধর্মকথাও সংযুক্ত হয়েছিল। দুটি সমগ্র পর্ব ধর্মকথায় নিবেদিত। অবশ্য এখানে ধর্ম অর্থে বুঝতে হবে অনুশাসন বিধি; যেমন রাজধর্ম, মারাধর্ম।

২

বিরাটত্বের কারণ

সুতরাং বিরাটত্বের কারণ হয়ে দাঁড়ায় সংযোজন, অর্থাৎ মূল মহাভারতে যা ছিল তার সহিত পরবর্তী কালে বহু নূতন বিষয় সংযোজিত হয়েছে এবং সেই সংযোজন শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে চলেছে। এমন বিচিত্র ঘটনা বিশ্বের আর কোনও গ্রন্থ সম্বন্ধে বড় একটা ঘটতে দেখা যায় না। গ্রন্থ বিশেষ হয়ত কিছু কিছু অনুপ্রবেশ ঘটে; কিন্তু তার পরিমাণ সীমিত থাকে। মহাভারতের ক্ষেত্রে কিন্তু সংযোজন অংশ মূলের অনেকগুণ বেশী। 'জয়' নামে যখন তা চিহ্নিত ছিল, তখন সম্ভবত তার শ্লোক সংখ্যা ৮,৮০০ ছিল। পরবর্তী কালে যখন তার নাম 'ভারত' হল তখন-যেমন বলা হয়েছে—তার শ্লোক সংখ্যা সম্ভবত ২৪,০০০ ছিল। তখন ভারত বংশের ইতিহাস যেমন সংযুক্ত হয়েছে তেমন নানা উপাখ্যানও সংযুক্ত হয়ে থাকবে। 'মহাভারত' আকারে যখন তার পূর্ণরূপ প্রতিষ্ঠিত হল, তখন অনুক্রমণিকা পর্ব বলে তার শ্লোক সংখ্যা একলক্ষ ছিল। আমাদের হিসাব মতে এই পরিণত রূপে আমরা ৮২,০০০ শ্লোক পাই। অর্থাৎ শেষ অবস্থায় সংযোজনের অংশ মূল অংশের নয়গুণ বেশী হয়ে দাঁড়ায়।

শুরুতে যার শ্লোক সংখ্যা ৮,৮০০ ছিল তার এইভাবে বিরাট আকার লাভ করতে নিশ্চয় দীর্ঘ সময় লেগেছিল। ঐতিহাসিকগণ বলেন কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ একটি ঐতিহাসিক ঘটনা এবং তা সংঘটিত হয়েছিল আনুমানিক খৃষ্টপূর্ব দশম শতাব্দীর মাঝামাঝি। মূল ভারতের লেখক যদি ব্যাস হন তার মূল অংশ রচিত হয়ে থাকবে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের অব্যবহিত পরে। তবে মহাভারত তার পূর্ণাঙ্গ রূপ কখন পায় সে বিষয় বিতর্ক আছে। তবু একটা বিষয় সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়া যায় যে এই সংযোজন প্রক্রিয়া পুরাণ-

গুলির আবির্ভাবের আগে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। বায়ুপুরাণ অষ্টাদশ পুরাণের মধ্যে প্রাচীনতম বলে ধরা হয়। তার রচনা কাল আনুমাণিক খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে স্থাপন করা হয়। কারণ তাতে পশ্চিম ভারতের অন্ধ্র-রাজবংশের কথা উল্লেখ করা হয়েছে এই যুক্তি দেখান হয়। (২) সুতরাং এই সংযোজন প্রক্রিয়া শেষ হতে এক হাজার বছরেরও অধিক সময় লেগেছিল; এমন অনুমান করা অসঙ্গত হবে না।

সুতরাং মহাভারতের এই প্রকৃতির সহিত অন্য কোনও সম শ্রেণীর গ্রন্থের তুলনা চলতে পারে না। তার প্রকৃতি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। অনায়াসে বলা যায় যে মহাভারত শত শত বৎসর ধরে নূতন নূতন লেখকের রচনাকে আকর্ষণ করে আত্মসাৎ করেছে এবং ধীরে ধীরে আকারে বিরাট হয়ে উঠেছে। এ ক্ষেত্রে তার মধ্যে বাহিরের রচনার অনুপ্রবেশ ঘটেছে বললে ভুল হবে; বরং বলা উচিত তা দীর্ঘকাল ধরে নানা রচনা পরিপাক করে নিয়ে পরিবর্দ্ধিত হয়েছে। তা ছিল একটি বিকাশশীল গ্রন্থ। একটি সদ্য-জাত শিশু নিতান্তই ক্ষুদ্র আকৃতি নিয়ে মায়ের কোলে জন্মগ্রহণ করে। তারপর দীর্ঘকাল ধরে ধীরে ধীরে নানা পুষ্টি সংগ্রহ করে বড় হয়ে ওঠে এবং পরিণতিতে বয়স্ক মানুষের আকার পায়। এখানে একটি অনুরূপ প্রক্রিয়া ঘটেছিল।

যা প্রথম অবস্থায় ছিল একটি রাজ পরিবারের দুই শাখার মধ্যে বিবাদ-সংঘটিত সর্বাত্মক সংগ্রামের কাহিনী, তা নানা কালে নানা নূতন রচনা স্বাভাবিক ভাবে আকর্ষণ করে নিজের কলেবর বর্দ্ধিত করেছে। যুদ্ধ কাহিনী যেন কেন্দ্র; তাকে ঘিরে নানা নূতন কথা যুক্ত হয়েছে। প্রথমে সেই বিবাদমান শাখা দুটি যে রাজবংশে জন্মেছিল তার কাহিনী যুক্ত হয়েছে। তারপর সংযুক্ত

২। Cultural Heritage of India V II দ্রষ্টব্য। তার অন্তর্ভুক্ত পুরাণ সম্পর্কিত আলোচনায় রাজেন্দ্র চন্দ্র হাজরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন।

হয়েছে নানা প্রসঙ্গে নানা কাহিনী। তারপর সংযুক্ত হয়েছে নানা পরিস্থিতিকে উপলক্ষ্য করে দার্শনিক তত্ত্বকথা এবং নৈতিক আচরণ বিধির কথা। এমন কি নানা অসংলগ্ন তথ্যও তার মধ্যে স্থান পেয়েছে। অনুশাসন ও শান্তিপর্বে শুধু ধর্মশাস্ত্রের কথা নাই, সেকালে যত প্রকার জ্ঞান ও বিশ্বাস মানুষের কৌতূহলের বিষয় ছিল সবই স্থান পেয়েছে। বর্তমান কালে বিশ্বকোষ যে ভূমিকা পালন করে এই দুটি পর্ব সেই ভূমিকা গ্রহণ করেছে। সুতরাং মহাভারত একটি অনন্যসাধারণ গ্রন্থ। তা এক এবং অদ্বিতীয়।

সুতরাং এক্ষেত্রে স্বভাবতই প্রশ্ন ওঠে, এই যে শত শত বৎসর ধরে সংযোজন প্রক্রিয়া চলল তার কারণ কি। তার প্রকৃতির এই স্বাতন্ত্র্যের কারণ একটা নিশ্চয় ছিল। যে হেতু ভারতের বাহিরে অন্য কোনও প্রাচীন গ্রন্থের ভাগ্যে এই রকম বিরাট পরিমাণ সংযোজন ঘটে নি, তার কারণ ভারতের মানুষের মতিগতির মধ্যেই খুঁজতে হবে।

আমরা জানি প্রাচীন কালে ভারতের মানুষ ইতিহাস সম্বন্ধে বিশেষ সচেতন ছিল না। কবে কি ঘটল বা কে কি কীর্তি রেখে গেল তা স্মৃতির ভান্ডারে ধরে রাখবার ব্যবস্থা করতে প্রাচীন ভারতবাসী বিশেষ উৎসাহ বোধ করত না। তার কারণ বোধ হয় আত্মসচেতনতা, বিশেষ করে অহমিকা বোধের দ্বারা তারা প্রভাবিত হত না। সেই জন্য কোনও গুণী মানুষ নিজে যা সৃষ্টি করেছেন তার সঙ্গে নিজের নাম যুক্ত করে আত্মপ্রচারে তাঁর আগ্রহ ছিল না। এ বিষয়ে তাঁরা একরকম উদাসীন ছিলেন। অথচ দেখা যায় নিজের রুচি বা বিশ্বাস অনুসারে কোনও মত বা তত্ত্ব ভাল লাগলে, তার প্রচারে তাঁরা বিশেষ উৎসাহ দেখাতেন। কোনও কীর্তিমান বংশ শ্রদ্ধা আকর্ষণ করলে তার প্রচারেও সমান উৎসাহ দেখা যেত। অনুরূপ ভাবে কোনও নীতিগর্ভ বাণী বা তত্ত্বকে আবিষ্কার করলে তার প্রবক্তা তার জন্য খ্যাতি আদায়ে উদাসীন থাকলেও তার সংরক্ষণ ও প্রচারের জন্য বিশেষ যত্ন নিতেন।

এই সকল ক্ষেত্রে তাঁদের অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য তাঁরা একটি অভিনব কৌশল অবলম্বন করতেন। সেটি হল কোনও জনপ্রিয় প্রতিষ্ঠিত গ্রন্থের মধ্যে তা অনুপ্রবিষ্ট করে দেওয়া বা বিশেষ মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত একটি বিশেষ শ্রেণীর গ্রন্থ যে নামে পরিচিত সেই নামে তাকে প্রচার করা। কিছু দৃষ্টান্ত স্থাপন করলে এই প্রতিপাদ্যটি বোঝার সুবিধা হবে। তার সমর্থক প্রমাণ হিসাবেও তা কাজ করবে।

এই প্রসঙ্গে উপনিষদ্ শ্রেণীর রচনার কথা প্রথমে উল্লেখ করা যেতে পারে। প্রাচীন উপনিষদ্ গুলির মর্যাদা অত্যন্ত বেশী ছিল। তার দুটি কারণ। প্রথমত সেগুলি বৈদিক সাহিত্যের অঙ্গরূপে গড়ে উঠেছিল। দ্বিতীয়ত তাদের মধ্যে যে গভীর দার্শনিক তত্ত্বকথা আশ্রিত আছে, তা গভীর প্রজ্ঞার পরিচয় দেয়। এই দুই কারণে তাদের আভিজাত্যের তুলনা ছিল না। সেই কারণে উপনিষদ্ নাম দ্বারা চিহ্নিত গ্রন্থের প্রতি মানুষের দৃষ্টি সহজেই আকৃষ্ট হত এবং তাতে স্থাপিত তত্ত্ব শ্রদ্ধা আকর্ষণ করত। কিন্তু প্রাচীন উপনিষদ্‌গুলি বৈদিক সাহিত্যের অঙ্গ হিসাবেই রচিত। বেদের সংহিতা বা ব্রাহ্মণ বা আরণ্যকের তারা অঙ্গীভূত।

এই পরিস্থিতিতে পরবর্তী কালে অনেক দার্শনিক তাঁদের নিজের স্থাপিত তত্ত্বকে স্থায়ী আশ্রয় দিয়ে প্রচারের জন্য তাকে উপনিষদ্ নাম দিয়ে চিহ্নিত করতেন এবং অনেক ক্ষেত্রে তা বৈদিক সাহিত্যের অঙ্গ বলে দাবী করতেন। উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে যে এমন বহু রচনা উপনিষদ্ নামে প্রচারিত হয়েছে যা সন্ন্যাসবাদ বা ভক্তিবাদ প্রচার করে। অথচ আমরা জানি বৈদিক যুগে মানুষের সন্ন্যাসের প্রতি আকর্ষণ ছিল না। প্রাচীন উপনিষদের উপদেশ ছিল 'কুর্বন্নেবেহ কর্মানি জিজীবিষেৎ শতং সমাঃ'। এই সংসারেই কর্মে নিযুক্ত থেকে এক শত বৎসর জীবন যাপন করতে হবে। অনুরূপ ভাবে তখন ভক্তিবাদের বিকাশ হয় নি। উপনিষদের পরিকল্পিত ঈশ্বর নৈর্ব্যক্তিক প্রচ্ছন্ন এবং

সর্বব্যাপী। তিনি একাধারে বিশ্বের নিমিত্ত এবং উপাদান কারণ। সেখানে ভক্তির অবকাশ ছিল না। অথচ আমরা দেখি সন্ন্যাসবাদী উপনিষদ্ আছে, রামের নামে, কৃষ্ণের নামে গরুড়ের নামে উপনিষদ্ আছে। এখানে লক্ষণীয় যে যিনি এই ধরনের গ্রন্থ রচনা করেছেন, তিনি নিজের নাম সম্পূর্ণ গোপন রেখেছেন। তাঁর ইচ্ছা আত্মকীর্তির প্রচার নয়, নিজের স্থাপিত তত্ত্বের প্রচার।

এখানে যে দৃষ্টান্তগুলি স্থাপিত হয়েছে সেগুলিতে কেবল উপনিষদ্ নামের আভিজাত্যের গুণে এই তত্ত্বগুলিকে মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করবার চেষ্টা হয়েছে। তার চেয়েও দুঃসাহসিক প্রচেষ্টার উদাহরণ মিলবে। প্রাচীন উপনিষদ্‌গুলি বৈদিক সাহিত্যের অঙ্গীভূত হওয়ায় তাদের মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে। নূতন তত্ত্বকে প্রাচীন উপনিষদের সহিত সমান মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করতে তাকে শুধু উপনিষদ্ নামে চিহ্নিত করা হয় নি বৈদিক সাহিত্যের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট করবার চেষ্টা হয়েছে। তার ভাল উদাহরণ হল নারায়ণ উপনিষদ্। এই গ্রন্থখানি যে মত প্রচার করে তা শ্রুতির যুগের দর্শনের সহিত সঙ্গতি রক্ষা করে না। এটিতে মহাদেব, গণেশ, নন্দি প্রভৃতির উল্লেখ আছে। স্পষ্টই তা ভক্তিবাদের নিদর্শন। অথচ এটিকে তৈত্তিরীয় আরণ্যকের অন্তর্ভুক্ত বলে দাবী করা হয়েছে। এটি খিল গ্রন্থ বলে স্বকৃত।

মহাভারতের ক্ষেত্রে এই সংযোজন প্রক্রিয়াটি অতি বেশী মাত্রায় ঘটেছে। উপনিষদের ক্ষেত্রে একটি বিশেষ তত্ত্ব বা দেবতাকে প্রতিষ্ঠিত করবার উদ্দেশ্যে, যে গ্রন্থ রচিত হত তাকেই উপনিষদ্ নাম দিয়ে সাধারণত প্রচার করা হত। কোথাও প্রাচীন বৈদিক সাহিত্যে তা অনুপ্রবিষ্ট করা হত। মহাভারতের ক্ষেত্রে কিন্তু নানা প্রকার রচনাকে স্থায়ী আশ্রয় এবং মর্যাদা দেবার উদ্দেশ্যে তাদের সোজাসুজি মহাভারতের সহিত যুক্ত করা হত। কত ধরনের রচনা যে এই ভাবে মহাভারতে সংযোজিত হয়ে তা কলেবর

৩। অনির্বান· তবদমীমাংসা প্রথম খণ্ড, পৃ: ২২১

বর্দ্ধিত করেছে তা ভাবতে অবাক লাগে।

এই প্রসঙ্গে কিছু দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে। উপনিষদের নামে গ্রন্থকে প্রচারিত করার পশ্চাতে যে উদ্দেশ্য ক্রিয়া করেছিল তা ও একটি বিশেষ ক্ষেত্রে মহাভারতে ক্রিয়া করেছিল। তা হল অবতার তত্ত্ব স্থাপন করা। আদিকাব্য রামায়ণেও একই প্রচেষ্টা বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করা যায়। সেখানে কাব্যের নায়ক রামকে বিষ্ণুর অবতাররূপে স্থাপন করবার জন্য নানা অংশ সংযুক্ত হয়েছে। অনুরূপ ভাবে ঐতিহাসিক পুরুষ কৃষ্ণকে বিষ্ণুর অবতার রূপে স্থাপনের জন্য ভীষ্মকাণ্ডের এক বড় অংশ জুড়ে আঠারটি অধ্যায়ে সমাপ্ত গীতা নামে মহৎ গ্রন্থখানি সংযোজিত হয়েছে। তবে এখানে রামায়ণ হতে একটি ভিন্ন রীতি অবলম্বিত হয়েছে। রামায়ণে রাম নিজেকে বিষ্ণুর অবতার বলে দাবী করেন নি; ব্রহ্মা এসে তাঁকে সেই কথা জানিয়েছেন। মহাভারতে কৃষ্ণের মুখেই বলা হয়েছে যে তিনি অবতার হয়ে জন্মগ্রহণ করেছেন। ফলে গীতা চূড়ান্ত মর্যাদার পদে অধিষ্ঠিত হয়েছে। এখানে নারায়ণ উপনিষদ্কে যে উদ্দেশ্যে তৈত্তিরীয় আরণ্যকের সহিত সংযুক্ত করা হয়েছিল, সেই উদ্দেশ্য ক্রিয়া করেছে।

মহাভারতে সংযোজন ঘটেছে আরও নানা প্রকার উদ্দেশ্য সাধনের জন্য। তার কিছু উদাহরণ এখানে স্থাপিত হতে পারে। আমাদের দেশে দুর্গাপূজা রীতি প্রবর্তিত হয়েছিল ভক্তিবাদ প্রতিষ্ঠিত হবার পর পুরাণের যুগে। অথচ দেখা যায় তিনটি বিভিন্ন উপলক্ষ্যে দুর্গাপূজার ব্যবস্থার মহাভারতে উল্লিখিত হয়েছে। এগুলি স্পষ্টতই সংযোজন এবং উদ্দেখ্য হল দুর্গাপূজারীতিকে মর্যাদা দিয়ে জনপ্রিয় করা।

কোনও অবর জাতির কন্যার উচ্চজাতির পুরুষের সহিত বিবাহ ঘটলে বংশের মর্যাদার হানির আশংকা ঘটে। প্রতিলোম বিবাহ প্রাচীন কালে অনুমোদিত রীতি হওয়া সত্ত্বেও মর্যাদা হানির আশংকা থেকে যায়। মহাভারতের কুরুবংশের এইরূপ

মর্যাদা হানির আশঙ্কা ঘটেছিল। কারণ বিচিত্রবীর্যের পিতা শান্তনু দাসরাজ কন্যা সত্যবতীকে বিবাহ করেছিলেন। মনে হয় সেই কলঙ্কমোচনের জন্যই মহাভারতে উপরিচর রাজার কাহিনী সংযুক্ত হয়েছে। এই কাহিনীতে বাধাহীন কল্পনার এমন বিলাস দেখা যায় যা পৌরাণিক সাহিত্যে সুলভ। তাতে বলা হয়েছে উপরিচর রাজা আকাশ পথে বিচরণের সময় তাঁর বীর্য নদীতে নিক্ষিপ্ত হয়ে মৎস্যরূপী এক অভিশপ্তা অপ্সরার গর্ভাধান ঘটায় তিনিই সত্যবতীকে প্রসব করেন এবং দাসরাজ তাঁকে পালন করেন। অর্থাৎ সত্যবতীকে এইভাবে প্রকৃত ক্ষত্রিয় রাজ কন্যার মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করা হয়েছে। বৌদ্ধ জাতকের কাহিনীতে শাক্যবংশকে মর্যাদায় উন্নীত করবার উদ্দেশ্যে একটি অনুরূপ দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। সে কাহিনীতে প্রচার করা হয়েছে যে ইক্ষ্বাকু বংশোদ্ভব ভ্রাতা ও ভগিনীর বিবাহ হতে শাক্যবংশের উৎপত্তি হয়েছে।

সেকালে দর্শন ও ধর্ম ব্যতীত যাকে বিশুদ্ধ রস সাহিত্য বলা হয় তাও যে রচিত হত তার প্রমাণ মহাভারতে পাওয়া যায়। তার কারণ সহজেই অনুমান করা যায়। যে লেখক রসসাহিত্য রচনা করতেন তার স্থায়িত্বের জন্য তিনি তাকে বিভিন্ন সূত্রে এই বিরাট গ্রন্থের আশ্রয়ে স্থাপন করতেন। তাই দেখা যায় নানা মনোরম সাহিত্যিকগুণ—সম্পন্ন কাহিনী মহাভারতে সংযুক্ত হয়েছে। বর্তমান প্রসঙ্গে তাদের মধ্যে যে দুটি সর্বাধিক প্রসিদ্ধ তাদের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। সাবিত্রী ও সত্যবান এবং নল ও দময়ন্তীর কাহিনী বিশ্ব সাহিত্যে স্থান পাবার অধিকার রাখে। উভয়েই মহাভারতের বনপর্বে স্থাপিত হয়েছে। অনুরূপভাবে দেখা যায় সাধারণ বুদ্ধি পরিস্ফুট করবার জন্যও তাতে কিছু কাহিনী সন্নিবিষ্ট হয়েছে। পরবর্তী কালে এই ধরনের কাহিনী প্রচার করে 'পঞ্চতন্ত্র' ও 'হিতোপদেশ' বিশ্বব্যাপী খ্যাতি অর্জন করেছিল। 'হিতোপদেশে' অনাগতবিধাতা, প্রত্যুৎপন্নমতি ও যদ্ভবিষ্য নামে তিন মাছের কাহিনী আমরা পড়েছি। অবাক লাগে দেখতে যে

এই কাহিনীটি মহাভারতের শান্তিপর্বে সংযুক্ত হয়েছে। অনুমান করা যায় উদ্দেশ্য ছিল কাহিনীটি যেন মহাভারতের মত অমর গ্রন্থের অঙ্গাশ্রিত হয়ে স্থায়ীভাবে রক্ষিত হয়। এই শ্রেণীর কাহিনী গুলি সাহিত্য গুণে সমৃদ্ধ ছিল বলে দেখা যায় উত্তরকালে সেগুলি সাহিত্যিকদের উপজীব্যের ভূমিকা গ্রহণ করেছিল।

একই উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে মহাভারতের নানা প্রজ্ঞাবচন স্থাপিত হয়েছে। বিরাট বনপর্বে মার্কেণ্ডেয় মুনির মুখে কত যে নীতিগর্ভ কাহিনী ও প্রজ্ঞাবচন স্থাপিত হয়েছে, তা দেখে বিস্মিত হতে হয়। মহাভারতের দুটি সমগ্র পর্ব, কেবল এই শ্রেণীর রচনায় সম্পূর্ণভাবে নিবেদিত। তাদের মূল কাহিনীর সহিত আদৌ যোগ নাই। এই দুটি পর্ব হল শান্তিপর্ব ও অনুশাসন পর্ব। শান্তিপর্ব একাই একটি বিরাট গ্রন্থ। তাকে সেকালের বিশ্বকোষ বলে বর্ণনা করা যায়। তাতে যেমন রাজধর্ম ও আপদ্‌ধর্মের ব্যাখ্যা আছে, রাজনীতির কথা আছে, তেমন দার্শনিক তত্ত্ব আছে, তেমন নানা প্রজ্ঞাবচন আছে। অনুশাসন পর্ব যেন তার পরিপূরক। সেখানে নানা ধরনের প্রশ্নোত্তর আছে।

সর্বশেষে ঐতিহাসিক পুরুষ কৃষ্ণকে বিষ্ণুর অবতার পদে স্থাপিত করবার উদ্দেশ্যে নানা সংযোজন আছে, তাদের মধ্যে সর্বাধিক বিখ্যাত সংযোজন হল ভীষ্ম পর্বে গীতার সংযোজন। তা এমন মূল্যবান গ্রন্থ যে হিন্দুর ধর্মশাস্ত্রের অন্যতম প্রধান ধর্ম-গ্রন্থের স্থানে অধিষ্ঠিত হয়েছে।

এই সকল ক্ষেত্রে যা বিশেষ লক্ষ্য করবার বিষয় তা হল যাঁরা এই সংযোজনগুলি মহাভারতে স্থাপন করেছেন, তাঁরা নিজেদের নাম প্রচারের জন্য কোনও ব্যবস্থা রাখেন নি। বিরাট মহাভারতের সকল রচনাই ব্যাসদেবের রচনা বলে প্রচারিত। পরবর্তী কালে পদাবলী সাহিত্যে বা গাথায় লেখকদের নাম ভনিতায় উল্লেখ থাকত। এখানে তার অনুরূপ কোনও ব্যবস্থা অবলম্বিত হয় নি।

তার সম্ভবত দুটি কারণ আছে। এক হতে পারে নাম প্রচারে তারা সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন; তাঁদের মূল লক্ষ্য তাঁদের রচনা বা প্রতিপাদিত তত্ত্ব স্থায়ী ভাবে রক্ষিত হক এবং পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করুক। দ্বিতীয়ত, এমনও হতে পারে তাঁরা নিজেদের নাম রচনার সঙ্গে সংযুক্ত রাখবার ইচ্ছা পোষণ করতেন; কিন্তু সেকালের পরিবেশে তাঁদের সে ইচ্ছা পূরণের সুযোগ ছিল না। যে বিখ্যাত গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত করে তাঁদের রচনাকে তারা কালজয়ী করতে চাইতেন তা কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ব্যাসের নামে প্রচারিত। সুতরাং নিজেদের নাম উল্লেখ করবার সুযোগ ছিল না। তখন তাঁরা নাম না প্রচার হক, রচনা স্থায়ী ভাবে রক্ষিত হক, এই চাইতেন।

৩

সংযোজন ক্রিয়া থামল কেন

এখন প্রশ্ন হল এই সংযোজন প্রক্রিয়া থামল কেন? যে রীতিতে মহাভারত সহস্রাধিক বৎসর ধরে নূতন নূতন রচনা আত্মসাৎ করে পরিবর্দ্ধিত হয়ে এসেছে, তার ওপর হঠাৎ ছেদ পড়ল কেন? এই প্রশ্নের একটি মীমাংসার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। সৌভাগ্যক্রমে সে মীমাংসার সূত্র মহাভারতের মধ্যেই মিলবে।

সেই সূত্রটি পাওয়া যাবে মহাভারতের আদিপর্বের প্রথম অধ্যায় অনুক্রমণিকা পর্ব ও দ্বিতীয় অধ্যায় পর্বসংগ্রহ পর্বে। (৪) এখানেই মহাভারতে সংযোজনের সাহায্যে পরিবর্দ্ধন প্রক্রিয়া

৪। মহাভারতের আলোচ্য বিষয়ের বিন্যাসে কিছু অসঙ্গতি লক্ষ্য করা যায়। দেখা যায় কাহিনীর প্রকৃতিগত বিভাগ অনুসারে তাকে প্রথমে আঠারটি পর্বে ভাগ করা হয়েছে। প্রতিপর্বের অনেকগুলি অধ্যায় আছে। আবার ভিন্ন রীতির ভিত্তিতে এই বিন্যাসের ওপর মহাভারতকে একশত পর্বে বিন্যস্ত করা হয়েছে এবং অধ্যায়গুলিকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ফলে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে। এই দ্বিতীয় শ্রেণীর পর্বকে 'উপপর্ব' বলে চিহ্নিত করলে এই অসঙ্গতি ঘটত না। ফলে এই উপপর্বগুলি কোথাও একটি অধ্যায়ে সীমিত, কোথাও একাধিক অধ্যায়ে ব্যাপ্ত।

থামল কেন, তার উত্তর পাওয়া যাবে। অনুক্রমণিকা পর্বে সৌতি যা বলেছেন তা হতে দেখা যায় মহাভারতের আয়তন বিভিন্ন কালে বিভিন্ন প্রকার ছিল। তিন অবস্থায় তার শ্লোক সংখ্যা তিন রকমের ছিল বলে উল্লেখ করেছেন। প্রথমে উল্লেখ আছে তার শ্লোক সংখ্যা ৮৮০০ ছিল। তারপর বলা হয়েছে উপাখ্যান গুলির সহিত তা যুক্ত হয়ে তার শ্লোক সংখ্যা দাঁড়ায় ২৪,০০০। শেষে তার শ্লোক সংখ্যা ছিল একলক্ষ। সুতরাং বিভিন্ন অবস্থায় যে ক্রমশ তার কলেবর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছিল; তার উল্লেখ এখানে পাওয়া যায়। লক্ষ্য করা যেতে পারে যে উপাখ্যানগুলির সহিত সংযুক্ত হয়ে মহাভারতের শ্লোক সংখ্যা ২৪,০০০ এ দাঁড়িয়েছিল। তার তাৎপর্য এই যে প্রথম অবস্থায় যখন তার শ্লোকসংখ্যা ৮৮০০ ছিল, তখন ভারত বংশের মূল কাহিনীর মধ্যে তা সীমিত ছিল। কাজেই কালক্রমে সংযোজনের সাহায্যে যে ক্রমে তা পরিবর্দ্ধিত হয়েছিল এই প্রতিপাদ্য এখানে সমর্থিত হয়। তাই দেখি যে এই অনুক্রমণিকা পর্বেই উল্লেখ আছে যে সংযোজনের ফলে ভারি হয়ে গেল বলে তার নাম মহাভারত হয়েছিল। 'মহত্ত্বাদ্ ভারতাচ্চ মহাভার তুমুচ্যতে'। বিষয়ের মহত্ত্ব হেতু এবং ভার হেতু তাকে তাকে মহাভারত বলে।

এই সংযোজন প্রক্রিয়া থামল কেন, তার উত্তর পাওয়া যায় দ্বিতীয় অধ্যায়ে। সে অধ্যায়ের নাম দেওয়া হয়েছে পর্বসংগ্রহ পর্ব। তার কারণ আছে। এখানে বিরাট মহাভারতের সকল আলোচ্য বিষয় পর্ব অনুসারে ভাগ করা হয়েছে। এই পর্ব শব্দটির ব্যবহার দুই অর্থে করা হয়েছে বলে তার একটি বিস্তারিত পরিচয়ের প্রয়োজন আছে। মহাভারতের পর্ববিন্যাসে দুইভাবে করা হয়েছে। একটি পর্ববিন্যাসে অনুসারে সমগ্র মহাভারতের আলোচ্য বিষয় একশতটি পর্বে ভাগ করা হয়েছে। অন্য বিন্যাসে একই বিষয় আঠার পর্বে ভাগ করা হয়েছে। এইভাবে আমরা প্রথমত মহাভারতের আঠারটি পর্ব পাই। এই বিন্যাস পাঠক

সমাজে বিশেষ পরিচিত। সংখ্যায় অল্প হওয়ায় এই পর্বগুলি অন্য শ্রেণীর পর্ব হতে বেশী ব্যাপক। সুতরাং দেখা যায় আদি পর্ব, সভাপর্ব, বনপর্ব, প্রভৃতি আঠারটি পর্বই মূলপর্ব হয়ে দাঁড়ায় এবং অন্য বিন্যাসের যে একশতটি পর্ব আছে সেগুলি তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। সুতরাং তাদের নিজস্ব প্রকৃতি অনুসারে তাদের উপপর্ব বলা উচিত। এই উপপর্বেরই অন্তভুক্ত আবার এক বা একাধিক অধ্যায় আছে। বিষয়ের দৈর্ঘ্য অনুসারে তার অধ্যায় সংখ্যা এক বা বহু হয়ে থাকে। যেমন অনুক্রমণিকা পর্বের আলোচনা সীমিত হওয়ায় তার অন্তভুক্ত একটি মাত্র অধ্যায় আছে। আবার অষ্টাদশ অধ্যায় জুড়ে গীতা পর্বটি ভীষ্ম পর্বের অন্তর্ভুক্ত। এই ভাবে পর্বকে দুই অর্থে ব্যবহার করার ফলে বিভ্রান্তি ঘটে থাকে। অষ্টাদশ পর্ব তাদের অন্তর্ভুক্ত অধ্যায়ের ভিত্তিতে বিন্যাসের আলোচনা এ ক্ষেত্রে বেশী যুক্তিযুক্ত।

পর্বসংগ্রহ পর্বে, অর্থাৎ আদিপর্বের দ্বিতীয় অধ্যায়ে সমগ্র মহাভারতের সূচীপত্র দেওয়া হয়েছে অষ্টাদশ পর্বের ভিত্তিতে। সেখানে আঠারটি পর্বের প্রতিটির শ্লোক সংখ্যা উল্লিখিত হয়েছে। অতিরিক্ত ভাবে যে একশত পর্ব (প্রকৃতপক্ষে উপপর্ব) তাদের অন্তর্ভুক্ত আছে। তাদের প্রত্যেকের আলোচ্য বিষয় কি তা সুস্পষ্ট ভাবে বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং তার সাহায্যে এই উপপর্বগুলির আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায়। সুতরাং এইভাবে এই সূচীপত্রের সাহায্যে মহাভারতের আলোচ্য বিষয় কি ছিল এবং প্রত্যেকটি পর্বের জন্য কতগুলি শ্লোক বরাদ্দ হয়েছিল তার হিসাব পাওয়া যায়। এই আলোচনা বেশ বিস্তারিত। একশতটি পর্বের (উপপর্বের) যেমন আলোচ্য বিষয় কি তার পরিচয় এতে মিলবে, তেমন তাদের প্রত্যেকটির অন্তর্ভুক্ত কতগুলি অধ্যায় আছে এবং সব অধ্যায়গুলি মিলে কতগুলি শ্লোক আছে, তাও পর্বসংগ্রহ পর্বে উল্লিখিত হয়েছে।

এই পরিস্থিতিতে সহজেই অনুমান করা যায় যে মহাভারতের

বিকাশের শেষ পর্যায়ে কোনও সংকলক তার একটি সামগ্রিক পরিচয় পাঠকের নিকট স্থাপন করতে চেয়েছিলেন। সম্ভবত তিনি আলোচ্য বিষয়েরও বিন্যাস করে দিয়েছিলেন। সে যাই হক, এই ব্যবস্থার তাৎপর্য ছিল সুদূরপ্রসারী। তার ফলে মহাভারতের আকৃতি ও আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে একটি সুস্পষ্ট সীমা টেনে দেওয়া হয়েছিল। তার তাৎপর্য কি দাঁড়াল তা বুঝবার সুবিধার জন্য একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করা যেতে পারে। একটি গ্রন্থের আলোচ্য বিষয় যদি বিভিন্ন অধ্যায়ে ভাগ করা হয় এবং প্রতি অধ্যায়ের অন্তর্ভুক্ত অনুচ্ছেদের বিষয়ও উল্লিখিত হয় এবং প্রতি অনুচ্ছেদে নিবেদিত পত্র সংখ্যার ও যদি উল্লেখ থাকে, তা হলে পর্বসংগ্রহ পর্ব যে অবস্থা সৃষ্টি করল তার প্রায় সমস্থানীয় পরিস্থিতি মিলবে। তা হলে আর তাতে নূতন রচনার অনুপ্রবেশ ঘটানর অবকাশ মিলবে না। বিশেষ করে শ্লোক সংখ্যা নির্দিষ্ট করে দেওয়ায় সংযোজনের পথ একেবারে রুদ্ধ হয়ে যাবে। গ্রন্থটি একটি স্থায়ী অপরিবর্তনীয় রূপ পাবে।

পর্বসংগ্রহ পর্ব রচিত হবার ফলে মহাভারতের ক্ষেত্রে সেই অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল। মহাভারতের আয়তন এবং আলোচ্য বিষয় সুস্পষ্ট ভাবে নির্দিষ্ট হয়ে গিয়েছিল। সুতরাং নূতন সংযোজনের আর অবকাশ ছিল না। তাই সংযোজন বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। তাই মহাভারতকে আমরা বর্তমানে যে আকারে পাই সেই আকারে তা সীমাবদ্ধ থেকে গিয়েছিল। তা একটি স্থায়ী অপরিবর্তনীয় রূপ পেয়েছিল।

এর পরেও যে সংযোজনের চেষ্টা হয় নি, তা নয়। তার সুন্দর দৃষ্টান্ত হল হরিবংশ নামক গ্রন্থ। হরিবংশের আলোচ্য বিষয় হল কৃষ্ণ যে বংশ জন্মগ্রহণ করে তাকে মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেছিলেন সেই বৃষ্ণি বংশের কাহিনী। মহাভারতের ষোড়শ পর্বে এই বংশের কাহিনীর একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস আছে। তার নাম মৌষল পর্ব; কারণ মুষল হতেই এই বংশের ধ্বংস

সাধিত হয়। তা সত্ত্বেও যে হরিবংশকে মহাভারতের অন্তর্ভুক্ত করবার চেষ্টা হয়েছিল তার প্রমাণ মহাভারতেই পাওয়া যায় পর্বসংগ্রহ পর্বের শেষভাগে উল্লেখ আছে যে হরিবংশ পরবর্তী কালে মহাভারতের অনুপ্রবিষ্ট হয়েছিল; সুতরাং তা খিল, অর্থাৎ মূল মহাভারতের অংশ নয়। সেই কারণে তা পরিত্যক্ত হয়েছে। এই প্রসঙ্গে আরও বলা হয়েছে অষ্টাদশ পর্বের অতিরিক্ত আরও দুটি পর্ব মহাভারতের সহিত যুক্তহয়েছিল; হরিবংশ ও ভবিষ্য। তাদের প্রথমটিতে দশ হাজার শ্লোক এবং দ্বিতীয়টিতে দুহাজার শ্লোক ছিল। (৬) সেই কারণে এই দুটি পর্ব মহাভারত হতে বাদ দেওয়া হয়। তারপর আর এই ধরনের চেষ্টা হয় নি বলেই মনে হয়।

এই প্রসঙ্গে একটি রহস্যময় বিষয়ের উল্লেখ করা যেতে পারে। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে মহাভারতে ১৮ সংখ্যাটির ছড়াছড়ি। অষ্টাদশ পর্ব নিয়ে মহাভারত। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে আঠার অক্ষৌহিনী সৈন্য যোগ দিয়েছিল। তার আরম্ভে ভীষ্মপর্বে শ্রীকৃষ্ণ-মুখ-নিঃসৃত ভগবদ্‌গীতা স্থাপিত। তাও আঠারটি অধ্যায়ে সমাপ্ত। আঠার অক্ষৌহিনী সৈন্য ধ্বংস করতে আঠার দিন ধরে যুদ্ধ চলেছিল। আঠার অক্ষৌহিনীর সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করতেই কি মহাভারতের অষ্টাদশ পর্ব এবং গীতার আঠার অধ্যায়? তার-পর এল পুরাণ। মহাভারতের অনুসরণে তাদের ও কি সংখ্যা সীমিত হল অষ্টাদশ পুরাণে? আর সেই কারণেই কি পরে যে উপপুরাণগুলি রচিত হল তাদেরও সংখ্যা সীমিত হল আঠারতে?

৪

মহাভারতের রচনাকালের ব্যাপ্তি

উপরের আলোচনা হতে একটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে গেছে যে মহাভারত একটি স্বতন্ত্র প্রকৃতির গ্রন্থ। তার আদিরূপ আকারে

৬। খিলেষু হরিবংশ স্ক ভবিষ্যঞ্চ প্রকীর্তিতম্।
দশ শ্লোক সহস্রাণি বিংশ শ্লোক শতানি চ ॥ "আদি" ২। ৩৭৯

ছোট ছিল এবং সম্ভবত ভারতবংশের দুই শাখার বিবাদের পরিণতিতে যে যুদ্ধ হয় তাই ছিল তার বর্ণনীয় বিষয়। পরবর্তী কালে শত শত বৎসর ধরে তাকে আশ্রয় করে সংযোজনের পর সংযোজন যুক্ত হয়ে তার পরিণত রূপটি তা ধারণ করেছে। সুতরাং স্বভাবতই প্রশ্ন ওঠে এই সংযোজন ক্রিয়া কত দিন ধরে চলেছিল।

আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি যে মহাভারতের তিন অবস্থায় তিন নাম ছিল। কেবল কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের কারণ এবং যুদ্ধের বর্ণনায় যখন তা সীমাবদ্ধ ছিল তখন তার নাম ছিল জয়। আখ্যান বর্জিত আকারে তার যে পরিবর্দ্ধিত রূপ হল, তার নাম হল ভারতকথা বা ভারতেতিহাস বা শুধু ভারত। অর্থাৎ দুষ্যন্তের পুত্র ভরতের বংশের কাহিনী তার অতিরিক্ত বর্ণনীয় বিষয় হিসাবে তার সহিত যুক্ত হয়েছিল। পরিশেষে তা যে নানা আখ্যান, ধর্ম-কথা, নীতিকথা, সাহিত্যিকগুণ সমৃদ্ধ কাহিনী সংযোজনের ফলে আকারে ভারি হয়ে উঠলে তার সঙ্গতি রক্ষা করে তার নাম রাখা হল মহাভারত।

এই প্রসঙ্গে প্রশ্ন ওঠে মহাভারতের কোন অংশ কোন কালে রচিত তার সম্বন্ধে আলোকপাত করে এমন কোন ও তথ্য পাওয়া যায় কিনা। মনে হয় সুনির্দিষ্ট ভাবে না হলেও খানিকটা পাওয়া যায়। একটি উপমা প্রয়োগ করলে বিষয়টি বুঝবার সুবিধা হবে। মহিলাদের দেহের ভূষণ হিসাবে আবহমানকাল অলংকার ব্যবহারের রীতি আছে। কিন্তু কালাতিপাত হেতু রুচির পরি-বর্তন হয় এবং তার সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে অলংকারের রূপের পরিবর্তন ঘটে। হয়ত বিশেষ শ্রেণীর অলংকার আর ব্যবহার হয় না; তা বর্জিত হয় বা তার স্থানে ভিন্নরুচির অলংকার উদ্ভাবিত হয়। আবার যেগুলি থেকে যায় তাদের আকৃতির পরিবর্তন ঘটে। এই নিয়মের ভিত্তিতে বাঙালী সমাজে ব্যবহৃত অলংকারগুলিকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। সুদূর অতীতে

ভারি ভারি গহনা ব্যবহৃত হত এবং দেহের নানা অঙ্গের শোভা বর্দ্ধন করতে নানা শ্রেণীর অলংকার ব্যবহৃত হত। কোমরের জন্য বিছা বা হাতের ঊর্ধ্বাংশের জন্য তাগা। অদূর অতীতে এই শ্রেণীর অলংকারের ব্যবহার উঠে যায়। যেগুলি থাকল সেগুলিতে ওজনের থেকে কারুকার্যের প্রতি নজর দেওয়া হত বেশী। বর্তমান কালে অলংকারের ব্যবহার অনেক কমে গেছে। নূতন শ্রেণীর অলংকারও এসেছে যেমন হাতঘাড়ি।

এখন কোনও প্রাচীন বংশের গহনার সিন্ধুক খুলে তার মধ্যে রক্ষিত গহনাগুলি যদি বাহির করা হয়, তা হলে দেখা যাবে, এই বিভিন্ন যুগের বিভিন্ন রুচির গহনাগুলি একসঙ্গে মিশে রয়েছে। কিন্তু তাদের আকৃতি ও প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য অনু-সারে যদি তাদের পৃথক করে নেওয়া যায়, তা হলে অনুমান করা যায় কোন গহনাগুলি ঠাকুরমার যুগের, কোনগুলি মায়ের যুগের এবং কোনগুলি আধুনিকা নাতিনীর যুগের। মহাভারতের কোন অংশ কোন সময়ে সংযোজিত হয়েছিল সে প্রশ্নের ও অনুরূপ রীতির প্রয়োগে মীমাংসা করে, নেওয়া খানিক পরিমাণে সম্ভব।

তার প্রস্তুতি হিসাবে তার আগে একটি কাজ শেষ করে নিতে হবে। আমরা লক্ষ্য করেছি যে মহাভারতের সংযোজন প্রক্রিয়ার ভিত্তিতে বিকাশ ঘটেছিল কয়েক শতাব্দী ধরে। এই সুদীর্ঘ কালের মধ্যে ভারতীয় চিন্তা, জীবনযাপন রীতি, সমাজব্যবস্থা প্রভৃতির পরিবর্তন ঘটা স্বাভাবিক এবং ঘটেও ছিল। এই সং-যোজন প্রক্রিয়ার ব্যাপ্তির বর্তমান আলোচনা প্রসঙ্গে বিষয়টির একটি সংক্ষিপ্ত ধারণা করে নিতে পারি। মহাভারতের অন্যতম নায়ক কৃষ্ণের উল্লেখ আমরা ছান্দোগ্য উপনিষদে পাই। (৭) তাঁকে সেখানে দেবকীপুত্র বলে উল্লেখ করা হয়েছে। সুতরাং তিনি মহাভারতের চরিত্র কৃষ্ণ না হয়ে যান না। সুতরাং ধরা যায় মহাভারতের রচনার আরম্ভ তার অব্যবহিত পরে সুরু হয়েছিল।

৭। ছান্দোগ্য। ৩। ১৭। ৬

ছান্দোগ্য উপনিষদ প্রাচীন উপনিষদগুলির অন্যতম। তাদের রচনা কাল খৃষ্টপূর্ব দশম শতাব্দী বলে অনুমান করা হয়। অপর দিকে পুরাণগুলি লিখিত হবার পূর্ব পর্যন্ত মহাভারতের সংযোজন প্রক্রিয়া অক্ষুণ্ণ ছিল বলে আমরা প্রমাণ পেয়েছি। বিশেষজ্ঞের মতে বায়ুপুরাণ হল পুরাণগুলির মধ্যে প্রাচীনতম এবং তার রচনাকাল খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দী বলে ধরা হয়েছে। সুতরাং ধরা যেতে পারে এই দীর্ঘকাল স্থায়ী সংযোজনের ব্যাপ্তি বারো শত বৎসর।

আমরা দেখব যে এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে ভারতীয় সমাজরীতি এবং আধ্যাত্মিক চিন্তার রূপ দুবার পরিবর্তিত হয়েছিল। ফলে আমরা সমাজ বিকাশের তিনটি স্তর পাই। বর্তমান প্রসঙ্গে সেগুলি খুব সংক্ষেপে উল্লেখ করা যেতে পারে। খৃষ্টপূর্ব দশম শতাব্দীকে বৈদিক যুগ বা শ্রুতির যুগ বলতে পারি। তখন সমাজ বর্ণ ও আশ্রমধর্ম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। অর্থাৎ সমাজের মানুষকে কর্মের প্রকৃতি অনুসারে চারটি বর্ণে ভাগ করা হত। তখন ধর্ম বা উপাসনা রীতি ছিল যজ্ঞানুষ্ঠান। দ্বিতীয় অবস্থাটি পাই মনুর ধর্মশাস্ত্রে উল্লিখিত সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে। তখনও বর্ণাশ্রমধর্ম প্রচলিত ছিল, তবে কিছু পরিবর্তন এসেছে। মানুষের আচরণ সম্বন্ধে নানা বিধিনিষেধ আরোপিত হয়েছে। তার দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হল তখন সমাজে নারীর স্থান অবনমিত হয়েছে। পূর্বে পুরুষ জাতির সঙ্গে নারী সমান অধিকার ভোগ করত। তা হতে তাকে বঞ্চিত করা হয়েছে। বলা হয়েছে 'ন নারী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি। একে ধর্মশাস্ত্রের যুগ বলতে পারি। তৃতীয় অবস্থায় বৈদিক যজ্ঞানুষ্ঠানের পরিবর্তে নানা পৌরাণিক দেবতা এসেছেন এবং তাঁদের কল্পিত মূর্তির পূজাই আনুষ্ঠানিক ধর্মের স্থান নিয়েছে। একে আমরা পুরাণের যুগ বলতে পারি।

আমরা লক্ষ্য করব যে বিরাট মহাভারতের মধ্যে নানা সূত্রে, নানাভাবে এই তিনটি বিভিন্ন স্তরের চিন্তা, সমাজরীতি এবং

দেবতাদের সম্বন্ধে ধারণ, নানাভাবে পরস্পরের সহিত মিশে একাকার হয়ে গেছে। মূল ঘটনাটি ঘটেছিল শ্রুতির যুগে। সেই যুগের পরিচয় যেমন নানা সূত্রে পাই, তেমন ধর্মশাস্ত্রের যুগের চিন্তা বা সমাজরীতি এবং পৌরাণিক যুগের ভাবনা ও উপাসনা-রীতিও পাই। বিষয়টির যথাস্থানে বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন হবে। বর্তমান প্রসঙ্গে কয়েকটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করে এই আলোচনা শেষ করা যেতে পারে।

মহাভারতের পরিবেশ বৈদিকযুগের পরিবেশ। সেখানে ঋষি আছেন, আশ্রম আছে, যজ্ঞক্রিয়া আছে। সেখানে বর্ণ অনুসারে জীবিকা নির্দ্ধারিত হয়। সেখানে মানুষ জীবনে চারটি আশ্রমধর্ম পালন করে। ধর্মশাস্ত্রের প্রভাব বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করা যাবে শান্তিপর্বে। সেখানে রাজধর্ম, স্ত্রীধর্ম প্রভৃতি আলোচনার বিষয়। মনুর ধর্মশাস্ত্র হতে বহু উদ্ধৃতিও মহাভারতে পুরাণ আকারে পাওয়া যাবে। এই যুগে চতুবর্ণ অর্থাৎ ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ পুরুষার্থ বলে বিবেচিত হয়েছে। পৌরাণিক যুগের চিন্তার নিদর্শন পাই ভীষ্মপর্বে গীতাসম্পর্কিত অধ্যায়গুলির সংযোজনের মধ্যে। সেখানে ঐতিহাসিক মানুষ কৃষ্ণকে বিষ্ণুর অবতার রূপে স্থাপন করা হয়েছে। এমন কি দুই স্থানে দুর্গাপূজার ব্যবস্থার ও উল্লেখ আছে।

৫

মহাভারতের বৈদিক দেবতাদের রূপান্তর

আমরা যে তিন স্তরের সংস্কৃতির কথা উপরে উল্লেখ করেছি তা সংঘটিত হয়েছিল কালক্রমে মানুষের মতিগতির পরিবর্তন হেতু। এই প্রসঙ্গে স্মরণ রাখা প্রয়োজন সংস্কৃতির একটি মূল নির্ণায়ক শক্তি দেবতা সম্বন্ধে ধারণা। এত বড় বিশ্বের অন্তরালে নিশ্চয় একটি নির্ণায়ক শক্তি কাজ করছে। কিন্তু তা হল দর্শনের কথা। মানুষ সাধারণত দেবতাকে সৃষ্টি করে নিজেরই প্রয়োজনে।

প্রাত্যহিক জীবনে সে নানাভাবে পীড়িত হয় এবং দুঃখ পায়। সে সুখে থাকলে তার আরও সুখে থাকবার বাসনা হয়। এই সব কারণেই দুঃখ হতে পরিত্রাণের জন্য বা বাসনা পূরণের জন্য সে উচ্চতর শক্তির কৃপাপ্রার্থী হয়। সেই জন্যই মানুষ যেখানে শক্তির উৎস আবিষ্কার করে তার উপরই দেবত্ব আরোপ করে। মানুষের প্রথম জীবনে এই আর্ত ও অর্থার্থী মনোভাবই ঈশ্বরের আবিষ্কার অভিযানের প্রেরণা জুগিয়েছিল।

এই অভিযানের ফলেই তার পরিবেশের পরিবর্তন এবং বোধশক্তির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে মানুষের দেবতা সম্বন্ধে ধারণা পরিবর্তিত হয়েছে। আমাদের দেশে এইভাবে দেবতা সম্বন্ধে ধারণার বার বার পরিবর্তন ঘটেছে। এই পরিবর্তনের ফলে আমরা তিনটি অবস্থা পাই। প্রথম অবস্থায় বৈদিক দেবতাদের আবির্ভাব হয়। দ্বিতীয় অবস্থায় তাঁরা সৃষ্টি, স্থিতি এবং প্রলয়ের নিয়ামক শক্তিরূপে তিনটি মূল দেবতায় পরিবর্তিত হন। তৃতীয় অবস্থায় তাঁরা পৃথক ভাবে পূজিত হয়ে এবং অতিরিক্ত ভাবে মানুষ রূপে অবতীর্ণ হন, এই বিশ্বাসও প্রতিষ্ঠিত হয়। মহাভারতের মধ্যে এই তিন শ্রেণীর চিন্তাই ওতপ্রোতভাবে মিশে গেছে। সেই কারণে তার কোন অংশ প্রাচীনতর এবং কোন অংশ পরবর্তী কালে সংযোজিত হয়েছে তা নির্দ্ধারণের সুবিধা হয়। এ বিষয় একটি সুস্পষ্ট ধারণা গড়ে তোলার এখানে প্রয়োজন হয়ে পড়ে।

এইভাবে দেখি প্রাচীন কালে আমাদের দেশে দেবতা সম্বন্ধে ধারণা ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হয়েছে এবং তার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে উপাসনা রীতির ও পরিবর্তন ঘটেছে। বৈদিক যুগে দেখি নানা প্রাকৃতিক শক্তির উপর দেবত্ব আরোপ করা হয়েছে। অগ্নি হলেন ভূলোকের দেবতা, ইন্দ্র হলেন অন্তরীক্ষ লোকের দেবতা, সূর্য হলেন দ্যুলোকের দেবতা। আরও নানাদেবতা পরিকল্পিত হয়েছেন। তাঁদের অনেক ক্ষেত্রে মানবিক গুণে ভূষিত করা

হয়েছে; কিন্তু তাঁদের ওপর মানুষের আকৃতি আরোপ করা হয় নি। পূজারীতি ছিল অগ্নিতে আহুতি দিয়ে বিভিন্ন দেবতাকে আহ্বান করে, মন্ত্র উচ্চারণ করে তাঁদের গুণকীর্তন এবং তাঁদের কাছে নানাপ্রার্থনা নিবেদন। একেই যজ্ঞক্রিয়া বলা হত।

পরবর্তী কালে বহু দেবতা হতে একক দেবতার প্রতি একটি আকর্ষণ লক্ষ্য করা যায়। সেটি সম্ভবত ঘটেছিল ধর্মশাস্ত্রের যুগে। যে শক্তিগুলিকে পরস্পর বিভিন্ন জ্ঞান করে পৃথক নামে চিহ্নিত করা হয়েছিল পরবর্তী কালে এই ধারণা বলবতী হয়ে উঠল যে তারা একই শক্তির বিভিন্ন প্রকাশ। এই শক্তির তিনটি পৃথক ভূমিকা প্রত্যক্ষ হয়। তা বিশ্ব সৃষ্টি করে, সৃষ্টিকে প্রবাহিত রাখে এবং ধ্বংস করে। এই তিনটি ভূমিকা অবলম্বন করে স্রষ্টার ত্রিমূর্তি রূপের পরিকল্পনা গড়ে উঠল। মূল শক্তির স্রষ্টারূপকে ব্রহ্মা নামে চিহ্নিত করা হল, পালকরূপকে বিষ্ণু নামে চিহ্নিত করা হল এবং ধ্বংসকারী রূপকে মহেশ্বর বলে চিহ্নিত করা হল। বিষ্ণু সূর্যের আর এক নাম। তিনি বৈদিক যুগের দেবতা। মহেশ্বর বৈদিক দেবতা রুদ্রের সঙ্গে তুলনীয়। ব্রহ্মা বলে কোনও বৈদিক দেবতা ছিলেন না। তবে ব্রহ্মণস্পতি নামে এক বৈদিক দেবতাকে পাই। বেদের সংহিতা অংশে ব্রহ্মশব্দটি মন্ত্রের সমার্থ বোধক। ইনি ছিলেন মন্ত্রের দেবতা। তাঁকেই ত্রিমূর্তির পরিকল্পনায় ব্রহ্মার পদে স্থাপন করা হল। এর প্রমাণ তাঁর যে মূর্তি পরিকল্পিত হয়েছে তার মধ্যেই মিলবে। আমরা লক্ষ্য করতে পারি তাঁকে চারটি মুখে ভূষিত করা হয়েছে। তাকে চতুরাননও বলা হয়। আমরা জানি আমাদের চারটি বেদ আছে। এই চার মুখ চার বেদের প্রতীক স্বরূপ।

এই পরিকল্পনা যে ধর্মশাস্ত্রের যুগে গড়ে উঠেছিল তার প্রমাণ মনুসংহিতার মধ্যে মিলবে। তার আরম্ভে সৃষ্টির যে ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে তাতে ব্রহ্মা এবং নারায়ণরূপী বিষ্ণুকে

বিশেষ ভূমিকা দেওয়া হয়েছে। সম্ভবত প্রলয়ের কথা সেখানে অপ্রাসঙ্গিক বলে রুদ্রের উল্লেখ হয় নি। এঁদের তিন জনেরই ধ্যানরূপ কল্পিত হয়েছে। সেরূপ মনুষ্যরূপ, তবে তাঁরা দুয়ের অধিক হস্ত বা একাধিক মস্তক দ্বারা ভূষিত। তাঁদের মূর্তি মন্দিরে স্থাপন করে উপাসনা রীতিও প্রবর্তিত হয়েছে।

তৃতীয় অবস্থায় দেখি ত্রিমূর্তি ব্যতীত আরও অনেক দেবতা এসেছেন। তাঁদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য দেবতা হলেন শক্তি বা দুর্গা বা শিবানী। তাঁরাও মনুষ্যমূর্তি ধারণ করেন। বৈদিক যুগে অন্তরীক্ষ ও দ্যুলোকের দেবতা ঊর্দ্ধে বিচরণ করতেন। কিন্তু এই নূতন যুগের দেবতাদের জন্য হিমালয়ের অভ্যন্তরে বাসস্থান নির্দিষ্ট হয়েছে। ফলে স্বর্গের পরিকল্পনা এসেছে। অলকা, অমরাবতী, কৈলাস সবই হিমালয় বা তার সংলগ্ন মাল ভূমিতে অবস্থিত। এইভাবে দেবতারা একটি বিশেষ ভাগ্যবান শ্রেণীর মানুষে রূপান্তরিত হয়েছেন। মানুষ মরণশীল, দেবতা অমর; মানুষ জরা পীড়িত হয়, দেবতার যৌবন চিরস্থায়ী; মানুষের জীবন সুখে-দুঃখে আন্দোলিত, দেবতারা চিরসুখী। মানুষ এঁদের কাছে দুঃখ হতে পরিত্রাণের জন্য বা বাসনাপূরণের জন্য প্রার্থনা নিবেদন করতে এদের প্রতিমা গড়ে উপাসনা করে। এদের মধ্যে বিষ্ণু সর্বোচ্চ সম্মান অধিষ্ঠিত হয়ে একপ্রকার একেশ্বরবাদের ঈশ্বরের পদে অধিষ্ঠিত হয়েছেন। বিশেষ করে বহু অসাধারণ গুণের অধিকারী, বিশিষ্ট মানুষকে তাঁর অবতাব রূপে স্বীকৃতি দেবার নীতি গড়ে উঠেছে এবং এই অবতারদের উপাসনাও প্রবর্তিত হয়েছে।

এইভাবে বৈদিকযুগে নানা প্রাকৃতিক শক্তির উৎসরূপে যে বহু দেবতা পরিকল্পিত হয়েছিলেন, পরবর্তী কালে তাঁদের রূপান্তর ঘটেছিল। এই পথে প্রথমে ত্রিমূর্তির পরিকল্পনা, এই ত্রিমূর্তির অন্তর্ভুক্ত ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর পরবর্তী কালে মূল দেবতার স্থান অধিকার করেন। ক্রমে বিষ্ণু সব থেকে বেশী

প্রাধান্য লাভ করেন। তাঁর অবতার রূপও স্বীকৃত হয়। তিনি যে দুঃসময়ে সাধুদের পরিত্রাণের জন্য এবং দুষ্টের দমনের জন্য মানুষ মাতার কোলে জন্মগ্রহণ করেন, সে বিশ্বাসও গড়ে ওঠে। মহাভারতকে বুঝতে এই শ্রেণীর তথ্যগুলি জেনে রাখার প্রয়োজন আছে।

৬

সংযোজনের প্রভাবে মূল কাহিনীর পরিবর্তন

আমরা দেখব দেবতাদের এই রূপান্তর মহাভারতের মূল-কাহিনীর উপর রীতিমত প্রভাব বিস্তার করেছিল। তার ফলে বহু সংযোজন মহাভারতে যুক্ত হয়েছিল। এমন কি মূলকাহিনীরও রূপান্তর ঘটে গিয়েছিল। মূলকাহিনীর আলোচ্য বিষয় হল একই রাজবংশের দুই শাখার মধ্যে বিবাদের নিষ্পত্তি সংঘটিত এক যুদ্ধে যা সর্বাত্মক ধ্বংসে পরিণতি লাভ করে। এই দুই শাখা হল ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রদের নিয়ে কৌরব দল এবং তাঁর অনুজ পাণ্ডুর পুত্রদের নিয়ে পাণ্ডব দল। সুতরাং তাঁরা একই রাজবংশের দুই ভ্রাতার সন্তান। বিরোধ ঘটেছিল রাজ্যের ভাগা-ভাগি নিয়ে। দুর্যোধন ছিলেন লোভী এবং ঈর্ষাপরায়ণ। তাই যুধিষ্ঠির এবং তার ভ্রাতাদের রাজ্যের ভাগ হতে বঞ্চিত করতে নানা প্রচেষ্টা করেছিলেন। যুধিষ্ঠির স্বভাবত আদর্শবন্দী এবং ধর্মপরায়ণ। তাঁকে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে রাজ্যের অধিকার হতে বঞ্চিত করা অন্যায়। সে অন্যায়কে যুদ্ধ করে প্রতিহত করা ক্ষত্রিয়ের ধর্ম। এই অর্থে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ ধর্মযুদ্ধ এবং পাণ্ডব-দের বিজয় ধর্মের জয়। তা প্রমাণ করে 'যতো ধর্মস্ততো জয়ঃ'। যে দিকে ধর্ম সেদিকে জয়। এই হল মূলকাহিনীর আলোচ্য বিষয়। এখানে কৃষ্ণ পাণ্ডবদের জ্ঞাতি এবং হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধু তিনি ঐতিহাসিক মানুষ।

আমরা দেখব পৌরাণিক চিন্তার প্রভাবে এই কাহিনী রীতিমত পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছে। কৃষ্ণ রূপান্তরিত হয়েছেন বিষ্ণুর অবতার। যেহেতু পাণ্ডবগণ নানাগুণে ভূষিত তাঁরা মানব পিতার সন্তান হতে পারেন না ; তাই তাঁরা পরিবর্তিত হয়েছেন নিয়োগ পুত্রে। বিভিন্ন দেবতাই তাঁদের জনকরূপে পরিকল্পিত হয়েছেন। এই প্রসঙ্গে খৃষ্টধর্মের প্রবর্তক খৃষ্টকে ঈশ্বরের পুত্ররূপে রূপান্তরের কাহিনীর সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যেতে পারে। মহাভারতে রূপান্তর কিন্তু এইখানেই থামে নি। শেষের পর্যায়ে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধকে দেবাসুরের যুদ্ধের পার্থিব পুনরাবৃত্তিরূপে চিত্রিত করা হয়েছে। পাণ্ডব ও কৌরবদের পক্ষভুক্ত বিভিন্ন মানুষকে দেবতা বা অসুরের অবতার বলে কল্পনা করা হয়েছে। মহাভারতের অন্তভুক্ত এই চরিত্রগুলির রূপান্তরের রহস্যভেদ না করলে মহাভারতের প্রকৃত পরিচয় মিলবে না।

৭

বর্তমান গ্রন্থের আলোচ্য বিষয়

এ পর্যন্ত যে আলোচনা হয়েছে তা হতে দেখা যায় যে মহাভারত একটি স্বতন্ত্র প্রকৃতির গ্রন্থ। তার সঙ্গে অন্য গ্রন্থের তুলনা চলে না। তা অনন্যসাধারণ। তা কেবল একজন লোকের রচনা নয়। বহু শতাব্দী ধরে নানা লেখকের রচনা তার সহিত সংযুক্ত হওয়ার ফলে তার বর্তমান রূপটি গড়ে উঠেছে। তারপর একজন সংকলক এসেছিলেন যিনি তার সামগ্রিক পরিচয় দিতে চেয়েছিলেন। সেই চেষ্টা হতেই আদিপর্বের প্রথম দুটি অধ্যায় নিয়ে অনুক্রমণিকাপর্ব ও পর্বসংগ্রহ পরিচিত হয়। তা প্রাসঙ্গিকভাবে শুধু সংক্ষেপে মহাভারতের ক্রমবিকাশের কিছু পরিচয় দেয় নি, তার একটি দৃঢ় সংনিবন্ধ সূচীপত্র প্রস্তুত করে দিয়েছে। অতিরিক্ত ভাবে পর্ব অনুসারে। প্রকৃতপক্ষে উপপর্ব অনুসারে। আলোচ্য বিষয়ের বিবরণ দিয়ে প্রত্যেকটির শ্লোক সংখ্যা নির্দিষ্ট করে

দিয়েছে। তার ফলে ভবিষ্যতে সংযোজন প্রক্রিয়ার পথ একেবারে বন্ধ হয়ে যাওয়ায় মহাভারত তাঁর স্থিতিশীল রূপ পেয়েছে।

বিভিন্ন যুগের পরিবেশ ও চিন্তার ফলে মহাভারতের আমরা বর্তমানে যে আকারে পাই তার মধ্যে বিভিন্ন স্তরের চিন্তা ওতপ্রোত-ভাবে মিশে গেছে। সংযোজনগুলি যথাসাধ্য নৈপুণ্যের সহিত সংযোজিত হলেও তাদের চিহ্নিত করা যে দুঃসাধ্য তা নয়। তবে তার জন্য প্রয়োজন দীর্ঘকাল অতিবাহনের ফলে ভারতের সামাজিক অবস্থার যে পরিবর্তনগুলি ঘটেছিল এবং দেবতা সম্পর্কিত চিন্তার পরিবর্তনের ফলে মূলকাহিনীর রূপ কিভাবে পরিবর্তিত হয়েছিল সে বিষয় সুস্পষ্ট জ্ঞানের। দুটি বিষয় সম্বন্ধেই যে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করা যায়, তার কিছু আভাস উপরের আলোচনাতে দেওয়া হয়েছে। সুতরাং সকল সম্ভাব্য তথ্য সংগ্রহ করে তাদের সাহায্যে মহাভারতের আঠারোটি পর্বের কোন অংশে কোন স্তরের প্রভাব লক্ষিত হয়, তা অনুমান করা যায়। যে অংশে প্রথম স্তরের সমাজব্যবস্থা এবং দেবতা সম্বন্ধে ধারণা লক্ষ্য করা যাবে তাকে মহা-ভারতের আদিরূপের অন্তর্ভুক্ত বলে চিহ্নিত করা যাবে। মহাভার-তের প্রকৃতি বুঝতে এ বিষয়েরও আলোচনার প্রয়োজন আছে।

সর্বশেষে মহাভারতের সামগ্রিক মূল্যায়ণের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। সংযোজন প্রক্রিয়ার ফলে মহাভারত পরিণতিতে যে রূপ পেল তা প্রায় দুই সহস্র বৎসর ধরে সাধারণ ভারতবাসীর আধ্যা-ত্মিক চিন্তার মূল উপজীব্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। শিক্ষিত হক, নিরক্ষর হক, সকল ভারতবাসী বংশানুক্রমে রামায়ণ ও মহাভারতের কাহিনী পড়ে বা শ্রবণ করে। তা একাধারে সাধারণ মানুষের চিত্ত বিনোদনের তথা আধ্যাত্মিক পুষ্টির অবলম্বন হয়ে দাঁড়িয়েছে। এদিক হতে দেখলে রামায়ণ ও মহাভারত ভারতবর্ষের দুটি মূল নদীর সহিত তুলনা করা যায়। গঙ্গা ও গোদাবরী যেমন আবহমান কাল ভারতের মানুষের অন্ন জুগিয়ে এসেছে, রামায়ণ ও মহাভারত তেমন গত দুই সহস্র বৎসরের অধিক কাল ধরে ভারতবাসীর

আধ্যাত্মিক পুষ্টিসাধন করেছে। তাই গ্রামাঞ্চলের ভারতবাসী, নিরক্ষর ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী নীতিজ্ঞানে বিশেষ সমৃদ্ধ।

অতিরিক্তভাবে মহাভারতের নানা আনুষঙ্গিক প্রভাবও লক্ষণীয়। ভীষ্মপর্বের অন্তর্ভুক্ত গীতা ত হিন্দুর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধর্মগ্রন্থরূপে স্বীকৃতি লাভ করেছে। তা শুধু কৃষ্ণকে অবতার পদে প্রতিষ্ঠিত করে নূতন ধর্ম, নূতন দর্শন গড়ে তোলে নি, তা সন্ন্যাস হতে নিরাসক্ত কর্মকে উচ্চতর সম্মান দিয়ে এক বিশ্বজনীন কল্যাণের আদর্শ স্থাপন করেছে। এই নিষ্কাম কর্মযোগের আদর্শ বিশ্বের মানুষের গ্রহণযোগ্য এবং তা যদি ব্যাপকভাবে গৃহীত হয় পৃথিবীর সকল গোষ্ঠীর মানুষের জীবনে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হতে পারে।

মহাভারতের সাহিত্যের ক্ষেত্রে প্রভাব ও বিশেষ লক্ষণীয়। মহাভারতের অনুক্রমণিকাকার ভবিষ্যদ্‌বাণী করেছিলেন যে ভাবী কালে মহাভারতের কাহিনী সকল মুখ্য কবিদের উপজীব্য হবে; 'সর্বেষাং কবি মুখ্যানামুপজীব্যো ভবিষ্যতি'। তা অক্ষরে অক্ষরে সত্য প্রমাণিত হয়েছে। এই বিশেষ ক্ষেত্রে তার প্রভাব এখনও ক্রিয়াশীল। তা যেমন সংস্কৃত সাহিত্যে নানা রচনার প্রেরণা জুগিয়েছে, তেমন আঞ্চলিক ভাষার সাহিত্যকে পুষ্ট করেছে, তেমন বর্তমান কালের সাহিত্যিকদেরও উপজীব্য কাহিনী জুগিয়েছে। এই বিশেষ ক্ষেত্রে তার বিস্ময়কর প্রভাব লক্ষ্য করলে অভিভূত হতে হয়।

এখন আমরা মহাভারতের প্রাথমিক আলোচনা শেষ করে ফেলেছি। আমরা লক্ষ্য করেছি মহাভারতের বিরাটত্ব তার মূল বৈশিষ্ট্য এবং তাকে ঘিরে মহাভারত সম্বন্ধে নানা প্রশ্নের উদয় হয়। সেই প্রশ্নগুলির একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় উপরে স্থাপিত হয়েছে। তাদের সন্তোষজনক উত্তর না মিললে, মহাভারতের প্রকৃত পরিচয় মিলবে না। সুতরাং সেই প্রশ্নগুলির সবিস্তার আলোচনা বর্তমান গ্রন্থের একটি প্রধান অঙ্গ হবে।

আনুষঙ্গিকভাবে দীর্ঘকালব্যাপী সংযোজনের ফলে মহাভারতের নিজস্ব মহত্ত্ব অনেক অংশে রীতিমত পরিবর্দ্ধিত হয়েছে। তেমন গীতার সংযোজন তাকে অতিরিক্ত মর্যাদা দিয়েছে। নানা নীতি কথা ও প্রজ্ঞাবচন তার মধ্যে সন্নিবিষ্ট হয়েছে। হৃদয়কে গভীরভাবে স্পর্শ করে এমন মহৎ কাহিনীও তার মধ্যে স্থান পেয়েছে। সুতরাং সে বিষয়গুলিরও আলোচনার প্রয়োজন হবে।

৮

প্রস্তাবিত আলোচ্য বিষয়

এই সকল বিভিন্ন আলোচনার প্রস্তুতি হিসাবে এখানে আমরা গ্রন্থে যে বিষয়গুলি আলোচিত হবে তাদের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেবার প্রস্তাব করি। সেই বিবরণ নীচে স্থাপিত হল। বুঝবার সুবিধার জন্য সেগুলি বিষয় অনুসারে স্থাপন করা হল। প্রত্যেকটি বিষয় গ্রন্থের পরবর্তী অংশে পৃথক ভাবে সবিস্তারে আলোচিত হবে।

১। মহাভারতের বিরাটত্বের কারণ।

এখানে প্রায় বারো শত বৎসর ধরে যে সংযোজন প্রক্রিয়া চলেছিল এবং শেষে পর্বসংগ্রহ পর্বে তার আলোচ্য বিষয় ও শ্লোকসংখ্যা সুস্পষ্টভাবে বেঁধে দেবার ফলে থেমে গেল, তার কারণ বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করা হবে।

২। সংযোজনের উদ্দেশ্য কি?

এই অধ্যায়ে যে উদ্দেশ্য এই বিরাট সংযোজন প্রক্রিয়ার প্রেরণা দিয়েছিল তার অনুসন্ধান করা হবে।

৩। মহাভারতের রচনাকালের ব্যাপ্তি ঃ

আমরা উপরে উল্লেখ করেছি যে মহাভারতের আদিরূপ ধীরে ধীরে সংযোজনের ফলে পরিবর্তিত হয়ে গেছে। সেই কারণে মহাভারতের তিন অবস্থায় তিন নাম ঃ জয়, ভারত ও মহাভারত। এই প্রক্রিয়াটি দীর্ঘকাল ধরে ধীরে ধীরে সংঘটিত হয়েছিল। তা

কোন সময় শুরু হয় এবং কোন সময় মহাভারত তার বর্তমান রূপ পাবার ফলে শেষ হয়, তার একটি ধারণা করবার চেষ্টা হবে।

৪। সংযোজন থামল কেন ?

স্বভাবতই প্রশ্ন ওঠে, যে সংযোজন প্রক্রিয়া এত দীর্ঘকাল ধরে স্থায়ী হল তা হঠাৎ থামল কেন। এই প্রশ্নের একটি সন্তোষজনক ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা হবে।

৫। সংযোজনের বিভিন্ন স্তর।

দীর্ঘকালব্যাপী সংযোজনের সময় ভারতের সমাজ বিন্যাস, ধর্মরীতি ও আধ্যাত্মিক চিন্তার পরিবর্তন ঘটেছিল। মহাভারতের মধ্যে তাদের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। বিভিন্ন কালের সংযোজন সমসাময়িক কালের প্রভাব প্রতিফলিত করে। সেই ভিত্তিতে মহাভারতের সমগ্র রচনাকে বিভিন্ন স্তর অনুসারে বিন্যস্ত করার চেষ্টা হবে।

৬। সংযোজনের প্রভাবে দেবতাদের রূপান্তর।

মহাভারতের মূল ঘটনা বৈদিক যুগের পরিবেশে ঘটেছিল। তার প্রথম অংশও সেই যুগেই রচিত হয়। পরবর্তীকালে পৌরাণিক যুগে দেবতাদের সম্বন্ধে ধারণার পরিবর্তিত হবার ফলে বৈদিক যুগের দেবতাদের রূপান্তর ঘটে যায়। এই অধ্যায়ে এই বিষয়টির বিস্তারিত আলেচেনা হবে।

৭। সংযোজনের প্রভাবে মূল কাহিনীর পরিবর্তন।

একই কারণে নূতন সংযোজিত অংশের সহিত মূল-কাহিনীর সঙ্গিত রক্ষার জন্য মূল কাহিনীরও যে কিছু পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল তার কিছু প্রমাণ পাওয়া যায়। এই অধ্যায়ে তার বিস্তারিত আলোচনা হবে।

৮। মহাভারতের সংযোজন-পূর্ব আদিরূপ।

সংযোজিত অংশগুলি মোটামুটি ভাবে চিহ্নিত করা সম্ভব বলে মনে হয়। সে ক্ষেত্রে মহাভারতের আদিরূপ কি ছিল সে

বিষয়েও একটি ধারণা করে নেওয়া যেতে পারে। একটি পৃথক অধ্যায়ে সেই চেষ্টা করা হবে।

৯। গীতা ও অনুগীতা।

সংযোজনের ফলে কিছু সারগর্ভ আধ্যাত্মিক তত্ত্বকথাও গীতায় স্থান পেয়েছে। অনুরূপভাবে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পর যুধিষ্ঠির অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন। এই অন্তবর্তীকালের মধ্যে কৃষ্ণ অর্জুনকে আরও কিছু তত্ত্বকথা শোনান। তার নাম অনুগীতা। তা অশ্বমেধ পর্বে সন্নিবিষ্ট হয়েছে। এই দুটি বিষয় সম্বন্ধে একটি আলোচনার প্রয়োজন হবে।

১০। মহাভারতের প্রাচীনতম বিশ্বকোষের ভূমিকা।

প্রাচীনকাল হতে মহাভারতের আদিরূপের সহিত বহু রচনার সংযোজনের ফলে তাতে নানা তথ্য, নানা কাহিনী, নানা প্রজ্ঞাবচনে, নানা সামাজিক ব্যবস্থার উল্লেখ ঘটেছে। তাদের মধ্যে পরস্পর সঙ্গতি না থাকলেও তাদের স্থাপনের জন্য একটি আশ্রয় স্থান চাই। মহাভারতের শান্তিপর্ব সেই আশ্রয় স্থানের ভূমিকা নিয়েছে। এখানে যুধিষ্ঠির প্রশ্ন কর্তা এবং শরশয্যায় শায়িত মৃত্যুর প্রতীক্ষায় অপেক্ষমান ভীষ্ম উত্তরদাতা। এই ভিত্তিতে এই বিষয়গুলি আলোচিত হয়েছে। ফলে এই দুটি পর্বকে আশ্রয় করে একটি বিশ্বকোষ রচিত হয়েছে। সেকালের সকল জ্ঞাতব্য বিষয় যেন তার মধ্যে স্থান পেয়ে গেছে। বিশ্বের এই প্রাচীনতম বিশ্বকোষের আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে একটি বিবরণ দেবার জন্য একটি সমগ্র অধ্যায় নিবেদিত হবে।

১১। মহাভারতের সামগ্রিক মূল্যায়ণ।

পরিশেষে এই বিরাট গ্রন্থের একটি সামগ্রিক মূল্যায়ণের প্রয়োজন হতে পারে। সেটি শেষের অধ্যায়ে স্থাপিত হবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

মহাভারতের বিরাটত্বের কারণ

বিরামহীন সংযোজন

১

মহাভারতের তিন রূপ

ইতিপূর্বে মহাভারত কিভাবে ধীরে ধীরে আকারে পরিবর্দ্ধিত হয়েছিল, তা বলা হয়েছে। সংযোজনের ফলেই আদিরূপের ছোট আকার হতে মহাভারত পরিবর্দ্ধিত হয়ে বিরাট আকার ধারণ করেছে। সুতরাং তা দীর্ঘকাল ধরে বহু লেখকের রচনার সংযোজনের ফলে গড়ে উঠেছিল। এই প্রক্রিয়াটির সহিত তুলনীয় আমাদের দেশে সুপরিচিত কোনও দৃষ্টান্ত স্থাপন করা সম্ভব নয়। তবে একটি উপযুক্ত উপমা প্রয়োগ করতে পারলে প্রক্রিয়াটি কিভাবে ঘটেছিল সে সম্বন্ধে একটি ধারণা করা সহজ হবে।

তাই শীতপ্রধান দেশে সচরাচর দৃষ্ট হয় এমন একটি সুবিদিত অভিজ্ঞতার সাহায্য নিতে বাধ্য হচ্ছি। বিলাতে বেশী শীত পড়লে তুষারপাত হয়। তখন মেঘ হতে যে বারিকণা ঝরে তা আর জলবিন্দু থাকে না। তা তুষারকণায় পরিবর্তিত হয়ে পাখীর ছোট ছোট পালকের রূপ নিয়ে বাতাসে ভেসে এসে ঘর-বাড়ী, পথ-ঘাট, সব ছেয়ে দেয়। তখন তুষারে আচ্ছাদিত হয়ে সব সাদা হয়ে যায়। মাঠগুলি সাদা তুষারকণায় ঢাকা পড়ে যায়। তা আমরা পানীয় ঠান্ডা করবার জন্য যে বরফ ব্যবহার করি তার মত নয়। এ বরফ কঠিন পুরু কাঁচের মত স্বচ্ছ এবং বর্ণহীন। তুষার কিন্তু বালুকণার মত। মুঠোয় ধরা যায়, চাপ দিলে একটি গোলাকার পিন্ডের রূপ নেয়। সেই গোলাকার কন্দুক বা বলটি নিয়ে বরফে ঢাকা মাঠে গড়িয়ে দিলে তা গড়াতে গড়াতে তুষারকণা গায়ে মেখে

ক্রমশ আকারে বড় হয়ে ওঠে। যত গড়িয়ে দেওয়া যায় তত তা আকারে বড় হয়ে ওঠে।

মহাভারতের সংযোজন প্রক্রিয়ার সঙ্গে তার সুন্দর তুলনা চলে। মহাভারতের আদিরূপে যেন একটি ক্ষুদ্রাকার কন্দুক। তা যত সময় অতিবাহিত হয়েছে তত নূতন নূতন রচনাকে আকর্ষণ করে নিয়ে ক্রমশ আকারে বড় হয়ে উঠেছে। দীর্ঘকাল ধরে এই প্রক্রিয়া চলায় তা পরিণতিতে বড় হয়ে তার বর্তমান বিরাট আকার লাভ করেছে।

সুতরাং মহাভারতের সঙ্গে যা সংযোজিত হয়েছে তাকে অনুপ্রবেশ বলে অবজ্ঞা করা উচিত হবে না। এই সংযোজনগুলি মহাভারতকে পুষ্ট করেছে এবং ফলে সেগুলি মহাভারতের অঙ্গীভূত হয়ে গেছে। সুতরাং তুষারের কন্দুক যেমন তুষারের উপর গড়িয়ে যেতে যেতে পুষ্টি সঞ্চয় করে, মহাভারতের আদিরূপও তেমন নানা শ্রেণীর রচনা আকর্ষণ করে পুষ্টি সঞ্চয় করেছে। এটি মহাভারতের ক্ষেত্রে একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়ারূপে স্বীকৃতি পাবার যোগ্য। তা না ঘটলে মহাভারতের বিরাটত্বও থাকত না, মহত্ত্বও থাকত না।

প্রথম অধ্যায়ে আমরা দেখাতে চেষ্টা করেছি যে মহাভারত তার ক্রমবিকাশের ইতিহাসে তিন অবস্থায় তিন রূপ পেয়েছিল এবং তাদের প্রত্যেকটিকে ভিন্ন নামে চিহ্নিত করা হয়েছিল। মহাভারতের মধ্যেই এর প্রমাণস্বরূপ একটি শ্লোক স্থাপিত হয়েছে। মহাভারতের বর্তমান রূপে দেখা যায় প্রতিপর্বের আরম্ভে সেই শ্লোকটি স্থাপিত হয়েছে। শ্লোকটি এই ঃ

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্‌
দেবীং সরস্বতীঞ্চৈব ততো জয়মুদীরয়েৎ ॥

অর্থাৎ, নারায়ণ, নর ও নরোত্তমকে, তথা দেবী সরস্বতীকে স্মরণ করে, তার পর জয় নামক গ্রন্থের পাঠ করতে হয়।

এই অনুবাদটি আমার স্বকপোল কল্পিত নয়। এখানে নর

যে অর্জুনকে সূচিত করে এবং নরোত্তম যে কৃষ্ণকে সূচিত করে তাতে বিতর্ক নাই। যে ব্যাখ্যাটি বিতর্কের বিষয় হয়ে দাঁড়ায় তা হল জয় শব্দকে মহাভারতের সমার্থবোধক শব্দ হিসাবে ব্যবহার করা। এই ব্যাখ্যা মহাভারতের বিখ্যাত টীকাকার নীলকণ্ঠের। (১)

এই শ্লোকটির মধ্যেই যেন মহাভারতের জন্মকথা তথা সংযোজনের সাহায্যে পরবর্তীকালে তার পরিবর্ধনের কাহিনী আভাসে সূচিত হয়েছে।

গ্রন্থপাঠের আরম্ভে এখানে মঙ্গলাচরণ হিসাবে গ্রন্থটির নাম উল্লেখ হয়েছে এবং বিভিন্ন দেবতা বা ব্যক্তির উদ্দেশে প্রণাম নিবেদন করা হয়েছে। প্রথমত লক্ষণীয় যে মহাভারতকে এখানে 'জয়' নামে অভিহিত করা হয়েছে। আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে মহাভারতের যে আদিরূপ ছিল, তার নাম ছিল 'জয়'। সম্ভবত তার কারণ, তার বর্ণনীয় বিষয় ছিল কৌরব ও পাণ্ডবদের যুদ্ধে পাণ্ডবদের জয় হয়েছিল। যে বিবাদের মীমাংসার জন্য এই যুদ্ধ তা হল পাণ্ডবদের ন্যায়সঙ্গত অধিকারের দাবী এবং দুর্যোধনের তা মেনে নিতে অস্বীকার। সুতরাং ধর্ম পাণ্ডবদের সপক্ষে। তাই পাণ্ডবদের জয় এবং ধর্মের জয়ের অর্থ হল বিশ্বজনীন কল্যাণের জয়। তাই এই নাম। সুতরাং এখানে মহাভারত সম্পর্কিত দুটি তথ্যের আভাসে পরিচয় মিলে যায়। প্রথম, তার আদিরূপে তার বর্ণনীয় বিষয় ছিল কুরুক্ষেত্রে যে ধর্মযুদ্ধ হয় তার বিবরণ। দ্বিতীয় তথ্য হল যে হেতু তার আলোচ্য বিষয় সীমিত ছিল, সে হেতু তার আকারও তুলনায় ছোট ছিল।

তারপর লক্ষ্য করতে পারি যাঁদের উদ্দেশ্যে প্রণাম নিবেদন করে গ্রন্থটি পাঠের উপদেশ দেওয়া হয়েছে, তাঁদের মধ্যে আছেন নারায়ণ, নর, নরোত্তম ও দেবী সরস্বতী। প্রথমে আসেন নারায়ণ। এই নামের কোন দেবতাকে বেদে পাওয়া যায় না। তাঁর প্রথম দর্শন মেলে ধর্মশাস্ত্রের যুগে। মনুসংহিতার প্রথম অধ্যায়ের আরম্ভেই

১। জয়ম্, জয়ো নামেতিহাসোঽয়মিতি। নীলকণ্ঠ টীকা

বিশ্ব সৃষ্টি হল কিভাবে তার এক বিবরণ দেওয়া আছে। বলা হয়েছে যে যিনি অব্যক্ত, অচিন্ত্য সনাতন শক্তি তিনি নিজেকে সৃষ্টি করলেন। তারপর সৃষ্টি করলেন জল এবং তাতে বীজ নিক্ষেপ করলেন। সেই বীজ অন্ডরূপ ধারণ করল এবং তা হতে এক দেবতা উদ্ভূত হলেন। পূর্বে তিনি জলে অবস্থান করেছিলেন বলে তাঁর নাম নারায়ণ হল। (২) তিনি বিশ্ব সৃষ্টি করলেন। সুতরাং ব্রহ্মাকে এখানে নারায়ণ রূপে অভিহিত করা হয়েছে। কিন্তু দেখা যায় যে বিষ্ণুকে পরবর্তীকালে নারায়ণ নামে অভিহিত করা হয়েছে। এই নূতন ব্যাখ্যা বোধ হয় প্রথম ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে স্থাপিত হয়। সেখানে নারা অর্থে মানুষ ধরা হয়েছে। পাপী হয়ে মানুষ বিষ্ণুর শরণ গ্রহণ করে বলে তাঁর নাম নারায়ণ হয়েছে। (৩) বোঝাই যায় পুরাণের যুগে নারায়ণের এই ব্যাখ্যা প্রবর্তিত হয়। সুতরাং এখানে নারায়ণ অর্থে বিষ্ণুকে ধরতে হবে।

তারপর আসে নর। বোঝাই যায়, যে নরকে এখানে নমস্কার জানাবার উপদেশ দেওয়া হয়েছে তিনি হলেনতৃতীয় পান্ডব অর্জুন। মহাভারত এমন বিরাট জটিল গ্রন্থ যে কোনও বিশেষ চরিত্রকে কাহিনীর নায়ক বলে চিহ্নিত করা যায় না। তবে দুটি চরিত্র সব থেকে বেশী প্রাধান্য পায়ঃ কৃষ্ণ এবং অর্জুন। তার কারণ মহাভারতের মূল কাহিনী হল ন্যায় ও অন্যায়ের পরিপোষক দুই বিরোধী শক্তির সংঘর্ষের পরিণতি। সেই পরিণতি হল কুরুক্ষেত্রের ধর্মযুদ্ধ। তাতে যিনি মূলভূমিকা নিয়েছিলেন তিনি হলেন অর্জুন। তিনি ধর্মযুদ্ধে ধর্মের পক্ষ নিয়ে যুদ্ধ করে তার বিজয় এনে দিয়েছিলেন। অর্জুনের সম্ভবত সেই কারণে আর

---

(২) মনুসংহিতা। ১।৯-১০

(৩) নারাশ্চ কৃতপাপাশ্চাপ্যয়নং গমনং স্মৃতম্।
যতো হি গমনং তেষাং সোহয়ং নারায়ণঃ স্মৃতঃ ॥

এক নাম ছিল বিজয়। (৪) তিনি যেন ধর্মযুদ্ধে স্বয়ং বিজয়ের প্রতীক। তাই তিনি প্রণম্য। এখানে যেন মহাভারতের আদি রূপের কথা স্মরণ করিয়ে দিতে তাকে সেই নামে উল্লেখ করা হয়েছে। আদিরূপে তার নাম ছিল জয়।

তারপর পাই পুরুষোত্তমকে। তিনি নিশ্চিত কৃষ্ণ। গীতায় তিনি নিজেকে পুরুষোত্তম বলে প্রচার করেছেন। তিনি বলেছেন অস্মি লোকে বেদে প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ (১৫।১৮)। তিনি এখানে ঐতিহাসিক মানুষ, পাণ্ডবদের সখা, ন্যায়দর্শী, নিজে নিরাসক্ত থেকে তাঁদের সদুপদেশ দেন। তাই তিনি পুরুষোত্তম। তাও মহাভারতের আদিরূপের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। এই প্রসঙ্গে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ নিবারণের জন্য তিনি শান্তির পথে বিবাদের মীমাংসার জন্য ধৃতরাষ্ট্রের নিকটে দৌত্যের যে ভূমিকা নিয়েছিলেন তা এই প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য।

সর্বশেষে দেবী সরস্বতীকে প্রণাম নিবেদন করবার উপদেশ দেওয়া হয়েছে। সরস্বতী পৌরাণিক যুগের দেবী। বেদের যুগে সরস্বতী নামে দেবী ছিল, কোনও দেবীর উল্লেখ নাই। ঋগ্‌বেদে বাক্‌ নামে দেবতার উপর একটি সূক্ত আছে; কিন্তু তাঁর পরিচয় দেওয়া হয়েছে তাতে বিদ্যাদাত্রী সরস্বতীর সহিত কোনও সাদৃশ্য নাই। তিনি সেখানে এক সর্বময়ী সত্তারূপে চিত্রিতা। আমরা এই দেবীর প্রতিমা গড়ে পূজা করে তাঁর কাছে বিদ্যা প্রার্থনা করি। সুতরাং তা পৌরাণিক যুগের ইঙ্গিত করে।

সুতরাং এই নমস্ক্রিয়াসূচক প্রারম্ভিক শ্লোকটি বিশেষ তাৎপর্য

৪। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পর কুন্তী যখন ধৃতরাষ্ট্রের অনুগামিনী হয়ে আশ্রমে যেতে চাইলেন তাঁর পুত্রগণ শোকার্ত হলেন। সেই প্রসঙ্গে কুন্তী বলছেন:

ভীম সেনাদবরজ স্তথাহং বাসবোপমঃ
বিজয়ো নাবসীদেত ইতি কেতুম্।
আশ্রমবাসিক পর্ব।১৭।৭

বহন করে। বিরাট মহাভারত যে ভারতের প্রাচীন ইতিহাসের তিনটি যুগকে অবলম্বন করে বিকাশলাভ করেছিল, তার ইঙ্গিত এই শ্লোকটির মধ্যে পাওয়া যাবে। মহাভারতের আবির্ভাব হয় স্মৃতির যুগে, তার বিস্তারলাভ ঘটে ধর্মশাস্ত্রের যুগে এবং তার বর্তমান রূপ পায় পুরাণের যুগের প্রারম্ভে। এই তথ্যগুলি যেন এই শ্লোক আভাসে উল্লেখ করা হয়েছে।

২

মহাভারতের পাঠোদ্ধারের সমস্যা

সেকালে মুদ্রণ যন্ত্র উদ্ভাবিত হয়নি। আমাদের দেশে মুদ্রণ যন্ত্র ব্যবহার শুরু হয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে। তার আগে প্রাচীন গ্রন্থগুলি হস্তলিখিত পুঁথির আকারে সংরক্ষিত হত। হস্তলিখিত পুঁথি দীর্ঘকাল রক্ষা করা শক্ত। মহাভারতের বর্তমান রূপ যদি খৃষ্টীয় শতাব্দী হতে প্রচলিত হয়ে থাকে, তা হলে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত হস্তলিখিত পুঁথি একাধিক বার পুনরায় লিখিত হয়ে থাকবে। কারণ, কালাতিপাত হেতু মূল পুঁথি কীটদষ্ট বা জীর্ণ হয়ে ধ্বংস হয়ে যাবার সম্ভাবনা আছে।

দ্বিতীয়ত, বিরাট মহাভারত গ্রন্থের আবেদন ছিল সমগ্র ভারতবর্ষের ভূখণ্ড জুড়ে। তা ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের একান্ত আদরের বস্তু ছিল। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের পণ্ডিতগণ পুঁথির আকারে তাকে বিভিন্ন অঞ্চলে সংরক্ষিত করে রাখতেন। সেই পুঁথি আঞ্চলিক ভাষার লিপি অনুসারে লিখিত হত। এমন হতে পারে যে আদিরূপে তা ব্রাহ্মীলিপিতে লিখিত হত। পরে যখন আঞ্চলিক লিপিগুলি গড়ে উঠল সেই আঞ্চলিক লিপিতেই লিখিত হত। বাংলাদেশে মহাভারতের যে পুঁথিগুলি পাওয়া যায় সেগুলি বাংলালিপিতে লিখিত।

আমরা জেনেছি যে মহাভারত দীর্ঘকাল ধরে সংযোজন প্রক্রিয়ার

সাহায্যে গড়ে উঠেছে। এই সংযোজনগুলি কিন্তু সর্বক্ষেত্রে সকল আঞ্চলিক পুঁথিতে পাওয়া যায় না। এমনও দেখা যায় যে একটি সংযোজন একটি আঞ্চলিক পুঁথিতে স্থান পেয়েছে আবার অন্য আঞ্চলিক পুঁথিতে তার উল্লেখ নাই। তার কারণ এই হতে পারে যে, যিনি সংযোজন করেছেন তিনি এক বিশেষ অঞ্চলের মানুষ হওয়ায়, অন্য অঞ্চলে যে পুঁথি রক্ষিত ছিল তা লেখকের অজ্ঞাত ছিল বা নাগালের বাহিরে ছিল। কাজেই সকল সংযোজন সব পুঁথিতে সংযুক্ত হত না।

এইভাবে পরিস্থিতিটি বেশ জটিল আকার ধারণ করে। পুনায় অবস্থিত ভান্ডারকার ওরিয়েন্টাল রিসার্চ ইনস্টিটিউটের প্রথম অধ্যক্ষ টি এস সুখথাংকর ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল হতে বারোটি মহাভারতের পুঁথির সন্ধান পেয়েছিলেন। এদের মধ্যে নীচে উল্লিখিত নয়খানি পুঁথি বিশেষ মূল্যবান ঃ

১! সারদা বা কাশ্মিরী পুঁথি—বোম্বাই এ রক্ষিত।

২। নেপালী পুঁথি—নেপাল দরবার গ্রন্হাগারে রক্ষিত। নেপালী হরফে লিখিত।

৩। বাংলা পুঁথি—শান্তিনিকেতন গ্রন্হাগারে রক্ষিত।

৪। অর্জুন মিশ্র সংকলিত পুঁথি—দেবনাগরী হরফে লিখিত।

৫। নীলকন্ঠ সংকলিত পুঁথি —দেবনাগরী হরফে লিখিত। বোম্বাই-এ রক্ষিত।

৬। রত্নগর্ভ সংকলিত পুঁথি—দেবনাগরী অক্ষরে লিখিত। তাঞ্জোরে রক্ষিত।

৭। তেলেগু হরফে লিখিত পুঁথি।

৮। মালায়ালম হরফে লিখিত পুঁথি।

৯। গ্রন্হ নামে চিহ্নিত পুঁথি—তা তামিল লিপির সংস্কৃত রচনা লিপিবদ্ধ করবার জন্য একটি পরিবর্তিত রূপে লিখিত। সেই পরিবর্তিত হরফের নামও গ্রন্হ হরফ।

এই পুঁথিগুলির মধ্যে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে মিল থাকা সত্ত্বেও নানা প্রকৃতির পার্থক্য অনুপ্রবেশ করেছিল। কোথাও একই শ্লোকের পাঠের ভিন্নতা লক্ষিত হয়, কোথাও ছন্দের ভিন্নতা লক্ষিত হয়। কোথাও কিছু অংশ বর্জিত হয়েছে লক্ষিত হয়। প্রধানত লক্ষ্য করা যায় দক্ষিণ ভারতে রক্ষিত পুঁথিগুলির শ্লোক সংখ্যা বেশী। পার্থক্যের দৃষ্টান্ত হিসাবে এই প্রসঙ্গে কিছু দৃষ্টান্ত স্থাপন করা যেতে পারে। প্রতিপর্বের প্রারম্ভে যে নমস্ক্রিয়াসূচক শ্লোকটি আছে, তা দক্ষিণ ভারতের পুঁথিগুলিতে বর্জিত হয়েছে। বাংলা হরফে সংরক্ষিত পুঁথিতে মহাভারতের আরম্ভে গণেশের যে শ্রুতি-লেখক হবার কাহিনী আছে তার আদৌ উল্লেখ নাই। এই সব কারণে, সংযোজন প্রক্রিয়া শেষ হবার পর মহাভারতের যে রূপ দাঁড়াল সেটি ঠিক করাও বেশ শক্ত হয়ে উঠল। হিসাব করে দেখা গেছে যে এই পুঁথিগুলির মধ্যে গ্রহণ ও বর্জনের ভিত্তিতে হিসাবে গণনা করলে সর্বাধিক বর্জনের পরিণাম দাঁড়ায় তেরো হাজার শ্লোক।

৩

মহাভারতের নির্ভরযোগ্য পাঠ সংকলনের প্রয়োজনীয়তা

মহাভারতের এই বিশেষ সমস্যাটির প্রতি বিশ্বের পণ্ডিত সমাজের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছিল। বিভিন্ন পুঁথিগুলির মধ্যে নানা প্রকৃতির পার্থক্য থাকায় তাঁরা একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ-সংকলনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছিলেন। তারই প্রেরণায় প্যারিসে ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে অনুষ্ঠিত ভারততত্ত্ববিদগণের একাদশতম সভায় বিষয়টির মীমাংসার প্রশ্ন আলোচিত হয়। (৫) প্রশ্ন উঠেছিল মহাভারত সম্পূর্ণরূপে বিকশিত হবার পর যে রূপ পেয়েছিল তার সঠিক পরিচয় দেয় এমন একটি সংকলন প্রকাশ করা যায়

৫। XIth International Congress of Orientalists.

কিনা। বিখ্যাত ভারততত্ত্ববিদ উইনটার নিটজ এমন একটি সংকলনের জন্য বিশেষভাবে সুপারিশ করেছিলেন।

বিশ্বের প্রাচ্যতত্ত্ববিদ্‌গণের এই ন্যায্য দাবী দীর্ঘকাল উপেক্ষিত ছিল। সে বিষয় যে প্রতিষ্ঠান প্রথম সক্রিয় পদক্ষেপ গ্রহণ করে তার নাম ভাণ্ডারকার প্রাচ্য-গবেষণা পর্ষদ্। (৬) প্রতিষ্ঠানটি পুনা নগরে ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপিত হয়। তারই উদ্যোগে ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে একটি নির্ভরযোগ্য গবেষণা ভিত্তিক মহাভারতের সংকলন গ্রন্থ রচনার প্রস্তাব গৃহীত হয়। ভি সি এস সুখথাংকর এই বিরাট কাজটির তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত হন এবং অনতিকাল পরে তার কাজ আরম্ভ হয়ে যায়।

নির্ভরযোগ্য সংকলন গ্রন্থ প্রণয়নের জন্য ডঃ সুখথাংকর যে নীতি অবলম্বন করেন তা হল এই। তিনি দেখলেন সারা ভারতে মহাভারতের বারোখানি পুঁথি সংরক্ষিত অবস্থায় ছিল। তাদের মধ্যে দুটি সংকলন বিশেষ মূল্যবান। তাদের মধ্যে একটি হল গণপত কৃষ্ণজির সম্পাদনায় সংকলিত পুঁথি। প্রধানত তা নীল-কণ্ঠের পুঁথিকে অবলম্বন করে রচিত। নীলকণ্ঠ ছিলেন এক মারাঠী পণ্ডিত। তাঁর রচিত মহাভারতের একটি টীকাও পাওয়া যায়। কৃষ্ণজি সম্পাদিত পুঁথিটিকে উত্তর ভারতের পুঁথিগুলির নির্ভরযোগ্য প্রতিনিধি হিসাবে গ্রহণ করা যায়। তার তারিখ ১৭৯৯ শকাব্দে, অর্থাৎ ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দ।

অন্য সংকলনটি মাদ্রাজ হতে ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। পি সি এম শাস্ত্রী নামে এক তামিল পণ্ডিত তার সম্পাদনা করেন। দক্ষিণে ভারতে মালয়ালম, তেলেগু ও তামিল পুঁথি পাওয়া গিয়েছিল। তাদের ভিত্তি করেই এই সংকলন গ্রন্থটি রচিত হয়। তাই তাকে দক্ষিণ ভারতীয় সংকলন (৭) বলা হয়ে থাকে।

এই পরিস্থিতিতে সুখথাংকার ঠিক করলেন যে ভাণ্ডারকার

৬। Bhandarkar Oriental Research Institute.

৭। South Indian Reconsion.

গবেষণা পর্ষদ হতে যে সংকলন গ্রন্থ প্রকাশ হবে তা এই বোম্বাই সংকলন এবং দক্ষিণ ভারতীয় সংকলন দুটির ভিত্তিতে রচিত হবে। তা হলে পরোক্ষভাবে উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল মহাভারতের যে পুঁথিগুলি পাওয়া গেছে তাদের ব্যবহার করা হবে। এই দুই সংকলনের মধ্যে কোথাও অতিরিক্ত সংখ্যক শ্লোক পাওয়া যায়, কোথাও অল্পসংখ্যক শ্লোক পাওয়া যায়। কোথাও বর্ণনীয় বিষয় এক হলেও পাঠান্তর লক্ষ্য করা যায়। কোথাও ছন্দ বিষয়ক ভ্রান্তি দেখা যায়।

নূতন সংকলন গ্রন্থ প্রণয়নে সুখথাংকর তিনটি মূল নীতি গ্রহণ করেছিলেন। প্রথম নীতি হল, যেখানে উত্তরভারত ও দক্ষিণ ভারতের সংকলনে মিল পাওয়া যাবে সেখানে যে পাঠ আছে তাকে বিনা দ্বিধায় গ্রহণ করা হবে। দ্বিতীয় নীতি হল যেখানে পাঠের পার্থক্য দেখা যাবে সেখানে বিচার করে দেখে যে পাঠ নির্ভরযোগ্য মনে হবে, তাকে গ্রহণ করা হবে। তৃতীয় নীতি হল যে পাঠ প্রস্তাবিত সংকলনের জন্য গ্রহণ করা হবে তার কেবল সন্ধি এবং ছন্দ সংক্রান্ত ভ্রান্তিকে সংশোধন করা হবে।

এই রীতি প্রয়োগ করে তিনি মহাভারতের আঠারটি পর্বের কোনটিতে কতগুলি অধ্যায় আছে এবং কত শ্লোক আছে তার একটি হিসাব করেছিলেন। সেই হিসাব অনুসারে আঠারটি পর্বের মোট অধ্যায় সংখ্যা দাঁড়ায় ১৯৪৪ এবং শ্লোক সংখ্যা দাঁড়ায় ৮২,১৩৮ (৮)।

অপর পক্ষে মহাভারতের আদিপর্বের অন্তর্ভুক্ত পর্বসংগ্রহ পর্বে (দ্বিতীয় অধ্যায়ে) মহাভারতের আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে একটি পূর্ণাঙ্গ বিবরণ দেওয়া আছে। এ বিষয় পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। অতিরিক্তভাবে তার প্রতিটি পর্বে কতগুলি অধ্যায় আছে এবং কতগুলি শ্লোক আছে তারও একটি হিসাব দেওয়া আছে। সেই হিসাব অনুসারে মহাভারতের আঠারোটি পর্বের অধ্যায় সংখ্যা ১৮২৪ এবং মোট শ্লোক সংখ্যা ৮৪,৮০৯ দাঁড়ায়। নীচে

৮। Sukhthankar, Critical Studies in the Mahabharata

এই দুই সংকলনের হিসাবের একটি তুলনামূলক বিবরণ দেওয়া হল। দেখা যাবে প্রস্তাবিত সংকলন গ্রন্থের মধ্যে ১৯১৮টি অধ্যায় এবং ৮২,১৩৮টি শ্লোক স্থান পাবে। বিভিন্ন পুঁথি হতে গ্রহণ ও বর্জনের ফলে এই ব্যবস্থা দাঁড়িয়েছে ঃ

পর্বসংগ্রহ পর্ব ও প্রস্তাবিত সংকলনের তুলনামূলক হিসাব

পর্বের নাম	অধ্যায় সংখ্যা		শ্লোক সংখ্যা	
	পর্বসংগ্রহ পর্ব অনুসারে	প্রস্তাবিত সংকলন অনুসারে	পর্বসংগ্রহ পর্ব অনুসারে	প্রস্তাবিত সংকলন অনুসারে
আদি	২২৭	২১৮	৮,৮৮৪	৭,৯৮৪
সভা	৭২	৭২	২,৫১১	২,৫১১
আরণ্যক	২৬৯	২৬৯	১১,৬৬৪	১১,৬৬৪
বৈরাট	৬৭	৬৭	২,০৫০	২,০৫০
উদ্যোগ	১৮৬	১৮৬	৬,৬৯০	৬,৬৯৮
ভীষ্ম	১১৭	১১৭	৫,৮৮৪	৫,৮৮৪
দ্রোণ	১৭০	১৭০	৮,৯০৯	৮,৯০৯
কর্ণ	৭০	৬৯	৪,৯৮৪	৪,৯০০
শল্য	৫৯	৫৯	৩,২২০	৩,২২০
সৌপ্তিক	১৮	১৮	৮৭০	৮৭০
স্ত্রী	২৭	২৭	৭৭৫	৭৭৫
শান্তি	৩২৯	৩০৯	১৪,৭২৭	১৪,৫২৫
অনুশাসন	১০৩	১৩৩	৩,৩২০	৩,৩২০
আশ্রমবাসিক	৪২	৪২	১,৫০৬	১,৫০৬
মৌষল	৮	৮	৩২০	৩০৬
মহাপ্রস্থান	৩	৩	৩২০	১২০
স্বর্গারোহন	৫	৫	২০০	২০০
মোট	১,৮২৪	১,৯১৮	৮৪,৮০৯	৮২,১৩৮

সুতরাং দেখা যাবে সুখথাংকরের বিশ্লেষণ অনুসারে পর্বসংগ্রহ

পর্বে যে হিসাব দেওয়া আছে তার সঙ্গে প্রস্তাবিত সংকলনের অধ্যায় সংখ্যা এবং শ্লোক সংখ্যা উভয় বিষয়েই পার্থক্য সৃষ্টি হয়েছে প্রথমে অধ্যায় সংখ্যা ধরা যাক। পর্বসংগ্রহ পর্বের ১৮২৪টি পর্বের পরিবর্তে ১৯১৮টি অধ্যায় প্রস্তাবিত হয়েছে। কিন্তু পর্বসংগ্রহ পর্বের অধ্যায় সংখ্যা অতি প্রাচীন কালে নির্ণীত হয়েছিল। ঠিক বলতে কি মহাভারত তার পরিণত রূপটি পাবার অব্যবহিত পরেই সেই হিসাবটি রচিত হয়েছিল। শুধু তাই নয়, পর্বসংগ্রহ পর্বের একটি তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা ছিল। তা প্রতি অধ্যায় এবং তার আলোচ্য বিষয়ের সুস্পষ্ট উল্লেখ করেছিল বলেই মহাভারতের দীর্ঘকাল ধরে প্রচলিত সংযোজন প্রক্রিয়া বন্ধ হয়ে গিয়েছিল মহাভারতের আয়তনে স্থায়িত্ব এসেছিল।

প্রস্তাবিত সংকলনে ৯২টি অতিরিক্ত অধ্যায় রাখবার ব্যবস্থা হয়েছে। মহাভারতের বিন্যাস অনুসারে প্রতি অধ্যায় একটি বিশেষ আলোচনার নিবেদিত। অবশ্য একই বিষয় অবলম্বন করে একাধিক অধ্যায় রচিত হতে পারে। তবু নূতন অধ্যায়ের স্বীকৃতি দিলে পর্বসংগ্রহ পর্ব রচিত হবার পরেও নূতন বিষয় মহাভারতে সংযোজিত হবার আশঙ্কা থেকে যায়। অধ্যায়গুলির সংখ্যা পর্বসংগ্রহ পর্বে উল্লিখিত সংখ্যার মধ্যে সীমিত রাখলে আরও ভাল হত। মহাভারতের পরিণত রূপটির সঙ্গে তা হলে প্রস্তাবিত সংকলন গ্রন্থ সঙ্গতি রাখতে পারত।

অনুরূপভাবে দেখা যাবে শ্লোক সংখ্যায় ও পর্বসংগ্রহ পর্ব অনুসারে শ্লোক সংখ্যা ৮৪৮০৯। প্রস্তাবিত সংকলনে তা কমে গিয়ে ৮২,১৩৮ এ দাঁড়ায়। অর্থাৎ প্রস্তাবিত সংকলনে তা ২৫০০ কমে গিয়েছে। আঠারটি পর্বের মধ্যে আদি, কর্ণ, শান্তি, অশ্বমেধ, মৌষল ও মহাপ্রস্থান পর্বের শ্লোক সংখ্যা কমে গিয়েছে। উদ্যোগ পর্বে সামান্য বেড়েছে। আদি ও অনুশাসন পর্বে শ্লোক সংখ্যা বেশ কমে গিয়েছে। সুখথাংকর যে নীতি অবলম্বন করেছেন তার ফলেই এমন ঘটেছে। মনে হয় এর জন্য বিশেষ করে দায়ী দ্বিতীয়

নীতিটি। তাতে বলা হয়েছে যে পাঠের পার্থক্য দেখা গেলে যে পাঠ নির্ভরযোগ্য মনে হবে তাই গ্রহণ করতে হবে। বিষয়টি সম্পূর্ণভাবে নির্বাচকের মতিগতির উপর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। পর্বসংগ্রহ পর্বে যে শ্লোক সংখ্যা উল্লেখ করা হয়েছে তার সঙ্গে প্রস্তাবিত সংকলনের শ্লোক সংখ্যায় সঙ্গতি রক্ষার প্রতি দৃষ্টি রাখলে এই বিভ্রাট ঘটত না। অন্তত শ্লোক সংখ্যার পার্থক্য অনেক কমে যেত। দেখা যায় নূতন সংকলনে পর্বসংগ্রহ পর্বের উপর যে গুরুত্ব আরোপ করা উচিত ছিল তা আদৌ করা হয় নি।

এই প্রসঙ্গে আরও একটি বিষয় লক্ষ্য করা যেতে পারে। একটি ধারণা প্রচলিত আছে যে মহাভারতের শ্লোক সংখ্যা এক লক্ষ। তার ভিত্তি বোধ হয় আদি পর্বের অন্তর্ভুক্ত অনুক্রমণিকা পর্বের এই উক্তি ঃ

একশত সহস্রং তু মানুষেষু প্রতিষ্ঠিতম্। (৯) কিন্তু দেখা যাবে পর্বসংগ্রহ পর্বের হিসাব মতে শ্লোক সংখ্যা হল ৮৪,৮০৯, অর্থাৎ ৮৫০০০-এর মত। হরিবংশকে মহাভারতের অঙ্গ হিসাবে সেখানে স্বীকার করা হয় নি। সেখানে উল্লেখ আছে যে হরিবংশে ১২,০০০ শ্লোক আছে। তা যোগ করলে মোট শ্লোক সংখ্যা দাঁড়ায় ৯৭,০০০, অর্থাৎ এক লক্ষের কাছাকাছি যায়। সেটিও এই ধারণার ভিত্তি হতে পারে।

৯। মহাভারত ১।১।১০৭

তৃতীয় অধ্যায়

সংযোজনের উদ্দেশ্য ও প্রকৃতি

১

রচনাকে স্থায়ী আশ্রয় দেবার আকৃতি

উপরের আলোচনা হতে স্পষ্ট দেখা যায় যে মহাভারতের ক্ষেত্রে অত্যন্ত বেশী পরিমাণ সংযোজন প্রক্রিয়া সংঘটিত হয়েছিল। স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন ওঠে কেন তা ঘটেছিল? বর্তমান অধ্যায়ে তার একটি সন্তোষজনক মীমাংসার চেষ্টা করা হবে।

আমরা লক্ষ্য করলে দেখব যে মহাভারতেরও পূর্বে রচিত গ্রন্থও প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সংযোজনের চেষ্টা হয়েছে। মহাভারতের পরবর্তীকালেও সংযোজন রীতি প্রচলিত ছিল; তবে তার প্রকৃতি কিছু পরিবর্তিত হয়ে যায়। সকল ক্ষেত্রে উদ্দেশ্য একই; তবে সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বিভিন্ন রীতি অবলম্বিত হয়েছিল। সংক্ষেপে বলা যায় এই ক্ষেত্রে দুটি উদ্দেশ্য একসঙ্গে কাজ করেছিল। একটি উদ্দেশ্য হল রচনাকে স্থায়ী আশ্রয় দেওয়া এবং দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হল তাকে আভিজাত্যের মর্যাদা দেওয়া। উভয় উদ্দেশ্য পরস্পর যুক্ত। সকল লেখকই স্বভাবত চান তাঁর লেখা যেন স্থায়ী ভাবে রক্ষিত হয় এবং অতিরিক্তভাবে বহু পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। রচনা মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হলে তা অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে।

সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বর্তমানকালে যুক্তিবিদ্যার আনুকূল্যে এমন কতকগুলি সুবিধা মিলে যায় যা প্রাচীনকালে মিলত না। প্রথমত মুদ্রণ যন্ত্র উদ্ভাবিত হবার ফলে রচনাকে আর পুঁথির আকারে যক্ষের ধনের মত রক্ষা করতে হয় না। মুদ্রিত হয়ে গ্রন্থ আকারে প্রকাশিত হলে তা শত শত পাঠকের হস্তগত হয়; কিছু

গ্রন্থ স্থায়ীভাবে গ্রন্থাগারে রক্ষিত হয়। এইভাবে স্থায়ী আশ্রয় ও প্রচার কার্যে দুটি ইচ্ছাই পূর্ণ হয়। তা ছাড়া প্রচারের জন্য পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপণ দ্বারা বা গ্রন্থমেলার সাহায্যে প্রত্যক্ষ ভাবে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যায়। তাই বর্তমান কালে বিখ্যাত গ্রন্থের কোলে আশ্রয় নিয়ে স্থায়ী আশ্রয় এবং আভিজাত্য স্থাপন করে গ্রন্থকে জীবিত রাখবার বা প্রচারিত করবার আর প্রয়োজন হয় না। সেকালে এই সুবিধার অভাব হেতুই নূতন লেখক তাঁর রচনা কোনও বিখ্যাত গ্রন্থের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট করে সেই কাজ সিদ্ধ করতে চাইতেন।

অবশ্য এই কৌশল অবলম্বিত হলে গ্রন্থকারের নিজস্ব নাম প্রচার করে কীর্তি অর্জনের সুযোগ মিলত না। এই অহমিকা বোধ প্রণোদিত খ্যাতির আকাঙ্ক্ষা থাকলে এই কৌশল অবলম্বনে বাধা আসত। কিন্তু সেকালে লেখকদের অহমিকাবোধ তেমন তীব্র ছিল না। অতিরিক্তভাবে সেকালের পরিবেশে রচনাকে সংরক্ষিত করে পাঠকের দৃষ্টিগোচর করবার কোনও সুযোগ মিলত না। সেই কারণ লেখকদের ভাগ্যে রচিত গ্রন্থের স্থায়ী আশ্রয় এবং নিজস্ব খ্যাতি দুটি একসঙ্গে জোটা সম্ভব ছিল না। তাঁদের ঠিক করে নিতে হত কোনটি তাঁরা চান ঃ খ্যাতি না রচিত গ্রন্থের স্থায়িত্ব ? স্বভাবতই তাঁরা দ্বিতীয়টি বেছে নিতেন। তাঁরা নিজস্ব রচনাকে স্থায়ী আশ্রয় দিতে বেশী আগ্রহশীল ছিলেন।

নিজের রচনাকে স্থায়িত্ব দেবার সে কালের পরিবেশে সহজ উপায় ছিল যে গ্রন্থ নিজ গুণে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে এবং প্রচুর শ্রদ্ধা ও জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে, তার সঙ্গে নিজের রচনাকে যুক্ত করে দেওয়া। সুতরাং কোনও বিশেষ গ্রন্থ অত্যধিক মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত হলে তা চুম্বকের মত পরবর্তী কালের রচনাকে আত্মসাৎ করে নিত।

বিখ্যাত গ্রন্থের আকর্ষণ শক্তি যে খুব ব্যাপক ছিল তা বেশ বোঝা যায়, কত শ্রেণীর রচনা এইভাবে প্রাচীন বিখ্যাত গ্রন্থে সং-

যোজন আকারে আশ্রয় গ্রহণ করেছে তা লক্ষ্য করলে, আকর্ষণের সার্বিকতার একটি অতিরিক্ত কারণ হল কোনও ব্যক্তি তাঁর নিজস্ব মতকে প্রতিষ্ঠিত করতে হলে এই সংযোজন রীতিকেই অবলম্বন করতেন। কারণ, অভিজাত গ্রন্থে আশ্রয় পেলে তার আভিজাত্য বাড়বে। ফলে তার সমাদর লাভের সম্ভাবনা উজ্জ্বল হবে। এই কারণে দেখা যায় নিজের ধর্মমত বা নিজের প্রতিপাদিত দার্শনিক তত্ত্ব বা নিজের অনুমোদিত নৈতিক আচরণের প্রচার, এমনকি বিশেষ বংশের আভিজাত্য প্রতিষ্ঠিত করবার জন্যও এই কৌশল অবলম্বিত হত। এমন কি দেখা যায় যে বিশুদ্ধ রসসাহিত্য শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করাযায় এমন রচনাকেওএই ভাবে অনুপ্রবিষ্ট করা হত। এই মানসিকতা যে পরিবেশের আনুকূল্যে প্রাচীন কালে বিশেষ ক্রিয়াশীল ছিল, তার বহু দৃষ্টান্ত প্রাচীন সাহিত্যে পাওয়া যাবে। এই প্রতিপাদ্যের সমর্থনে কিছু দৃষ্টান্ত স্থাপন করা যেতে পারে।

বেদের পরেই প্রাচীন উপনিষদগুলি ভারতের প্রাচীনতম গ্রন্থ ঠিক বলতে কি প্রাচীন উপনিষদগুলি বেদের আশ্রয়েই রচিত হয়েছিল। তাই সেগুলি বেদের সংহিতা বা ব্রাহ্মণ বা আরণ্যকের সহিত যুক্ত ছিল। সেই জন্যই তাদের শ্রুতি বা বেদের অঙ্গ বলে ধরা হত। এই শ্রেণীর উপনিষদগুলিকে অবলম্বন করে এমন উচ্চ স্তরের দার্শনিক চিন্তা বিকাশ লাভ করেছিল যে তা বিশ্বের মানুষের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছে। ফলে তার খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা শীর্ষস্থানে উঠেছিল। এই প্রতিষ্ঠা হেতু পরবর্তীকালে রচিত নানা দার্শনিক তত্ত্ব বা ধর্মবিশ্বাসকে উপনিষদের নামে প্রচার করা হয়েছিল। শ্রুতির যুগের উপনিষদের সংখ্যা ছিল অতি অল্প; সম্ভবত চোদ্দখানি। তাদের সংখ্যা বর্তমানে বর্দ্ধিত হয়ে দাঁড়িয়েছে ১২০ তে। প্রাচীন উপনিষদ যে দার্শনিক তত্ত্ব স্থাপন করে তা এক প্রকার সর্বেশ্বরবাদ। উপনিষদে তাকে ব্রহ্মবাদ বলা হয়েছে। কিন্তু পরবর্তীকালে যে গ্রন্থগুলিকে উপনিষদ নামে প্রচারিত করা হয়ে-

ছিল সেগুলি ব্রহ্মবাদ প্রচার করে না। কোনোটি যোগতত্ত্ব প্রচার করে; কোনোটি পুরাতন যুগের ভক্তিবাদ দ্বারা অনুপ্রাণিত। কাজেই সেগুলি কোনো পৌরাণিক দেবতা বা বিশেষ দেবতার অবতাররূপের মহিমা প্রচার করে।

সাধারণত এই তত্ত্বগুলির স্থায়িত্ব ও মর্যাদা বৃদ্ধির জন্যই এই উপায় অবলম্বন করা হয়েছে। সেই কারণে তাদের উপনিষদ শ্রেণীর গ্রন্থরূপে প্রচারিত করা হয়েছে। এমন কি এমন দৃষ্টান্তও পাওয়া যায় যে বিশেষ মতকে প্রাচীন কালের শ্রুতির যুগের উপনিষদ বলে প্রচারের উদ্দেশ্যে তাকে শ্রুতির সাহিত্যের অঙ্গীভূত বলে প্রচার করার চেষ্টা হয়েছে।

তার সুন্দর দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে মহানারায়ণ উপনিষদে। এই উপনিষদখানি ভক্তিবাদ প্রচার করে। অর্থাৎ ঈশ্বর ভক্ত হতে স্বতন্ত্র এবং তাঁর সহিত মানুষের ভক্তির সম্বন্ধ সম্ভব এই কথা বিশ্বাস করে। শ্রুতির যুগের উপনিষদে ব্রহ্মের সঙ্গে তাঁর সৃষ্ট বিশ্বের কোনো ভেদ স্বীকার করা হত না; কাজেই সেখানে ভক্তির অবকাশ ছিল না। নিজেই নিজেকে ত ভক্তি করা যায় না। তবু দেখা যায় মহানারায়ণ উপনিষদকে তৈত্তিরীয় আরণ্যকের অঙ্গ বলে প্রচার করা হয়েছে। অন্য অর্বাচীন উপনিষদগুলি এতদূর অগ্রসর হয়নি। সেগুলি উপনিষদ নামে নিজেদের চিহ্নিত করে নিজস্ব স্থাপিত তত্ত্বকে আভিজাত্যের আসনে স্থাপিত করতে চেষ্টা করেছে।

উপনিষদের ভাগ্যে যা ঘটেছিল উত্তরাধিকার সূত্রে বাদরায়ণ রচিত ব্রহ্মসূত্রের ভাগ্যে অতি বেশী মাত্রায় ঘটেছিল। তারও কারণ একই যে প্রাচীন ভারতীয় দর্শনগুলি বেদের আধিপত্য স্বীকার করেছিল সেগুলি হিন্দু ষড়দর্শন বলে প্রচারিত। প্রত্যেকটি দর্শন প্রথমে সূত্রের আকারে রচিত হয়। তাদের মধ্যে বাদরায়ণ রচিত ব্রহ্মসূত্র সব থেকে বেশী মর্যাদা লাভ করে। তার একটি কারণ ছিল। অন্য দর্শনগুলি বিভিন্ন দার্শনিক চিন্তার ফল; কিন্তু ব্রহ্মসূত্রে প্রাচীন উপনিষদগুলিতে যে চিন্তা বিধৃত আছে

তার একটি সুবিন্যস্ত দার্শনিক রূপ দেবার চেষ্টা হয়েছে। কাজেই প্রাচীন উপনিষদের মর্যাদা ও আভিজাত্য তাতে সংক্রামিত হয়েছিল।

তাই দেখা যায় নানা বিশিষ্ট দার্শনিক নিজেদের প্রবর্তিত দার্শনিক তত্ত্বকে আভিজাত্যের আসনে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য ব্রহ্মসূত্রের ব্যবহার করেছেন। অবশ্য এখানে পরিস্থিতি স্বতন্ত্র হওয়ায় ব্যবহারের রীতি স্বতন্ত্র আকার ধারণ করেছে। উপনিষদের ক্ষেত্রে কেবল তার নাম ব্যবহার করা হয়েছিল। এখানে ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য আকারে বিভিন্ন মতগুলি স্থাপিত হয়েছিল। ব্রহ্মসূত্রের প্রকৃতি তার সহায়ক ছিল বলে এই রীতি প্রয়োগ করা হয়েছিল। সেকালে কোনো বিশেষ তত্ত্বকে কণ্ঠস্থ করে রাখবার সুবিধার জন্য তাকে সূত্র আকারে স্থাপন করা হত। অর্থাৎ বক্তব্যকে যত সংক্ষেপে স্থাপন করা যায় তার চেষ্টা হত। সেই কারণে তার ব্যাখ্যাকে নিজের মনের মত করে পরিচালিত করবার অবসর মিলত। একই কারণে কোনো বিশেষ দার্শনিক তত্ত্বকে স্থায়ী আশ্রয় তথা মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করবার সহজ উপায় হল ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য আকারে তাকে স্থাপন করা।

সুতরাং দেখা যায় প্রাচীন কাল হতে ব্রহ্মসূত্রের উপর অনেক ভাষ্য রচিত হয়ে এসেছে। এইভাবে যেমন শঙ্করাচার্যের অদ্বৈতবাদ ব্রহ্মসূত্রের আশ্রয়ে জন্মলাভ করেছে, তেমন তাঁর দৃষ্টান্তের অনুসরণে অনেকগুলি ভক্তিবাদী দর্শনও ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য আকারে রচিত হয়েছিল। তাদের মধ্যে রামানুজের বিশিষ্টা দ্বৈতবাদ এবং শ্রীচৈতন্য প্রতিপাদিত অচিন্ত্য ভেদাভেদবাদের অনুসরণে রচিত বলদেব বিদ্যাভূষণ রচিত ভাষ্য। এমন কি এই বিংশ শতাব্দীতেও একটি ভক্তিবাদী ভাষ্য রচিত হয়েছে। সে ভাষ্যের নাম শক্তিভাষ্য এবং তার লেখক হলেন বিখ্যাত পণ্ডিত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয়।

এই মনীষীদের প্রতিপাদিত তত্ত্বগুলি সোজাসুজি মৌলিক

গ্রন্থ হিসাবে স্থাপনের কোন ভাষা ছিল না। তবুও যে সেগুলি ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য আকারে স্থাপিত হয়েছিল তার পিছনে একটি উদ্দেশ্য কাজ করেছিল সে উদ্দেশ্য হল তত্ত্বগুলিকে একটি বিশেষ মর্যাদার আমলে অধিষ্ঠিত করা, যাতে তাদের প্রতি মানুষের শ্রদ্ধা আসে এবং সেগুলি দার্শনিক তত্ত্ব হিসাবে স্থায়িত্ব লাভ করে। বর্তমান কালে একই উদ্দেশ্যে নূতন লেখক তাঁর গ্রন্থের ভূমিকা লিখিয়ে নেন সুপরিচিত এবং বিখ্যাত মানুষকে দিয়ে। উভয় ক্ষেত্রেই একই মানসিকতা ক্রিয়াশীল।

২

মহাভারতে সেই মানসিকতার প্রভাব

মহাভারতের ক্ষেত্রেও উত্তরাধিকার সূত্রে উপনিষদ তথা ব্রহ্ম সূত্রের ভাগ্যে যা ঘটেছিল তা ঘটেছিল আরও ব্যাপক আকারে এবং ভিন্ন রীতিতে। উপনিষদের ক্ষেত্রে এই শ্রেণীর নূতন রচনা সাধারণত উপনিষদ নামে চিহ্নিত করে তাকে মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করার চেষ্টা হত। ব্রহ্মসূত্রের ক্ষেত্রে নূতন তত্ত্ব ভাষ্যের আকারে স্থাপিত হত। এখানে রচনাগুলিকে মহাভারতের সহিত সংযুক্ত করে তার অঙ্গীভূত করা হত। উদ্দেশ্য একই। কুরুক্ষেত্রের মহা-যুদ্ধ প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে এক অনন্যসাধারণ ঘটনা। কাজেই তাকে বিষয় করে যে মূলগ্রন্থ রচিত হয়েছিল তার জনপ্রিয়তা ও মর্যাদার সীমা ছিল না। সেই কারণে পরবর্তী কালের লেখকগণ তার প্রতি আকৃষ্ট হতেন। নিজেদের রচনাকে তার অঙ্গীভুত করে দিলে তা যেমন স্থায়ী আশ্রয় পাবে তেমন মর্যাদার পদে অধিষ্ঠিত হবে। তাই এই সংযোজন প্রক্রিয়া মহাভারতের ক্ষেত্রে এমন ব্যাপক হারে শত শত বৎসর ধরে সংঘটিত হয়েছিল।

মহাভারতের সংযোজনের পরিমান এত বেশী হবার আরও একটি কারণ ছিল। উপনিষদের আলোচ্য বিষয় নির্দিষ্ট, ব্রহ্মসূত্রেও

তাই ; কারণ দার্শনিক আলোচনায় তারা নিবেদিত। কাজেই তাদের আশ্রয়ে যে কোন প্রকৃতির রচনা স্থাপন করা যায় না। অপর পক্ষে মহাভারতের মূল কাহিনীর একটি রাজপরিবারের দুই শাখার মধ্যে রাজ্য নিয়ে বিবাদ এবং পরিণতিতে যুদ্ধের সাহায্যে তার মীমাংসা উপজীব্য ছিল। আনুষঙ্গিক ভাবে তাতে সমাজধর্ম, ব্যবহারিফ জীবনের বিভিন্ন সমস্যা, এক কথায় মানব জীবনের সকল দিকই আলোচ্য বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। অতি প্রাচীনকাল হতে তাতে নানা আখ্যায়িকা স্থান পেয়েছে। কাজেই পরবর্তী কালে বহু আখ্যায়িকাকে তা আকর্ষণ করেছে। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের সঙ্গে একটি নৈতিক আদর্শ জড়িত ছিল। ন্যায্য অধিকার স্বীকৃত না হলে তা আদায়ের জন্য এই যুদ্ধ। সুতরাং এটি ধর্ম-যুদ্ধ। এই কারণে ধর্মসম্পর্কিত ও সুনীতি সম্পর্কিত আলো-চনার তাতে স্থান মিলে গেছে। এইভাবে বিভিন্ন প্রকার রচনার সংযোজনের সুযোগ তার মধ্যে সৃষ্টি হয়েছিল।

পরবর্তীকালের লেখকগণ এই পরিস্থিতির পরিপূর্ণ ব্যবহার করেছিলেন। ফলে মহাভারতের সহিত সকল সম্ভাব্য প্রকৃতির রচনা সংযুক্ত হয়েছে। তাতে যেমন ইতিহাস, আখ্যান, দর্শন, ধর্ম নীতি সংযুক্ত হয়েছিল। আখ্যায়িকাগুলি বহু ক্ষেত্রে উচ্চমানের সাহিত্যরূপে গণিত হবার যোগ্য। যেমন তাতে মহৎ দার্শনিক তত্ত্ব এবং নীতিপর্ব বহু প্রজ্ঞাবচন সংযুক্ত হয়েছে। এই ভাবে সংযোজনের ফলে তা যেমন বিরাট আকার ধারণ করেছে তেমন তা মহৎ হয়ে উঠেছে সুতরাং আমরা যে প্রবাদ শুনে থাকি 'যা নাই ভারতে তা নাই ভারতে', সে দাবীর ভিত্তি আছে। (১)

১। এর সহিত তুলনীয় একটি উক্তি মহাভারতেই পাওয়া যায় ঃ

ধর্মে চ অর্থে চ কামে চ মোক্ষে চ ভারতর্ষভ।
যদিহাস্তি তদন্যত্র যন্নেহাস্তি ন কুত্রচিৎ॥

১।১।৩৯০

মহাভারতে সংযোজনের বৈচিত্র

এই প্রসঙ্গে মহাভারতের মধ্যে কত বিভিন্ন প্রকৃতির রচনার সংযোজন ঘটেছে, তার একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া যেতে পারে। প্রথমেই উল্লেখ করা যেতে পারে যে মহাভারতের মূল কাহিনী একটি রাজবংশের দুই শাখার দ্বন্দ্বকে ভিত্তি করে এক মহাযুদ্ধ। সুতরাং তার মূল অংশ গড়ে উঠেছে একটি ঐতিহাসিক ঘটনাকে ঘিরে। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ যে একটি ঐতিহাসিক ঘটনা তা ইতিহাসে স্বীকৃত। কাজেই তা নিয়ে তর্কের অবকাশ নাই। মহাভারতেও তাকে বহু স্থানে ইতিহাস বলে পরিচয় দেওয়া হয়েছে। তবে ইতিহাস শব্দটি সেখানে নানা স্থানে এমন হাল্কা ভাবে ব্যবহার করা হয়েছে যে তার অভিধা অর্থ একরকম চাপা পড়ে গেছে। বহু ক্ষেত্রে তাকে আখ্যায়িকার সমার্থবোধক শব্দ হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে। সে যাই হক, মহাভারতের মূলকাহিনী যখন অন্যসূত্রে ঐতিহাসিক ঘটনা বলে স্বীকৃত হয়েছে তখন ইতিহাসের অভিধা অর্থকে এই ঘটনার ঐতিহাসিকতা প্রমানের জন্য ব্যবহার করবার বিশেষ প্রয়োজন থাকে না।

মহাভারতে অনেক কাহিনী উপাখ্যান নাম দিয়ে সংযোজিত হয়েছে। সাহিত্যগুণে সমৃদ্ধ এবং হৃদয়কে স্পর্শ করে এমন অনেক সুন্দর কাহিনীও এই সূত্রে মহাভারতের অঙ্গীভূত হয়েছে। এই প্রসঙ্গে নল ও দময়ন্তীর উপাখ্যান এবং সাবিত্রী ও সত্যবানের উপাখ্যানের উল্লেখ করা যেতে পারে। প্রাচীন কালের এমন মর্মস্পর্শী কাহিনী খুব কম পাওয়া যায়। পুরাতন বাইবেলের রুথের কাহিনীর কথা কাহিনী দুটি স্মরণ করিয়া দেয়।

বিশ্বের বিভিন্ন সাহিত্যে পরবর্তীকালে নানা জ্ঞানগর্ভ বচন ছোট কাহিনীর সাহায্যে প্রচার করবার রীতি গড়ে উঠেছিল। তা বিশুদ্ধ কাহিনীর আকারেও থাকত আবার অনেক সময় নানা

মনুষ্যেতর জীবকে কাহিনীর চরিত্র হিসাবে ব্যবহার করে তাদের আচরণ ও মন্তব্যের সাহায্যে এই প্রজ্ঞাবচনগুলি পরিস্ফুট করা হত। প্রাচীন গ্রীক সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত ঈশপের কাহিনীগুলি তার সুন্দর উদাহরণ। আমাদের দেশে সংস্কৃতে রচিত পঞ্চতন্ত্র বা হিতোপদেশের কাহিনীগুলিতে এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। আমাদের দেশে আরও প্রাচীন যুগে কোনো লেখক এই শ্রেণীর রচনা লিখলে তার স্থায়ী আশ্রয়ের জন্য তাকে মহাভারতের সহিত যুক্ত করে দিতেন। শান্তিপর্বে তার নিদর্শন পাওয়া যায়। অনাগত বিধাতা, প্রত্যুৎপন্নমতি এবং দীর্ঘসূত্র নামে তিন মৎস্যের কাহিনী সেখানে পাওয়া যায়। বহু শত বৎসর পরে রচিত হিতোপদেশে সে কাহিনী নূতন করে কথিত হয়েছে। কেবল তৃতীয় মাছের নাম পরিবর্তিত করে সেখানে যদ্ভবিষৎ রাখা হয়েছে। অনুরূপ শান্তিপর্বে মার্জার ও মূষিকের কাহিনী ও স্থান পেয়েছে। সেটিও হিতোপদেশে নূতন করে বলা হয়েছে। ‘পুনর্মূষিকো ভব’ কথাটির এই কাহিনীকে অবলম্বন করে জন্ম হয়েছিল। মহাভারতের অঙ্গীভূত রচনার প্রকৃতি কত বিচিত্র ধরনের হতে পারে এটি তার একটি উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত।

ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে কোনো রাজবংশের মর্যাদা বা আভিজাত্য অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য বিশেষ কাহিনী মহাভারতের সহিত সংযুক্ত করা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে উপরিচরের কাহিনীর উল্লেখ করা যেতে পারে। কুরু বংশের রাজা শান্তনু দাশরাজার কন্যা সত্যবতীকে বিবাহ করেছিলেন। কৌরব এবং পান্ডবদের পিতামহ বিচিত্রবীর্য এই সত্যবতীর পুত্র। সত্যবতী যে দাশবংশ হতে উদ্ভুত এই পরিচয় কুরুবংশের মর্যাদার সঙ্গে সঙ্গীত রক্ষা করে না। তাতে আভিজাত্য বিনষ্ট হবার আশঙ্কা আছে। খুব সম্ভব এই সম্ভাবনাকে নির্মূল করবার জন্য রাজা উপরিচরের কাহিনী মহাভারতের আদিপর্বে সংযোজিত করা হয়েছে। (২) তাতে

২। মহাভারত, আদিপর্ব, ৬ষ্ঠ অধ্যায়।

বলা হয়েছে প্রকৃতপক্ষে সত্যবতী দাশরাজার পালিত কন্যা মাত্র। তিনি তাঁর জন্মদাতা পিতা নন এবং উপরিচরই তাঁর জনক। এই উদ্দেশ্যে একটি উদ্ভট কাহিনী স্থাপন করা হয়েছে। তা স্কন্দ পুরাণে স্থাপিত কার্তিকেয়ের যে জন্মকাহিনী বর্ণিত হয়েছে তার সহিত তুলনীয় এই কাহিনী অনুসারে ক্ষত্রিয় রাজা উপরিচর আকাশে বিচরণ করবার ক্ষমতা রাখতেন। এই ভাবে একদিন আকাশে ভ্রাম্যমান অবস্থায় যমুনা নদীতে তাঁর বীর্য নিক্ষিপ্ত হলে তার সংস্পর্শে এসে অদ্রিকা নামে এক মৎস্যরূপিনী অভিসপ্তা অপ্সরার গর্ভসঞ্চার হয়। তিনিই সত্যবতীকে জন্মদান করেন। এই কাহিনী যে একটি বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কল্পিত এবং সংযোজিত হয়েছে তা প্রাসঙ্গিক অবস্থাগুলিই ইঙ্গিত করে। প্রাচীন কালে অনুলোম বিবাহ সমাজে স্বীকৃত ছিল। নিকৃষ্ট কুলের কন্যার পাণিগ্রহণ দোষণীয় ছিল না। কাজেই সত্যবতীর জনকের মর্যাদা এক অপ্রাকৃতিক কাহিনী দ্বারা উন্নীত করার কোনো প্রয়োজন ছিল না।

৪

গীতাও সংযোজন সূত্রে মহাভারতে স্থাপিত

নূতন ধর্মতত্ত্ব ও দর্শনকে আশ্রয় দেবার জন্যও যে মহাভারতে সংযোজন ঘটেছে তার উৎকৃষ্ট উদাহরণ গীতা। তা ভীষ্মপর্বে স্থান পেয়েছে। তা যে মূল মহাভারতে ছিল না, পরবর্তীকালে তার সহিত সংযুক্ত হয়েছিল এটিই আমাদের প্রতিপাদ্য। এ বিষয় বিতর্ক আছে। তাই একটু বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন হয়ে পড়ে।

স্পষ্টই বোঝা যায় গীতার উদ্দেশ্য মহাভারতের বিশিষ্টতম চরিত্র কৃষ্ণকে বিষ্ণুর অবতার রূপে স্থাপন করা। এই উদ্দেশ্য দুই ভাবে সাধন করা হয়েছে। প্রথমত অর্জুনকে শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপ দর্শন করান হয়েছে। দ্বিতীয়ত তিনি যে স্বয়ং বিষ্ণু এবং তাঁর

অবতার হিসাবে ঐতিহাসিক মানুষরূপে জন্মগ্রহণ করেছেন সেই ঘোষণা স্বয়ং কৃষ্ণের মুখে স্থাপন করে। তবে গীতাকার যে এক জন প্রজ্ঞাবান মানুষ ছিলেন সে বিষয় সন্দেহের কোনো অবকাশ নাই। সম্ভবত গীতাকার দুজন ছিলেন; অর্থাৎ গীতারও সং-যোজন ঘটেছে। এখন সন্দেহ পোষণ করবার যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে। বিষয়টি পরবর্তী এক স্বতন্ত্র অধ্যায়ে সবিস্তার আলোচিত হবে। যদি গীতাকার দুজন হন উভয়েই প্রজ্ঞাবান মনীষী ছিলেন। কারণ, দেখা যাবে গীতার স্থাপিত আলোচনার মধ্য দিয়ে একটি অভিনব সমন্বয়ধর্মী দর্শন স্থাপিত হয়েছে। তা সমন্বয়ধর্মী এই কারণে যে তা উপনিষদের ব্রহ্মবাদ এবং তার অব্যবহিত পরের যুগের সাংখ্য-যোগ দর্শনের প্রকৃতি পুরুষতত্ত্ব এবং আরও পরে বিকশিত পৌরাণিক যুগের ভক্তিবাদ আশ্রিত অবতারবাদের মধ্যে একটি সামঞ্জস্য স্থাপনের চেষ্টা করেছে। গীতায় শ্রুতিপ্রস্থান, ন্যায় প্রস্থান ও স্মৃতি প্রস্থানের ত্রিবেণীসঙ্গম ঘটেছে।

এই প্রতিপাদ্যের সমর্থন পাওয়া যাবে গীতার ত্রয়োদশ ও পঞ্চদশ অধ্যায়ের কতকগুলি উক্তির মধ্যে। মোটামুটি দেখা যায় ত্রয়োদশ অধ্যায়ে সমগ্র বিশ্বকে সাংখ্যদর্শনের অনুসরণে প্রকৃতি ও পুরুষ সহ পঁচিশটি তত্ত্বের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। তার পর বলা হয়েছে যে বিশ্বের বিভিন্ন অংশকে সমগ্রভাবে দেখলে, তারা যে একটি মূলশক্তি হতে উদ্ভূত হয়েছে তা বোঝা যায়। এই ভাবে উপনিষদের ব্রহ্মকে পাওয়া যায়। (৩) তারপর এই বিশ্বকে ক্ষেত্র বলা হয়েছে এবং সেই ঐক্যবিধায়ক শক্তিকে ক্ষেত্রী বলা হয়েছে। বলা হয়েছে যেমন সূর্য একা সমগ্র বিশ্বকে প্রকাশ করে তেমন ক্ষেত্রী এই সমগ্র ক্ষেত্রকে প্রকাশ করেন। (৪) এইভাবে

৩। যদা ভূত পৃথগ্‌ভাব মেক স্থমনু পশ্যতি।
তত এব চ বিস্তারং ব্রহ্ম সম্পদ্যতে তদা। ১৫।৩০

৪। যথা প্রকাশয়ত্যেক ঃ কৃৎস্নং লোকমিদং রবি ঃ।
ক্ষেত্রং ক্ষেত্রী তথা কৃৎস্নং প্রকাশয়তি ভারত ॥ ১৫।৩৩

সাংখ্যদর্শনের সহিত উপনিষদের তথা শ্রুতির ব্রহ্মবাদের সামঞ্জস্য স্থাপিত হয়েছে।

তারপর আসে ভক্তিবান আশ্রিত অবতারবাদের সহিত এদের সমন্বয় সাধন। এই সূত্রে পঞ্চদশ অধ্যায়ের কতকগুলি মন্তব্য প্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ে। সেখানে পুরুষোত্তম তত্ত্ব স্থাপন করা হয়েছে। সেই তত্ত্বটি এই ঃ এখানে চার শ্রেণীর পুরুষের কথা বলা হয়েছে। এরা সাংখ্যদর্শনের প্রতিপাদিত পুরুষ নয়। এঁরা হলেন ক্ষর পুরুষ, অক্ষর পুরুষ, উত্তম পুরুষ ও পুরুষোত্তম। ক্ষর পুরুষ হলেন সকল ইতর প্রাণী। (৫) একই শ্লোকে বলা হয়েছে অক্ষর পুরুষ হলেন 'কূটস্থ' অর্থাৎ তাঁর রূপ পরিবর্তন হয় না, তা নিত্য-কালের জিনিষ। তা হলে তা সাংখ্য দর্শনের প্রতিপাদিত 'পুরুষ' হয়ে দাঁড়ায়। তাকে মানবাত্মা বলা যায়। তারপর আসেন উত্তম পুরুষ। এখানে বলা হয়েছে, তিনি তিন লোকে আবিষ্ট হয়ে তাকে ধারণ করেন এবং তাকে ভরণ করেন এবং তাঁর আর এক নাম হল পরমাত্মা। (৬) আর পুরুষোত্তম হলেন স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ; কারণ, তিনি ক্ষর পুরুষ এবং অক্ষর পুরুষ অর্থাৎ মানবাত্মা উভয় হতে উত্তম। (৭) এইভাবে সাংখ্যদর্শনের তত্ত্ব ও অবতারবাদের তত্ত্বের সহিত শ্রুতির ব্রহ্মবাদের সামঞ্জস্য স্থাপনের চেষ্টা হয়েছে।

আমরা মানি ভারতীয় দার্শনিক তথা ধর্ম বিষয়ক চিন্তা কয়েকটি স্তরের মধ্য দিয়ে বিকাশলাভ করেছে। তাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন হল শ্রুতির কর্মকান্ডের স্তর। তখন নানা প্রাকৃতিক শক্তির উপর দেবত্ব আরোপ করে তাঁদের আহ্বান করে তাঁদের উদ্দেশ্যে অগ্নিতে আহুতি দেওয়া হত। ধারণা ছিল দেবতাদের স্তুতি করে সন্তুষ্ট করলে বিপদ হতে ত্রাণ হবে এবং

৫। করঃ সর্বাণি ভূতানি ॥ গীতা। ১৫।১৬

৬। উত্তম ঃ পুরুষস্ত্বন্যঃ পরমাত্মেত্যু দাহৃতঃ
যা লোকত্রয় মাবিশ্য বিভত্যব্যয় ঈশ্বর ঃ ॥ ১৫।১৭

৭। ক্ষরমতীতো হহম ক্ষরাদপি চোত্তমঃ ॥ ১৫।১৮

বাসনা পূরণ হবে, এমন কি স্বর্গপ্রাপ্তি ঘটবে। তারপর আসে বেদের জ্ঞানকান্ড অর্থাৎ উপনিষদের ব্রহ্মবাদ। তখন মানুষ ব্যবহারিক প্রয়োজনের ঊর্দ্ধে উঠে বিশ্বের ধারক যে প্রচ্ছন্ন শক্তি আছেন তাঁকে জানবার জন্য ব্যাকুল হয়েছিল। মানুষ নিজেকে 'সত্যধর্মা' বলত অর্থাৎ পরম সত্যকে জানাই তার ধর্ম। তার মূল আকাঙ্ক্ষা হল 'ধী মহি' তাঁকে যেন বুঝতে পারি। তারপর এল ষড়দর্শনের যুগ। তখন মানুষ সংসার জীবনকে দুঃখময় বিবেচনা করল এবং সেই কারণে জন্মবন্ধন হতে মুক্তিলাভের জন্য দার্শনিক জ্ঞানলাভকে তার উপায় বলে স্বীকৃতি দিল। সবার শেষে এল ভক্তিবাদ এবং তাকে অবলম্বন করে অবতারবাদ। তখন ঈশ্বরকে পৃথকরূপে কল্পনা করা হল, বলা হল তার ব্যক্তিরূপ আছে। তাঁর সহিত ভক্তির সম্বন্ধ সম্ভব। তিনি প্রয়োজন হলে সংসারে মানুষরূপে অবতীর্ণ হন।

সুতরাং দেখা যায় গীতার যা প্রতিপাদ্য তত্ত্ব অর্থাৎ অবতার রূপ ঐতিহাসিক মানুষ কৃষ্ণকে প্রতিষ্ঠিত করা, সেই তত্ত্ব ভারতীয় চিন্তার ইতিহাসে সবার শেষে বিকশিত হয়েছিল। তার পূর্বে তিনটি তত্ত্ব ভারতে পরপর আবির্ভূত হয়েছিল। সেই তিনটি স্তর হল বেদের কর্মকাণ্ডে যজ্ঞের সাহায্যে অভ্যুদয় লাভ; তারপর বেদের জ্ঞানকাণ্ডে উপনিষদকে আশ্রয় করে পারমার্থিক জ্ঞানকে পুরুষার্থরূপে গ্রহণ এবং তারপর জন্মবন্ধন খন্ডনের জন্য জ্ঞানের পথে মুক্তিলাভের তত্ত্ব। গীতায় এদের মধ্যে যজ্ঞকর্মমে ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি বলে নিন্দা করা হয়েছে। অন্য দুটিকে সসম্মানে স্বীকৃতি দিয়ে সর্বশেষে বিকশিত অবতারবাদের সহিত সংযুক্ত করা হয়েছে।

এখন এই ভক্তিবাদ তথা তাতে আশ্রিত অবতারবাদ কবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল তা জানলে তার উদ্ভবকাল নির্ণয় করা সহজ হয়। ভক্তিবাদের অস্তিত্বের প্রমাণ প্রাচীন কালে বিশেষ পাওয়া যায় না। কৃষ্ণের নামের প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় মৌর্য সম্রাট

চন্দ্রগুপ্তের সভার গ্রীক রাজদূত মেগাস্থিনিসের একটি মন্তব্য। তিনি সেখানে বলেছেন যে সুরসেন অঞ্চলে অর্থাৎ মথুরায় কৃষ্ণ বিশেষ জনপ্রিয় ছিলেন এবং সেই প্রসঙ্গে আরও বলেছেন যে গ্রীক বীর হেরাক্লস অর্থাৎ হারকিউলিসের সঙ্গে তিনি তুলনীয়। মেগাস্থিনিস খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীর মানুষ; কিন্তু তাঁর মন্তব্য হতে এমন অনুমান করা যায় না যে কৃষ্ণ তখন অবতার রূপে স্বীকৃত হয়েছেন। (৮) সুতরাং ভক্তিবাদের জন্ম তারিখ নির্ণয় করতে তা বিশেষ সাহায্য করে না।

কৃষ্ণ যে অবতাররূপে স্বীকৃতি লাভ করেছেন তার প্রথম ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া যায় খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীর এক স্তম্ভলিপি হতে। এই স্তম্ভটি বেস নগরে অবস্থিত। তাতে উল্লেখ আছে যে রাজা এনটিয়াল কাইডাসের সভার গ্রীক রাজদূত হেলিওডোরাস দেবাদিদেব বাসুদেবের ভক্ত ছিলেন। সুতরাং অবতারবাদের জন্মতারিখ খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীর আগে স্থাপন করা যায় না। অথচ আমরা জানি মহাভারতের যুদ্ধ উপনিষদের যুগে ঘটেছিল। দেবকী পুত্র কৃষ্ণের নাম ছান্দোগ্য উপনিষদে উল্লিখিত হয়েছে। (৯) প্রবাদ আছে যে বেদব্যাস বেদকে চার ভাগে বিভক্ত করেছিলেন। সুতরাং মহাভারতের প্রথম অংশ রচনার সময় কৃষ্ণ অবতার পদে উন্নীত হন নি।

এই প্রসঙ্গে মহাভারতের আভ্যন্তরীণ প্রমাণও কিছু স্থাপন করা যেতে পারে। এই প্রসঙ্গে মহাভারতের সভাপর্বের কথা এসে পড়ে। রাজসূয় যজ্ঞে সমবেত অতিথিদের মধ্যে একজন বিশিষ্ট মানুষকে অর্ঘ্য দিয়ে সম্মানিত করবার বিধি ছিল। যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞে কে সেই অর্ঘ্য পাবেন সেই প্রশ্ন উঠলে ভীষ্ম প্রস্তাব করলেন কৃষ্ণকেই সেই সম্মানের জন্য নির্বাচিত করা হক। তিনি বৃষ্ণি বংশের সন্তান

৮। History and Culture of Indian People Vol II, P 432

৯। ছান্দোগ্য উপনিষদ। ৩। ১৭। ৬

কৃষ্ণকে অর্হনীয়তম বলে ঘোষণা করলেন। (১০) সুতরাং কৃষ্ণকে একজন গুণবান বিশিষ্ট মানুষ রূপেই এখানে স্থাপন করা হয়েছে।

তারপর দেখা যায় ভীষ্মপর্বের আরম্ভেই অর্জুনের সঙ্গে যুধিষ্ঠিরের কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের ফলাফল নিয়ে যুদ্ধের পূর্বে এক আলোচনা চলছে। সেখানে অর্জুন যুধিষ্ঠিরকে আশ্রয় দিয়ে বলছেন কোন দিকে ধর্ম আর কোন দিকে অধর্ম, কোন দিকে লোভ আর কোন দিকে অনাসক্তি, এই সব বিবেচনা করে অহংকার-বর্জিত মন নিয়ে যুদ্ধ করুন ; যেখানে ধর্ম সেখানে জয় অনিবার্য। (১১) সুতরাং অর্জুন যখন দৃঢ় আত্মপ্রত্যয় নিয়ে যুদ্ধ করতে কৃতসংকল্প তার অব্যবহিত পরে কেন তাঁর এমন হৃদয়দৌর্বল্য ঘটবে যে তিনি যুদ্ধ করতে চাইবেন না।

অতিরিক্তভাবে লক্ষ্য করা যেতে পারে যে গীতার যে পরিবেশ পরিকল্পিত হয়েছে তা একান্তই অস্বাভাবিক। দুই পক্ষের সৈন্য যখন যুদ্ধক্ষেত্রে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে তখন অর্জুন হঠাৎ যুদ্ধ করতে অনিচ্ছা প্রকাশ করলেন এই কারণে যে যাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হচ্ছে তারা সকলেই নিকট আত্মীয় বা বন্ধু—এই প্রতিক্রিয়া নিতান্তই অবাস্তব ঠেকবে। তিনি পূর্ব হতেই জানতেন কাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হবে। এতো নূতন হঠাৎ আবিষ্কার নয়। তারপর বিশ্বাস করতে হবে যে শ্রীকৃষ্ণের তাঁকে বুঝিয়ে যুদ্ধ করতে সম্মতি আদায় করতে যতখানি সময় লাগল ততক্ষণ দুই পক্ষ নীরবে দাঁড়িয়ে রইল। এও রীতিমত অবাস্তব বলে মনে হবে।

আরও দেখা যাবে যে মহাভারতের মধ্যে গীতা যে পরবর্তীকালে সংযোজিত হয়েছিল, তার প্রমাণ ভারতের মধ্যেই নিহিত রয়ে গেছে। গীতা ঐতিহাসিক মানুষ কৃষ্ণকে অবতার পদে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছে, কিন্তু সব দিকে মহাভারতের মধ্যে এই দুই রূপের মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষিত হয় নি। তাই দেখি মহাভারতের নানা স্থানে

১০। বাষ্ণেয়ং মন্যষে কৃষ্ণমর্হনীয়তমং ভুবি। সভাপর্ব। ৬৮। ২৭

১১। যতোধর্মস্ততো জয়ঃ ॥ ভীষ্মপর্ব। ২০। ১২

যেখানে কৃষ্ণের মন্তব্য স্থাপন করা হয়েছে সেখানে কোথাও বলা হয়েছে 'কৃষ্ণ উবাচ' বা 'বাসুদেব উবাচ' আবার কোথাও বলা হয়েছে 'শ্রীভগবান উবাচ'। যেমন সভাপর্বে বলা হয়েছে 'কৃষ্ণ উবাচ' আবার উদ্যোগ পর্বে বলা হয়েছে 'শ্রীভগবান উবাচ।'

৫

ধর্মশাস্ত্রের সংযোজন

অতিরিক্ত ভাবে মহাভারতকে অবলম্বন করে ধর্মশাস্ত্রের অনুশাসন ব্যাপকভাবে নানা সূত্রে প্রচার করা হয়েছে। মনু বলেছেন, স্মৃতিই ধর্মশাস্ত্র (১১) এই শব্দটি এখানে একটি পারিভাষিক অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। তা যজ্ঞকর্ম—আদি আনুষ্ঠানিক কর্ম বোঝায় না। এই পরিভাষার জন্মের একটি ইতিহাস আছে। বেদের যুগে কল্পসূত্র নামে একশ্রেণীর সাহিত্য বেদাঙ্গের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ধর্মসূত্র তার অঙ্গ ছিল। তার আর এক নাম ছিল 'সময়াচারিক সূত্র'। সেগুলি সমকালীন সর্বসম্মত অনুশাসন বা আচরণ সম্বন্ধে নির্দেশ দিত। এগুলি গদ্যে রচিত হত। পরবর্তীকালে পদ্যে রচিত অনুরূপ অনুরূপ অনুশাসন প্রবর্তিত হল। একেই ধর্মশাস্ত্র বা স্মৃতি বলা হত। শ্লোক একটি বিশেষ শ্রেণীর ছন্দ। তাতে দুটি পদ থাকে এবং প্রত্যেক পদে ষোলটি অক্ষর থাকে। তা বৈদিক অনুষ্টুপ ছন্দের অনুসরণে গঠিত। সুতরাং তা প্রাচীনতম সংস্কৃত ছন্দের নিদর্শন। বাল্মীকি রচিত রামায়ণ তথা মহাভারত প্রধানত এই ছন্দে রচিত।

সুতরাং মনুস্মৃতি খুব প্রাচীন গ্রন্থ। যাস্কের নিরুক্তে স্বায়ম্ভুব মনুর উল্লেখ আছে। নিরুক্তের রচনাকাল খৃষ্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দী ধরা হয়। তবে আমরা যে মনুস্মৃতি পাই তাকে এত প্রাচীন বলে পন্ডিতরা স্বীকার করতে চায় না। তাঁদের ধারণা যে মনুর উক্তি বলে প্রচারিত বহু নীতি বচন পূর্বে হতে প্রচলিত

১১। ধর্মশাস্ত্রংতু বৈ স্মৃতি

ছিল যা পরবর্তীকালে মনুস্মৃতির আকারে লিখিত রূপ পেয়েছে।

মনুস্মৃতিতে আছে যে ধর্ম অর্থাৎ আচরণ বিধির উৎস হল দেব অর্থাৎ শ্রুতি, স্মৃতি অর্থাৎ ধর্মশাস্ত্র, শীল এবং আচার। সুতরাং শ্রুতি এবং স্মৃতির অতিরিক্ত আমরা আরও দুটি আচরণ বিধির উৎস পাই। শীলের অর্থ হল কতকগুলি সদ্‌গুন প্রণোদিত আচরণ। হারীত ত্রয়োদশবিধ আচরণের উল্লেখ করেছেন যা ব্রাহ্মণের উপর প্রযোজ্য। সে গুলি হল ঃ দেব-পিতৃভক্তি, সৌম্যতা, অ-পরোপতাপিতা (অর্থাৎ পরকে পীড়া না দেওয়া) অনসূয়তা (অর্থাৎ ঈর্ষা-বর্জন), মৃদুতা, অপারুষ্য, মৈত্রতা, প্রিয়বাদিতা, কৃতজ্ঞতা, শরণ্যতা (অর্থাৎ যে আশ্রয়প্রার্থনা করবে তাকে আশ্রয় দেওয়া), কারুণ্য ও প্রশান্তি।

আচার বলতে মনু ব্যাখ্যা করেছেন ভারতের বিশেষ বিশেষ অঞ্চলের অধিবাসীদের আচরণ। সম্ভবত সেকালে এই অঞ্চলগুলির মানুষদের নীতিবোধ খুব প্রখর ছিল এবং সেই কারণে তাদের আচরণরীতি উচ্চমানের ছিল। এই প্রসঙ্গে তিনি দুটি অঞ্চলের নাম করেছেন ঃ ব্রহ্মাবর্ত ও ব্রহ্মর্ষিদেশ। সরস্বতী ও দৃশদ্বতীর মধ্যে যে অঞ্চল ছিল তাকে ব্রহ্মাবর্ত বলা হত। সরস্বতী নদী বহুকাল লুপ্ত হয়ে গেছে। তা এককালে সিন্ধুর সমান্তরাল রেখায় প্রবাহিত হয়ে আরব মহাসাগরের সহিত মিলিত হয়েছিল। দৃশদ্বতী তার উপনদী। রামায়ণে সরস্বতীর উল্লেখ আছে, কিন্তু মহাভারতে তার উল্লেখ পাওয়া যায় না। বর্তমানে তাকে পূর্ব পাঞ্জাব ও হরিয়ানা অঞ্চল বলে ধরা যায়। এই অঞ্চলের মানুষের আচরণের মনু বিশেষ প্রশংসা করেছেন। (১২) যমুনার দুই পাড়ের অঞ্চল, অর্থাৎ অববাহিকাকে সেকালে ব্রহ্মর্ষিদেশ বলা হত। কুরুক্ষেত্র, মৎস্য, পাঞ্চাল ও সুরসেন তার অন্তর্ভুক্ত ছিল। সুরসেন বর্তমানে মথুরা নামে পরিচিত। মনু বলেছেন এখানকার মানুষের আচরণ অনুসরণ যোগ্য ছিল।

১২। মনু।২।১৮

সুতরাং বোঝা যায় যে, মনুসংহিতায় যে ধর্মশাস্ত্র প্রচারিত হয়েছে তার ভিত্তি হল ধর্মসূত্র, শীল এবং এই দুটি অঞ্চলের আচরণ। তাতে যেমন চারটি আশ্রমের জন্য নির্দিষ্ট ধর্ম সম্বন্ধে নির্দেশ আছে তেমন নারীধর্ম ও রাজধর্মেরও নির্দেশ আছে। আনুষঙ্গিক ভাবে অনেক নীতিগর্ভ বচন ও আছে তাই তৈত্তিরীয় সংহিতায় বলা হয়েছে, মনু যা বলেছেন তা ভেষজের মত কাজ করে। (১৩)

দেখা যায় মহাভারতে বহু স্থানে মনুর বচন উদ্ধৃত হয়েছে। বনপর্বে শান্তিপর্বে, ও অনুশাসন পর্বে মনুর উক্তির ছড়াছড়ি। বিখ্যাত ভারততত্ত্ববিদ্ বুলার্ অনুসন্ধান করে আবিষ্কার করেছেন যে মনুসংহিতা হবে। ২৬০ শ্লোক মহাভারতে সংযুক্ত হয়েছে। (১৪) অর্থাৎ মনুসংহিতায় এক-দশক অংশই তাতে উদ্ধৃত হয়েছে।

১৩। যদ্বৈ মনুরবদৎ তদ্ভেষজম্। তৈত্তিরীয় সংহিতা। ১০।২

১৪। Buhler, The Lauuo of Manu, Chp. LXXX

চতুর্থ অধ্যায়

মহাভারতের রচনাকালের ব্যাপ্তি

১

ব্যাপ্তিকালের অনুসন্ধানের সূত্র

আমরা উপরের আলোচনা হতে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে মহাভারত রচিত হয় শতশত বৎসর ধরে সংযোজন প্রক্রিয়ার সাহায্যে। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে ভারতের আধ্যাত্মিক চিন্তা, ধর্মরীতি এবং সমাজবিন্যাস পরিবর্তিত হয়েছিল। আমরা লক্ষ্য করেছি মহাভারতের মধ্যে তিনটি স্তর এই পরিবর্তনগুলির ভিত্তিতে আবিষ্কার করা যায়। বিভিন্ন স্তরের এই সংযোজনগুলির সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে মহাভারতের নামেরও বিভিন্ন কালে পরিবর্তন সাধিত হয়। তার আদিরূপের নাম ছিল জয়, পরবর্তী রূপের নাম ছিল ভারত বা ভারতেতিহাস এবং পরিণত রূপের নাম ছিল মহাভারত। দ্বিতীয় ও তৃতীয় রূপ সংযোজনের সাহায্যে গড়ে ওঠে। আধ্যাত্মিক চিন্তা, ধর্ম-আচরণ রীতি ও সমাজবিন্যাসের পরিবর্তনের সঙ্গে এই তিনটি রূপের সঙ্গতি লক্ষ্য করা যায়।

যখন তা প্রথম রচিত হয় এবং তাকে 'জয়' নামে ভূষিত করা হয়, তখন তার আলোচ্য বিষয় ছিল কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ সংঘটিত হয় বৈদিক সংস্কৃতির পরিবেশে। তখন বর্ণাশ্রম ধর্ম প্রচলিত ছিল। অর্থাৎ মানুষের জীবনকে চারটি আশ্রমে ভাগ করা হত এবং বৃত্তি অনুসারে চারটি বর্ণ বা শ্রেণীতে ভাগ করা হত। উপাসনা রীতি ছিল যজ্ঞ অনুষ্ঠান। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের অন্যতম নায়ক কৃষ্ণ যে বৈদিক যুগের মানুষ ছিলেন, তার প্রমাণ

আছে। ছান্দোগ্য উপনিষদে তাঁর নামের উল্লেখ আছে। সুতরাং আমরা বেদের রচনাকাল এবং বৈদিক সাহিত্য বা শ্রুতির আশ্রিত প্রাচীন উপনিষদের কাল যদি নির্ভরযোগ্য প্রমাণের সাহায্যে নির্দ্ধারিত করতে পারি তা হলে এই আদিরূপের রচনার তারিখ নিদ্ধারণ করা সম্ভব।

সংযোজনের ফলে মহাভারত যখন আরও বড় আকার ধারণ করে, তখন তার নূতন নাম হয় ভারতেতিহাস। কুরুবংশের প্রতিষ্ঠাতা হলেন দুষ্মন্ত পুত্র ভরত। তাই এই বংশের নাম ভরত বংশ। সুতরাং অনুমান করা যেতে পারে এই সময় ভরতের জন্মকাহিনী হতে কুরুবংশের ইতিহাস মহাভারতে সংযুক্ত হল। এই সময়ই সম্ভবত কতকগুলি প্রাচীন আখ্যায়িকা মহাভারতে সংযুক্ত হয়েছিল। তাদের মধ্যে বনপর্বে স্থাপিত মার্কণ্ডেয় ঋষি বর্ণিত রামোপাখ্যান সম্ভবত অন্যতম। এই উপাখ্যানে বাল্মীকি রচিত রামায়ণে বর্ণিত রামের কাহিনী সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে। এই অংশটিকেও আমরা শ্রুতির যুগের স্তর বলে ধরে নিতে পারি।

তারপর আখ্যায়িকা বা কাহিনীর অতিরিক্ত অনেক নৈতিক নির্দেশ মহাভারতে ব্যাপক আকারে সংযুক্ত হয়েছে। এই বিষয়টিকে ধর্মশাস্ত্র বলা হত। মনুসংহিতায় তা গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ। ধর্মশাস্ত্রে যে নির্দেশ দেওয়া হয়ে থাকে তাকে অনুশাসনও বলে। মহাভারতের একটি সমগ্র পর্ব এই অনুশাসনের আলোচনায় নিবেদিত। তার অতিরিক্তভাবে শান্তিপর্বেরও অধিকাংশ ভাগ জুড়ে এই ধর্মশাস্ত্রের আলোচনা আছে। বনপর্বেও প্রক্ষিপ্ত আকারে তা পাওয়া যাবে। এই অংশগুলি নিশ্চিত ধর্মশাস্ত্রের যুগে সংযোজিত হয়েছে। সুতরাং ধর্মশাস্ত্রের বিকাশকাল সম্বন্ধে যদি আমরা একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি তা হলে কোন সময় এই শ্রেণীর সংযোজনগুলি মহাভারতের অন্তর্ভূক্ত হয়েছিল সে সম্বন্ধে একটা ধারণা করে নেওয়া যায়।

শেষের অবস্থায় মহাভারতের মধ্যে ব্যাপক আকারে বহু সংযোজন ঘটে। তার ফলেই মহাভারত তার পরিণত রূপটি লাভ করে। তার সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করতেই তার মহাভারত নাম দেওয়া হয়েছে। এই সংযোজনগুলি যে চিন্তা বা দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিফলিত করে তা এক নূতন চিন্তা ও সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি। তাকে ভক্তি-বাদের দৃষ্টিভঙ্গি বলতে পারি। তখন উপনিষদের স্থানে ভক্তি-বাদী একেশ্বরবাদ স্থাপিত হয়েছে। বৈদিকযুগের দেবতাদের স্থান নিয়েছেন নানা পৌরাণিক দেবতা। তাদের মধ্যে বিষ্ণু সর্বাধিক মর্যাদার স্থানে অধিষ্ঠিত হয়েছেন। তাকেই ঈশ্বর রূপে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। একটি নূতন তত্ত্ব গড়ে উঠেছে যে সংসারে ধর্মের গ্লানি ঘটলে তিনি মানবরূপ ধারণ করে অবতীর্ণ হন। কৃষ্ণ তাঁর সেই অবতাররূপ। এইভাবে ধর্ম-আচরণ রীতি তখন পরিবর্তিত হয়ে গেছে। জিজ্ঞাসুর দৃষ্টিভঙ্গির স্থান নিয়েছে ভক্তির দৃষ্টিভঙ্গি। যজ্ঞানুষ্ঠানের স্থান নিয়েছে দেবতার মন্দিরে স্থাপিত বিগ্রহের উদ্দেশ্যে পূজা নিবেদন।

মহাভারতের অন্তর্ভুক্ত যে রচনাগুলি এই দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিফলিত করে তাদের আমরা ভক্তিবাদের দৃষ্টিভঙ্গি বলতে পারি। সুতরাং ভারতের অধ্যাত্ম জীবনে ভক্তিবাদের বিকাশ কোন সময় ঘটেছিল সে সম্বন্ধে যদি একটি সিদ্ধান্ত করা সম্ভব হয়, তা হলে এই তৃতীয় শ্রেণীর সংযোজনগুলি কখন মহাভারতে সংযুক্ত হয়েছিল সে সম্বন্ধে একটা ধারণা করা সম্ভব হয়।

সুতরাং শ্রুতির স্তর, ধর্মশাস্ত্রের স্তর এবং ভক্তিবাদের স্তরের বিকাশকাল নির্দ্ধারণ করতে পারলে আমরা বিরাট মহাভারতের বিকাশকালের ব্যাপ্তি সম্বন্ধে একটি নির্ভরযোগ্য সিদ্ধান্তে আসতে পারি। এখানে সেই চেষ্টা করা হবে। আমরা তিন পথে অনু-সন্ধান করব। শ্রুতির যুগের কাল নিয়ে আমরা এই আলোচনা শুরু করতে পারি।

২
কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের কাল

আমরা সিদ্ধান্ত করেছি যে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ শ্রুতির যুগের শেষ দিকে সংঘটিত হয়েছিল। সুতরাং শ্রুতির বিকাশের কাল নির্দ্ধারিত হলে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের সময় নির্ণয় করা সম্ভব হবে। তার পূর্বে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ সম্বন্ধে কয়েকটি প্রচলিত ধারণা সম্বন্ধে আলোচনা করে নিতে পারি।

একটি প্রবাদ আছে যে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ সংঘটিত হয় দ্বাপর যুগের শেষে এবং ঠিক তার অব্যবহিত পরেই কলিযুগ আরম্ভ হয়। তার ভিত্তিতে একটি ধারণা গড়ে উঠেছে যে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের তারিখ হল ৩১০২ খৃষ্টপূর্ব অব্দ। বিখ্যাত জ্যোতিষাচার্য বাণভট্ট বলে গেছেন যে কলির আরম্ভ হয় সেই তারিখে। কারণ, বলা হয় ঠিক কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পর তার আরম্ভ হয়। কিন্তু বরাহমিহির পাণ্ডবদের কাল নির্দ্ধারণ করেছেন খৃষ্টপূর্ব ২২৪৯ অব্দে। অর্থাৎ কলিযুগের আরম্ভের ৬৫৩ বৎসর পূর্বে। এই দুই জ্যোতিষীর গণনায় পরস্পর অনৈক্য থাকায় তাদের নির্ভর-যোগ্যতা হ্রাস পায়। অপর দিকে ঐতিহ্য অনুসারে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ দ্বাপর যুগের মধ্যে সংঘটিত হয়েছিল ধরা হয়। আর্যভট্ট তাকে দ্বাপর ও কলিযুগের ঠিক সন্ধিক্ষণে স্থাপন করেছেন।

অপর দিকে পুরাণগুলিতে যে রাজবংশাবলীর উল্লেখ আছে তার ভিত্তিতেও একটি গণনা পাওয়া যায়। মহাপদ্ম নন্দের পুত্রগণ মগধের সম্রাট ছিলেন বলে ইতিহাসে স্বীকৃত। নন্দ বংশের শেষ রাজা গ্রীক সম্রাট আলেকজাণ্ডারের সমসাময়িক ছিলেন। তিনি যখন ভারত আক্রমণ করেন তার তারিখ হল খৃষ্টপূর্ব ৩২৭ অব্দ। বংশাবলীর হিসাবে দেখা যায় যে অভিমন্যুর পুত্র পরীক্ষিত এবং শেষ নন্দের মধ্যে যতগুলি রাজা পুরুষ পরম্পরায় রাজত্ব করে এসেছেন তাঁদের জীবনকালের ব্যাপ্তি হল ১০১৫ বছর। সেই হিসাব

অনুসারে পরীক্ষিতকে ১৪১৫ খৃষ্টপূর্ব অব্দে স্থাপন করা যায়।

এই হিসাবগুলির মধ্যে পরস্পর অনৈক্য থাকায় বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়। সুতরাং অন্যসূত্র খুঁজতে হবে। আমরা এই প্রসঙ্গে যে দ্বাপর যুগে প্রবাদ অনুসারে মহাভারতের কাহিনীকে স্থাপন করা হয়েছে তার ভিত্তিতে কিছু অনুসন্ধান করে দেখতে পারি।

মহাভারতের মধ্যেই বনপর্বে হনুমানের মুখে বিভিন্ন যুগের একটি বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। (১) সেখানে প্রতিযুগের বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করা হয়েছে। বলা হয়েছে সত্যযুগে মানুষ পূর্ণমাত্রায় ধর্মনিষ্ঠ ছিল; বিভিন্ন বর্ণের কর্মগত কোন বৈষম্য ছিল না; একটি মাত্র বেদ ছিল; যজ্ঞকর্ম তখনও প্রবর্তিত হয় নি। ত্রেতাযুগে ধর্মবোধ এক চতুর্থ অংশ হ্রাস পেয়েছিল। তখনই প্রথম যজ্ঞকর্ম প্রবর্তিত হল; নিজ নিজ বর্ণ অনুসারে মানুষ স্বধর্ম পালন করতে আরম্ভ করল। দ্বাপর যুগে ধর্মনিষ্ঠা দুই ভাগ হ্রাস পেল; বেদ চার ভাগে বিভক্ত হল; শেষে কলিযুগে ধর্মনিষ্ঠা তিন ভাগ হ্রাস পেল; বৈদিক আচার এবং যজ্ঞকর্ম লোপ পেল; কৃষ্ণ কেশব পদে উন্নীত হলেন। কেশব বিষ্ণুর আর এক নাম। অর্থাৎ ঐতিহাসিক মানুষ কৃষ্ণ বিষ্ণুর অবতার রূপে স্বীকৃত হলেন।

এই কথাগুলি পরবর্তীকালের সংযোজন হলেও বহু প্রাচীন কালের কথা। তাতে কয়েকটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য আছে। আমরা পাই সত্যযুগে একটিমাত্র বেদ ছিল এবং ত্রেতাযুগে বেদ চার ভাগে বিভক্ত হয়েছিল। বেদ যে এককালে একটিমাত্র ছিল তা ঐতিহাসিক সত্য। ঋগ্‌বেদ হতে উপাদান নিয়ে প্রধানত সাম ও যজুর্বেদ গঠিত। অথর্ববেদ তুলনায় অর্বাচীন ছিল। ঋগ্‌বেদের পুরুষসূক্তে অথর্ববেদের উল্লেখ নাই। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে বেদকে ত্রয়ী বলা হত, অর্থাৎ তার অঙ্গ ছিল প্রথম তিনটি বেদ। সুতরাং অথর্ববেদ সবার শেষে রচিত হয়েছিল।

আমরা আরও জানি যে ব্যাসমুনি বেদকে নূতন করে বিন্যস্ত

১। বনপর্ব। ১৪৮ অধ্যায়

করে চার ভাগ করেন। তাই তার আর এক নাম বেদব্যাস। তিনি পাণ্ডবদের সমসাময়িক; একরকম পূর্বপুরুষ ছিলেন বলা চলে। উইলসন তাঁর ঋগ্‌বেদের ইংরাজি অনুবাদের ভূমিকায় এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন ব্যাস যুধিষ্ঠিরের রাজত্বকালে বেদকে চার ভাগে ভাগ করেন। (২) এই তথ্যের ভিত্তিতে আমরা অনুমান করতে পারি যে বেদ রচনা আরম্ভ হবার অনেক পরে তার পরিণতির মুখে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল।

উপরে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের যে তারিখগুলি প্রস্তাবিত হয়েছে সেগুলি খৃষ্টপূর্ব পঞ্চদশ শতাব্দী পর্যন্ত কুরুক্ষেত্রের তারিখকে ঠেলে নিয়ে গেছে। সিন্ধু উপত্যকায় বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে যে নূতন প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনগুলি আবিষ্কৃত হয়ে তাদের ভিত্তিতে যে নূতন আলোকপাত হয়েছে, তার সঙ্গে এই তারিখ-গুলি সঙ্গীতি রক্ষা করে না। এই বিষয় ভাল রকম অনুসন্ধানের জন্য একটু বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন হয়ে পড়ে।

প্রাগৈতিহাসিক কালকে বর্তমানে তিনটি যুগে ভাগ করা হয়। একেবারে শৈশবের যুগে মানুষ খাদ্য উৎপাদন করতে শেখেনি। সে অন্য জীব শিকার করে এবং ফল-মূল-আদি সংগ্রহ করে জীবন ধারণ করত। তখন ভোঁতা প্রস্তরখণ্ড তার একমাত্র ব্যবহার্য যন্ত্র ছিল। তাই এই যুগকে পুরাতন প্রস্তর যুগ বলা হয়। তার পরের যুগে এক বিপ্লব এল। সে পশুপালন করতে ও শস্য উৎপাদন করতে শিখল। ফলে সে খাদ্য-উৎপাদনকারী জীবে উন্নীত হল। তখনও তার হাতিয়ার পাথরই রয়ে গেল, তবে সে প্রস্তরখণ্ড আরও মসৃণ ও ধারালো ছিল। তাই তাকে নূতন প্রস্তর যুগ বলা হল। তৃতীয় যুগ এল আর একটি বিপ্লবের মধ্য দিয়ে। তখন স্থিতিশীল জনপদ গড়ে উঠেছে, মানুষ নানা ব্যবহার্য দ্রব্য উৎপাদন করতে শিখেছে, সমাজ গড়ে উঠেছে, এমনকি লেখবার জন্য লিপিও উদ্ভাবিত হয়েছে। তার ফলে এক নগরভিত্তিক সংস্কৃতি গড়ে

২। Wilson, Complete Translation of the Rig Veda, 1860

উঠল। এই নগরভিত্তিক সংস্কৃতির প্রথম আবির্ভাব হয় খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ সহস্রাব্দীর মধ্যে।

এই সংস্কৃতি গড়ে উঠেছিল তিনটি স্থানে মিশর দেশে নীল নদের অববাহিকায় সুমের দেশে তাইগ্রিস ও ইউফ্রেতিস নদীর অববাহিকায় এবং সিন্ধু নদের অববাহিকায়। সিন্ধু উপত্যকার নগরভিত্তিক সংস্কৃতির নিদর্শন আবিষ্কৃত হল মাটি খুঁড়ে হরাপ্পা ও মহেঞ্জোদারো নগরীর ভগ্নাবশেষ উদ্ধার করে। হরপ্পা সংস্কৃতির আবিষ্কারের ফলে ভারতের প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধে ধারণা রীতিমত পরিবর্তিত হয়ে যায়। প্রাচীন ঐতিহাসিক ঘটনার তারিখ সম্বন্ধেও অনেক বিতর্কের নিষ্পত্তি হয়ে যায়।

নূতন চিন্তার ফলে ভারতের প্রাচীন ইতিহাসের রূপ এই রকম দাঁড়িয়েছে। সিন্ধু উপত্যকার হরাপ্পা সংস্কৃতির মানুষ খৃষ্টপূর্ব ৩০০০ অব্দ হতে এক হাজার বছর ধরে তাদের সংস্কৃতি অক্ষুণ্ণ রেখে ভারতের উত্তর পশ্চিম প্রান্তে জীবিত ছিল। তারপর হতে বাহির হতে আগত এক স্বতন্ত্র মানবগোষ্ঠী তাদের আক্রমণ করে। এই নূতন জাতির সংস্কৃতি তুলনায় নিম্নমানের ছিল। এই সংস্কৃতির ধারক মানুষ মূলত পশুপালন এবং শস্য উৎপাদন করে জীবন ধারণ করত। তবে যুদ্ধে তারা দুর্ধর্ষ ছিল। অনুমান করা হয় তারাই বৈদিক সংস্কৃতির ধারক আর্যজাতি।

এখন এই আর্য জাতি বাহির হতে এসেছিল কিনা সে বিষয় বিতর্ক আছে। কোনো কোনো গবেষক দাবী করেন যে আর্যগণ ভারতেরই মানুষ ছিল; তারা বাহির হতে আসে নি। এ বিষয় বিস্তারিত আলোচনা বর্তমান প্রসঙ্গে যুক্তিযুক্ত হবে না। তবে সংক্ষেপে বলা যায় এই প্রতিপাদ্যের বিপক্ষে কতকগুলি তথ্য পাওয়া যায় যাদের তাৎপর্য উপেক্ষা করা যায় না।

প্রথমত লক্ষ্য করা যেতে পারে যে হরাপ্পা ও মহেঞ্জোদারোতে যে সকল প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে, তাদের সাহায্যে নিশ্চিত প্রমাণিত হয় যে খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় সহস্রাব্দীতে সিন্ধু

উপত্যকায় একটি নগরভিত্তিক সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই সংস্কৃতির ধারক মানবগোষ্ঠী আর্যজাতি হতে স্বতন্ত্র ছিল। তা ঋগ্‌বেদের আভ্যন্তরীণ প্রমাণ দ্বারা সমর্থিত হয়। হরাপ্পা সংস্কৃতি নগরকেন্দ্রিক। তাদের নগরগুলি প্রাকার বেষ্ঠিত এবং দুর্গ দিয়ে সুরক্ষিত থাকত। তুলনায় বৈদিক সংস্কৃতি ছিল অরণ্যে স্থাপিত আশ্রম এবং গ্রামকেন্দ্রিক। দুই সংস্কৃতির মানুষ ভিন্ন জাতির অন্তর্ভুক্ত ছিল। ঋগ্‌বেদে স্থানীয় অধিবাসীদের আকৃতি বর্ণনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে তারা কৃষ্ণকায় ছিল এবং তাদের নাক চ্যাপ্টা ছিল। তাদের 'অনাস' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। হরাপ্পা সংস্কৃতির প্রত্নতাত্ত্বিক ধ্বংসাবশেষ হতে যে কঙ্কালগুলি উদ্ধৃত হয়েছে সেগুলি নৃতত্ত্ববিদ্‌দের অভিমত অনুসারে প্রধানত আদি অস্ট্রেলিয় গোষ্ঠীর। (৩) সুতরাং আর্যজাতির আবির্ভাবের পূর্বে ভারতে এক ভিন্ন গোষ্ঠীর মানুষের সৃষ্ট উন্নত নগরভিত্তিক সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠিত ছিল। তা বেশ প্রাচীন ছিল।

দ্বিতীয়ত ঋগ্‌বেদের আভ্যন্তরীণ উক্তি হতে প্রমাণ পাওয়া যায় যে এই গোষ্ঠীর সঙ্গে আর্যজাতির রীতিমত সংঘর্ষ হয়েছিল। তা ইঙ্গিত করে ভারতের ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত হবার পূর্বে এই সংস্কৃতির ধারকদের সহিত যুদ্ধ করে আর্যদের দমন করতে হয়েছিল। ঋগ্‌বেদে বিক্ষিপ্ত আকারে নানা মন্তব্য যা এই সংঘর্ষের পরোক্ষ-ভাবে আভাস দেয়। বৈদিক সাহিত্যে যে জাতির সঙ্গে আর্যদের সংঘর্ষে লিপ্ত হতে হয়েছিল তাদের দস্যু বা দাস বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে বৈদিক দেবতা ইন্দ্রের বীর যোদ্ধার ভূমিকার ঋগ্‌বেদের বিভিন্ন সূক্তে যে আলোচনা আছে, তা উল্লেখ করা যেতে পারে। তেমন একটি ঋকে আছে 'হে ইন্দ্র, তুমি শত্রু ধ্বংসকারীরূপে যুদ্ধ হতে যুদ্ধান্তরে গমন কর, বল প্রয়োগ করে নগরের পর নগর ধ্বংস কর। ইন্দ্রকে যে পুরন্দর' নামে ভূষিত করা হয়েছিল তা ইঙ্গিত তিনি করে বহু নগরী বা দুর্গ ধ্বংস করেছিলেন।

৩। Proto – Australoid.

তৃতীয়ত একটি ভাষাভিত্তিক প্রমাণ পাওয়া যায় যা ইঙ্গিত করে যে এই আর্য জাতি বাহির হতে এসেছিল। সংস্কৃত তথা ইয়োরোপের প্রাচীন ও আধুনিক ভাষাগুলির মধ্যে কিছু মৌলিক সাদৃশ্য দেখা যায়। এই ভাষাগুলিতে যে শব্দগুলিকে মৌলিক বলা যায়, যেমন পারিবারিক সূত্রে সম্বন্ধ (পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগিনী প্রভৃতি, এবং সংখ্যাবাচক শব্দ যেমন এক, দ্বি, ত্রি, চতুঃ ইত্যাদি) তাদের মধ্যে রীতিমত সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে জার্মান ভাষাতত্ত্ববিৎ বপ্। (৫) এই ভাষাগুলিকে এই মৌলিক সাদৃশ্যের ভিত্তিতে একই গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ভাষা বলে ঘোষণা করেন এবং তার নাম দেন ভারত-ইউরোপীয় গোষ্ঠী। (৬) এই তথ্যের ভিত্তিতে বিশিষ্ট ভাষাতত্ত্ববিদ্‌গণ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে এই গোষ্ঠীর ভাষাগুলি, যারা বলে তাদের বহুকাল পূর্বে এক সাধারণ পূর্বপুরুষ গোষ্ঠী ছিল এবং তারা এককালে একই ভাষায় কথা বলত। পরে সম্ভবত জনসংখ্যার চাপে তারা বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়ল এবং দীর্ঘ সময় অতিবাহনের ফলে তাদের ভাষা পরিবর্তিত হয়ে পরস্পরের সহিত পৃথক হয়ে গেল।

এখন প্রশ্ন হল এই আদিম গোষ্ঠীর বাস কোথায় ছিল। লক্ষ্য করা যেতে পারে এই গোষ্ঠীর ভাষাভাষীদের বিস্তার দক্ষিণ-পূর্বে ভারত হতে উত্তর পশ্চিমে সমগ্র ইউরোপ জুড়ে বিস্তৃত। সুতরাং এখন অনুমান করাই যুক্তিযুক্ত যে এই বিরাট ভূমির মধ্যবর্তী অঞ্চলে কোথাও তারা বাস করত। এই যুক্তির ভিত্তিতে কয়েকজন বিশিষ্ট ঐতিহাসিক এই সিদ্ধান্ত করেছেন যে এই আদিগোষ্ঠীর আদিনিবাস ছিল দক্ষিণ রাশিয়াতে বা কাসপিয়ান সাগরের পূর্ব তীরে। তারা খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় হতে তৃতীয় সহস্রাব্দীর মানুষ। এদের জীবিকা ছিল পশুপালন এবং কৃষিকার্য। তারা স্থায়ী জনপদও স্থাপন করত।

৫। Bopp

৬। Indo European Group

এই সকল তথ্যের ভিত্তিতে হুইলার এই সিদ্ধান্ত করেছেন যে প্রাচীন আর্যজাতি উত্তর-পশ্চিম দিক হতে বাহির হতে এসে ভারতে প্রবেশ করেছিল। সেখানে হরাপ্পা সংস্কৃতির ধারক মানবগোষ্ঠীর সহিত তাদের সংঘর্ষ হয় এবং তাদের পরাস্ত করে তারা ভারতে স্থায়ীভাবে বাস করতে আরম্ভ করে। (৭)

পিগোট হুইলারে এই প্রতিপাদ্য গ্রহণ করেছেন তাঁর ধারণায় খৃষ্টপূর্ব দু হাজার শতাব্দীর পরবর্তীকালে একদল ভারত-ইউ-রোপীয় ভাষাভাষি মানুষ ভারত আক্রমণ করেছিল। একই সময়ে ভারতের পশ্চিম সীমান্তে কানাইট(৮) ও মিটানিয়ান(৯) জাতিদের রাজ্য এশিয়া মাইনার অঞ্চলে গড়ে ওঠে। তারাও ভারত ইউ-রোপীয় ভাষাভাষী গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। (১০) এই দুজন গবেষকের সিদ্ধান্ত যুক্তিসম্মত, সুতরাং গ্রহণযোগ্য।

এক্ষেত্রে প্রাচীন আর্যজাতির মূলকীর্তি ঋগ্বেদের কাল নির্ণয় করবার একটি নূতন সূত্র মিলে যায়। আমরা এখনি ভারত-ইয়োরোপীয় ভাষাভাষি মিটানিয়ানদের রাজ্যের কথা উল্লেখ করেছি। তাদের রাজ্য বর্তমান এশিয়া মাইনারের অন্তর্ভুক্ত সিরিয়া রাজ্যের কাছাকাছি অঞ্চলে অবস্থিত ছিল দেখা যায় খৃষ্ট-পূর্ব ষোড়শ শতাব্দীতে হিটাইট নামে এক জাতি এই রাজ্যের দক্ষিণ-পূর্ব প্রান্তে বর্তমান মেসোপোটেমিয়া অঞ্চলে একটি রাজ্য স্থাপন করে। এই দুই রাজ্যের রাজাদের সম্পাদিত একটি চুক্তি পোড়ামাটির ফলক আকারে আবিষ্কৃত হয়েছে। সেটি খৃষ্টপূর্ব ১৩৮০ অব্দে সম্পাদিত হয়েছিল বলে সিদ্ধান্ত হয়েছে। এই দলিলে ঋগ্বেদের পাঁচটি দেবতার নাম উল্লিখিত হয়েছে। তারা হলেন মিন, বরুণ, ইন্দ্র এবং নামত্য ভ্রাতৃদ্বয়।

৭। Wheeler, Indians Civilisation, P 901

৮। Kasito

৯। Mittanian Prehistoric India—Chap VII

১০। Stuart Piggot,

সুতরাং তা হতে প্রমাণিত হয় যে খৃষ্টপূর্ব চতুর্দশ শতাব্দীতে এই অঞ্চলের মানুষ ঋগ্‌বেদের দেবতাদের সহিত পরিচিত ছিল। এই তথ্যের ভিত্তিতে ঋগ্‌বেদের রচনার আরম্ভকাল খৃষ্টপূর্ব পঞ্চদশ শতাব্দীতে স্থাপন করা যায়। এদিকে বৈদিক সাহিত্যের কয়েকটি স্তর পাওয়া যায়। প্রথম রচিত হয় সংহিতা অংশ অর্থাৎ মন্ত্রগুলি; তারপর রচিত হয় ব্রাহ্মণ; তারপর আরণ্যক; সবার শেষে উপনিষদ। সুতরাং এমন অনুমান করা অসঙ্গত হবে না যে প্রাচীন উপনিষদগুলি খৃষ্টপূর্ব দশম শতাব্দীতে রচিত হয়।

এই তথ্যের ভিত্তিতে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের তারিখ নির্দেশ করা সহজ মনে হয়। ছান্দোগ্য উপনিষদে উল্লেখ আছে দেবকী পুত্র কৃষ্ণ ঘোর আঙ্গিরস নামে ঋষির কাছে শিক্ষা নিয়েছিলেন। (১১) সে হেতু তিনি দেবকী পুত্র বলে বর্ণিত তাঁকে মহাভারতের অন্যতম নায়ক কৃষ্ণের সঙ্গে অভিন্ন বলে ধরে নেওয়া যায়। সুতরাং তিনি খৃষ্টপূর্ব দশম শতাব্দীর মানুষ ছিলেন।

এই সিদ্ধান্ত অন্যভাবেও সমর্থিত হয়। বিখ্যাত ভারততত্ত্ববিৎ পার্জিটার পুরাণে উল্লিখিত রাজবংশের ও রাজাদের তালিকার ভিত্তিতে অনুমান করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন যে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ খৃষ্টপূর্ব ৯৫০ অব্দে সংঘটিত হয়েছিল। (১২) অপরপক্ষে ভারতীয় ঐতিহাসিক হেমচন্দ্র রায় চৌধুরী পুরাণের তথ্য নির্ভরযোগ্য নয় বিবেচনা করে বৈদিক সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত ব্রাহ্মনাদি গ্রন্থে উল্লিখিত রাজবংশ, রাজা ও ঋষি পরম্পরার সম্পর্কিত তথ্যের উপর নির্ভর করে একই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন। দুই পক্ষের গবেষণার ফলই এই সিদ্ধান্ত সমর্থন করে যে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ খৃষ্টপূর্ব দশম শতাব্দীতে সংঘটিত হয়। সুতরাং পরীক্ষিতের রাজত্বকালে যদি ব্যাস মহাভারতের আদি অংশ রচনা করে থাকে, তা হলে তার রচনাকাল দাঁড়ায় খৃষ্টপূর্ব দশম শতাব্দী।

১১। ছান্দোগ্য উপনিষদ ।৩।১৭।৬

১২। Pargiter, Ancient Indian Historical Traditions P 182

সম্ভবত মহাভারতের আদি অংশটি রচিত হয়েছিল আরও কিছুকাল পরে। কারণ, মহাভারতও পদ্যে রচিত এবং তার বেশীর ভাগ অংশই শ্লোক নামে চিহ্নিত একটি বিশেষ ছন্দে রচিত হয়েছিল। সম্ভবত ঋগ্বেদের অনুষ্টুপ ছন্দ হতেই এই শ্লোক ছন্দের উৎপত্তি, কারণ উভয়ের অক্ষর সংখ্যা একই। প্রাচীন কাহিনী অনুসারে রামায়ণের কবি বাল্মীকি তা প্রথম ব্যবহার করেন। এমনও হতে পারে যে খৃষ্টপূর্ব দশম শতাব্দীতে শ্লোক ছন্দ উদ্ভাবিত হয়ে গেছে। রামের কাহিনী যদি মহাভারতের কাহিনী পূর্বে ঘটে থাকে তা হলে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের সময় শ্লোক ছন্দের ব্যবহার প্রচলিত ছিল। সে যাই হক মহাভারতের মূল অর্থাৎ আদি অংশের রচনাকালকে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের কিছু কাল পরে স্থাপন করা অসঙ্গত হবে না।

৩

ধর্মশাস্ত্রের কাল

আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি মহাভারতে ধর্মশাস্ত্র হতে সংগৃহীত অনেক তথ্য এবং শ্লোক সংগৃহীত হয়েছে। বর্তমান অনুচ্ছেদে তাদের কাল নির্ধারণের চেষ্টা হবে। এই প্রসঙ্গে ধর্ম শাস্ত্রের প্রকৃতি ও উৎস সম্বন্ধে একটি আলোচনার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। কারণ, বিষয়গুলি পরস্পরের সঙ্গে জড়িত। সেই আলোচনা দিয়ে বর্তমান প্রসঙ্গ শুরু হতে পারে।

ধর্মশাস্ত্রের আলোচ্য বিষয় ঠিক আনুষ্ঠানিক ধর্ম নয়। বৈদিক যুগে আনুষ্ঠানিক ধর্ম ছিল যজ্ঞকর্ম। তা সম্পাদনের জন্য বিস্তারিত নির্দেশ দেবার উদ্দেশ্যে কল্পসূত্র নামে একটি বেদাঙ্গের উৎপত্তি হয় তার অন্তর্ভুক্ত চার প্রকার সূত্র আছে: শ্রৌতসূত্র, গৃহ্যসূত্র, ধর্মসূত্র ও শুল্বসূত্র। এদের মধ্যে শ্রৌতসূত্র ও শুল্বসূত্র পরস্পর সংযুক্ত। শ্রৌতসূত্রে নানা যজ্ঞের বিধান দেওয়া আছে আর শুল্বসূত্রে যজ্ঞের বেদী কিভাবে নির্মিত হবে সে বিষয় নির্দেশ দেওয়া আছে। সুতরাং

এই দুটি অংশ আনুষ্ঠানিক ধর্মের সঙ্গে সংযুক্ত। গৃহ্যসূত্রে হিন্দুদের জাতকর্ম, অন্নপ্রাশন, বিবাহ প্রভৃতি দশবিধ সংস্কার সম্বন্ধে নির্দেশ দেওয়া আছে। বাকি থাকে ধর্মসূত্র। এই ধর্মসূত্রের বিষয় হল নীতিসম্মত আচরণ রীতি। তাতে দৈনন্দিন জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করবার বিধি আছে; অবশ্য পালনীয় কর্তব্য, নীতি সম্মত আচরণ এমন কি ভদ্রতাসূচক আচরণ সম্বন্ধেও নির্দেশ দেওয়া আছে। ধর্মসূত্র বৈদিক সাহিত্যের অঙ্গ তাই তাকে কল্পসূত্রের অন্তর্ভুক্ত আকারে পাওয়া যায়। গৌতমের ধর্মসূত্র এবং আপস্তম্ব ধর্মসূত্র বিশেষ সম্মানের আসনে অধিষ্ঠিত।

ধর্মশাস্ত্র এই ধর্মসূত্রের পরবর্তী রূপ। তা অনুশাসন বা আদর্শ জীবন-যাপন রীতি সম্বন্ধে উপদেশ দেয় বলে তা শাস্ত্র। সুতরাং ধর্মসূত্রের যা বিষয় তা তারও আলোচ্য বিষয়। বৈদিক যুগের শেষে নানা ধর্মশাস্ত্র প্রচলিত ছিল। তাদের মধ্যে হারীতের ধর্মশাস্ত্র বিখ্যাত। কিন্তু ধর্মশাস্ত্রগুলির মধ্যে সব থেকে অধিক মর্যাদায় অধিষ্ঠিত গ্রন্থ হল মনুসংহিতা। তার আর এক নাম মানব ধর্মশাস্ত্র। তাকে মনুস্মৃতি ও বলে। স্মৃতির একটি পারিভাষিক অর্থ আছে। তা শ্রুতি শব্দটির সঙ্গে সংযুক্ত। বেদকে অপৌরুষেয় বলা হত। তা এই বিশ্বাসে আশ্রিত যে ঋষিগণ তা রচনা করেন নি, তা শুনছেন। বলা হয় 'ঋষয়ঃ মন্ত্রদ্রষ্টারঃ'। অর্থাৎ ঋষিরা মন্ত্র রচনা করেন নি, তা দেখেছেন অর্থাৎ শুনেছেন। তাই বেদের সূক্তগুলিকে শ্রুতি বলা হত। তার অন্তর্ভুক্ত ছিল ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ। ধর্মশাস্ত্রকে স্মৃতি বলা হত এই অর্থে যে তা শ্রুতির আশ্রিত এবং শ্রুতির স্মরণে রচিত। অর্থাৎ তা যে নির্দেশ দেয় তা বৈদিক আদর্শের সঙ্গে সঙ্গীত রচনা করে, তা বৈদিক আদর্শ দ্বারা অনুপ্রাণিত।

মনুস্মৃতি হতে যে ২৬০টি শ্লোক মহাভারতের বনপর্ব, শান্তি-পর্ব ও অনুশাসনপর্বে উদ্ধৃত হয়েছে, এ বিষয় পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। তবে মনুস্মৃতি আকারে আমরা বর্তমানে যে গ্রন্থ-

খানি পাই তা যে খুব প্রাচীন, তা নয়। আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি যে তার প্রথম অধ্যায়ে ত্রিমূর্তির দুই দেবতা নারায়ণ ও ব্রহ্মার উল্লেখ আছে এবং সৃষ্টি সম্বন্ধে একটি তত্ত্ব স্থাপিত হয়েছে যা উপনিষদে দার্শনিক তত্ত্বের সঙ্গে সঙ্গীত রক্ষা করে না। সেই কারণে গবেষকদের ধারণা তার রচনাকাল খৃষ্টপূর্ব ২০০ অব্দের আগে স্থাপন করা যায় না। প্রসিদ্ধ ভারততত্ত্ববিৎ বেরিডেল কীথ এই অভিমত পোষণ করেন। (১৩) এই সিদ্ধান্ত যুক্তিসম্মত এবং গ্রহণযোগ্য।

তবে মনুসংহিতার রচনার কাল দ্বারা ধর্মশাস্ত্রের যুগের রচনার কাল নির্ধারিত করা যুক্তিসম্মত হবে না। তার কারণ মনুসংহিতা তার পরিণত রূপটি মাত্র স্থাপন করে। প্রকৃতপক্ষে তা একটি সংকলন গ্রন্থ। বহু প্রাচীনকাল হতে মনু নামে একজন প্রাজ্ঞ ব্যক্তির কথার উল্লেখ পাওয়া যায় এবং তাঁর বাণী প্রবাদবচন রূপে দীর্ঘকাল সম্ভবত মুখে মুখে প্রচলিত ছিল। মনুসংহিতায় সেই বচনগুলি একত্র সংকলিত করে স্থাপন করা হয়েছিল। মনু-স্মৃতির আর এক নাম যে মনুসংহিতা তা অনর্থক হয়নি। তা এই অর্থবহন করে যে তা একটি সংকলন গ্রন্থ। সুতরাং মনুর বচনের উৎস মুখে আমার যেতে হবে।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে সংহিতাকার মনু হতে স্বতন্ত্র একাধিক মনুর নামের উল্লেখ পাওয়া যায়। যেমন বৃহৎ মনু, বৃদ্ধ মনু, স্বায়ম্ভুব মনু। এই স্বায়ম্ভুব মনুর নামাঙ্কিত একটি শ্লোক যাস্কের নিরুক্তে উদ্ধৃত হয়েছে। (১৪) তিনি ছিলেন খৃষ্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দীর মানুষ। সম্ভবত এই পৃথক নামগুলি পৃথক ব্যক্তিকে সূচিত করে ; তবে একথা নিশ্চিত সত্য যে অতি প্রাচীন কালে মনু নামে এক ঋষি ছিলেন এবং তিনি যে প্রজ্ঞাবচন গুলি রেখে গেছেন সেগুলি এমন সারগর্ভ ছিল যে সেগুলি

১৩। A. Bereidale Keith, A History of Sanskrit Literature P. 441

১৪। নিরুক্ত ৩।৪

ভেষজের মত উপকার ছিল। তাই তাঁকে ঘিরে এই প্রবাদবাক্য গড়ে 'যদ্বৈ মনুরবদৎ তদ্ ভেষজম্।' (১৫)

আমরা ঋগ্বেদে মনু নামে এক ঋষির তিন স্থানে উল্লেখ পাই। (১৬) প্রথম মণ্ডলের ১১৪ সূক্তে উল্লেখ করা হয়েছে যে মনু রুদ্র দেবতার অনুগৃহীত রুদ্র তাঁকে রোগমুক্ত করেছিলেন। দ্বিতীয় মণ্ডলের ৩৩ সূক্তে বলা হয়েছে পিতা মনু সুখকর ভেষজ উৎপাদন করেন। এই ভেষজ রোগমুক্তির ভেষজ না সংসার যন্ত্রণা হতে মুক্তির ভেষজ তা বোঝা যায় না। তবে মনু নামে এক প্রাজ্ঞ ব্যক্তি যে সংসারে শান্তিময় জীবন যাপনের উপযুক্ত প্রজ্ঞাবচন রচনা করে খ্যাতিমান হয়েছিলেন তার পরিচয় উপরের উদ্ধৃতি হতে মিলবে।

উপরে স্থাপিত তথ্যগুলির ভিত্তিতে কতকগুলি সিদ্ধান্তে আসা যায়। প্রথম সিদ্ধান্ত হল মনুসংহিতার মনু প্রকৃতপক্ষে বহু প্রাচীনকালের মানুষ। ঋগ্বেদ এবং যাস্কের নিরুক্তে তার সাক্ষ্য আছে। তাঁরা একই ব্যক্তি ছিলেন বা হয়ত বিভিন্ন ব্যক্তি ছিলেন। তবে একথা নিশ্চিত যে তিনি বা তাঁরা মনুসংহিতা নামে প্রচারিত সংকলন গ্রন্থখানি তার বর্তমান রূপ পাবার বহু পূর্বে জীবিত ছিলেন। দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত হল ধর্মশাস্ত্র হল ধর্মসূত্রেরই উত্তরপুরুষ।

এই তথ্যগুলির ভিত্তিতে আমরা ধর্মশাস্ত্রের যুগের কাল সম্বন্ধে একটি নির্ভরযোগ্য ধারণা করে নিতে পারি। ঋগ্বেদে উল্লিখিত মনু বহু প্রাচীনকালের মানুষ। তাঁকে ধর্মশাস্ত্রের প্রবক্তা বলা শক্ত হবে। ধর্মসূত্র যখন বেদাঙ্গের আসনে অধিষ্ঠিত হয়েছে তখন হতেই ধর্মশাস্ত্রের যুগের আরম্ভ ধরা যেতে পারে। কারণ, উভয়ে পরস্পর সংযুক্ত। আমরা দুটি ধর্মসূত্রের নাম উল্লেখ করেছি। গৌতমের ধর্মসূত্র ও আপস্তম্ব ধর্মসূত্র উভয়েই কল্প-সূত্রের অঙ্গ। বিশেষজ্ঞের মতে উভয় ধর্মসূত্রের রচনার কাল

১৫। তৈত্তিরীয় সংহিতা

১৬। ঋগ্বেদ ১।৮০।৬৫, ১।১১৪।২, ২।৩৩।১৩

খৃষ্টপূর্ব ৬০০ হতে ৩০০ অব্দের মধ্যে স্থাপন করা হয়েছে। (১৭) এই তথ্যগুলির ভিত্তিতে এই সিদ্ধান্ত করা যেতে পারে যে ধর্ম-শাস্ত্রের যুগের আরম্ভ সম্ভবত খৃষ্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দী এবং তার সমাপ্তি ভারতে ভক্তিবাদ প্রতিষ্ঠিত হবার পূর্বে। সুতরাং তার ব্যাপ্তিকাল দাঁড়ায় খৃষ্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দী হতে খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দী।

৪

ভক্তিবাদের বিকাশের কাল

মহাভারতের মধ্যে ভক্তিবাদ অনুপ্রাণিত ভাবনার সংযোজন প্রচুর পরিমাণে ঘটেছিল। শ্রুতির যুগ ও ভক্তিবাদের যুগের মাঝখানে ধর্মশাস্ত্রের যুগে কিন্তু বৈদিকযুগের উপাসনা রীতি প্রচলিত ছিল। অর্থাৎ তখনও যজ্ঞকর্ম অনুষ্ঠিত হত এবং দেবতার বা অবতারের বিগ্রহ মন্দিরে স্থাপন করে উপাসনা রীতি প্রচলিত হয় নি। তারও পরে যখন ঈশ্বরের উপর ব্যক্তিত্ব আরোপ করে বিভিন্ন কল্পিত মূর্তির পূজা আরম্ভ হল তখনই তার সমাপ্তি ঘটে এবং ভক্তিবাদের যুগ প্রবর্তিত হয়।

এই প্রসঙ্গে আমাদের দেশে কি ভাবে ধীরে ধীরে ভক্তিবাদ বিকাশলাভ করেছিল, তার একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এখানে স্থাপন করা যেতে পারে। আমরা দেখব তার উৎস ঋগ্বেদ এবং দীর্ঘকাল বীজ আকারে তা সংরক্ষিত থাকার পর অনুকূল পরিবেশ পেয়ে ধীরে ধীরে বিকাশ লাভ করেছিল।

পরিণত অবস্থায় ঋগ্বেদের চিন্তা দুই বিভিন্ন পথে প্রবাহিত হয়। একটি চিন্তা মূল সত্তাকে বিশ্বের মধ্যে প্রচ্ছন্ন থেকে তাকে অখণ্ডতা মণ্ডিত করে বিরাজমান রূপে উপলব্ধি করেছিল। তার পরিচয় মিলবে পুরুষসূক্তে। (১৮) তাই পরবর্তীকালে উপনিষদে

১৭। Cultural Heritage of India, Vol. II The Dharmasutras and the Dharmasastras, V. P. Ramaswamy Sastri

১৮। ঋগ্বেদ ১০।৯০

ব্রহ্মবাদরূপে বিকাশলাভ করেছিল। তা সর্বেশ্বরবাদী অর্থাৎ ঈশ্বরকে এক সর্বব্যাপী নৈর্ব্যক্তিক সত্তা রূপে গ্রহণ করে। অপর চিন্তাটি একেশ্বরবাদের দিকে প্রবাহিত হয়েছিল। তা বিশ্বের মূল সত্তার উপর ব্যক্তিত্ব আরোপ করেছিল। তাকে বীজ আকারে ঋগ্‌বেদের প্রজাপতি সূক্তে পাওয়া যাবে। (১৯) এই পরিকল্পনা অনুসারে ঈশ্বর বিশ্বের স্রষ্টা ও নিয়ামক, তবে তিনি সৃষ্টি হতে পৃথক এবং ব্যক্তিত্ব বিশিষ্ট। এই চিন্তাই পরবর্তীকালে ভক্তিবাদের ঈশ্বরে রূপান্তরিত হয়েছিল। কিন্তু প্রথম চিন্তাটি শ্রুতির আশ্রয়ে প্রাচীন উপনিষদগুলির আশ্রয়ে বিকাশ লাভ করেছিল। তা ঈশ্বরকে সর্বব্যাপী প্রচ্ছন্ন নৈর্ব্যক্তিক সত্তা রূপে কল্পনা করে। সুতরাং সেখানে ভক্তিবাদের অবকাশ ছিল না। দ্বিতীয় চিন্তাটির কিন্তু বিকাশলাভ করবার জন্য দীর্ঘকাল অপেক্ষা করতেহয়েছিল।

উপনিষদের ব্রহ্মবাদ বিকশিত হবার পর ভারতীয় আধ্যাত্মিক চিন্তা এক নূতন পথে চলতে শুরু করে। তার কারণ, দুটি নূতন ধারণা ভারতের মনীষীর মনকে বিব্রত করল। প্রথমটি হল কর্মফল ভোগের জন্য মানুষের পুনরায় জন্ম ঘটে এই বিশ্বাস। দ্বিতীয় ধারণা হল সংসার জীবন একান্তই দুঃখময়। তা ব্যাধি, জরা, মরণ দ্বারা নিপীড়িত। এই দুই ধারণা ক্রমশ শক্তি সঞ্চয় করে বদ্ধমূল ধারণা বা সংস্কারে পরিণত হল। এইভাবে নৈরাশ্যবাদের সঙ্গে জন্মান্তরবাদের সংস্কার যুক্ত হয়ে মানুষের আধ্যাত্মিক চিন্তাকে নূতন পথে প্রবাহিত করল। জন্মান্তর বন্ধন খন্ডন করে মুক্তিলাভই মানুষের পুরুষার্থ বলে স্বীকৃত হল। দার্শনিক তার উপায় সন্ধান করেএই সিদ্ধান্ত দিলেন মুক্তিলাভের উপায় হল যুক্তির পথে বিশ্বরহস্যকে ভেদ করা; অর্থাৎ বিশ্ব রহস্য সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ হলে মুক্তি আসবে। এই বিশ্বাস দ্বারা পরিচালিত হয়ে বিভিন্ন মনীষীর বিশ্বকে জানবার চেষ্টায় কতকগুলি নূতন দর্শন গড়ে উঠল।

১৯। ঋগ্‌বেদ ১০।১২১

এইভাবে ছয়টি হিন্দু দর্শন গড়ে উঠেছিল। তাদের প্রতিপাদ্য হল মানুষের আত্মা জ্ঞানমার্গ অবলম্বন করে মুক্তি লাভ করতে পাবে। ন্যায়সূত্র বলল 'তত্ত্বজ্ঞানাদ্ নিঃশ্রেয়সাধিগমঃ'। অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান লাভ করলে নিঃশ্রেয়স্ বা মুক্তি লাভ করা যায়। এই ভাবে সাংখ্য, যোগ, ন্যায়, বৈশেষিক, এবং উত্তরমীমাংসা দর্শন গড়ে উঠল। পূর্ব মীমাংসার দর্শন এই সময় জন্মগ্রহণ করলেও তার দৃষ্টিভঙ্গি ছিল স্বতন্ত্র। জন্মবন্ধন হতে মুক্তিলাভ নয়, স্বর্গ প্রাপ্তিই তার পুরুষার্থ ; কারণ, সেখানে বিরামহীন, ছেদহীন সুখ লাভ হয়। তার উপায় হল বৈদিক যজ্ঞক্রিয়া। যজ্ঞক্রিয়ায় এমন এক অপূর্ব শক্তির উদ্ভব হয় যা স্বর্গপ্রাপ্তি ঘটতে পারে।

সুতরাং এই যুগেও ভক্তিবাদের বিকাশলাভের সুযোগ ঘটল না ; কারণ ভক্তিবাদ বিকাশলাভ করে হৃদয়বৃত্তিকে অবলম্বন করে। জ্ঞানমার্গ তার প্রতিকূল। এই প্রতিকূলতা সত্ত্বেও ভক্তিবাদের কিছু প্রভাবে যে এই যুগে লক্ষ্য করা যায় না, তা নয়। ভক্তিবাদের অবলম্বন ভক্ত হতে পৃথক ব্যক্তিত্ব বিশিষ্ট ঈশ্বরের পরিকল্পনা। অর্থাৎ তাতে একটি দ্বৈতবোধের প্রয়োজন ; কারণ, ভক্ত ও ঈশ্বরকে অবলম্বন করেই ভক্তির প্রকাশ হয়। এই যুগে ভক্তিবাদের প্রকাশ না ঘটলেও তার উপযোগী পরিবেশ গড়ার একটি আকূতি লক্ষ্য করা যায়। অর্থাৎ বিশেষ ক্ষেত্রে ঈশ্বরের উপর ব্যক্তিত্ব আরোপ করা হয়েছে ; সুতরাং একেশ্বরবাদের আত্মপ্রকাশের চেষ্টা হয়েছে। তবে এই চেষ্টা অতিশয় সংকোচের সহিত ঘটেছে।

এই প্রসঙ্গে লক্ষ্য করা যেতে পারে যে এই যুগে বিকশিত ছয়টি হিন্দুদর্শনই ব্যক্তিরূপী ঈশ্বরকে বিশেষ গুরুত্ব দেয় নি। এদের মধ্যে কেবল ন্যায়দর্শন ও যোগদর্শন ব্যক্তিরূপী ঈশ্বরের কিছু আলোচনা আছে। ন্যায়দর্শনে ঈশ্বরের প্রকৃতি সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা নাই ; কেবল তাঁর অস্তিত্বের প্রমাণ সম্বন্ধে কিছু যুক্তি স্থাপিত হয়েছে। অপর দিকে দেখা যায় যোগ দর্শনের ঈশ্বর যেন একান্তই পঙ্গু। তিনি সর্বশক্তিমান নন। তিনি সাংখ্যদর্শনের

প্রতিপাদিত পঁচিশটি তত্ত্বের একটি অতিরিক্ত তত্ত্ব মাত্র। বিশ্বের সৃষ্টিকে এখানে প্রকৃতি ও পুরুষই মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছে। ঈশ্বরের ভূমিকা হল তিনি যোগ সাধনের সাফল্যে সহায়তা করেন।

ভক্তিবাদ জন্মগ্রহণ করেছিল ষড়দর্শনের যুগের পরে। তার বিকাশের পথে প্রথম পদক্ষেপ হল ভারতীয় চিন্তায় ত্রিমূর্তির পরিকল্পনা তারও উৎস শ্রুতি ; তবে কর্মকান্ড নয়, জ্ঞানকান্ড। মনে হয় ছান্দোগ্য উপনিষদের বাণী তার বীজ আকারে ক্রিয়া করে-ছিল। তা বলেছে, 'থর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলানীতি। (২০) অর্থাৎ বিশ্বের সব কিছুই ব্রহ্মে আশ্রিত ; তাতেই তাদের জন্ম, বিকাশ এবং লয়। সুতরাং মূলসত্তার তিন ভূমিকা। তাঁর আশ্রয়ে বিশ্বের জন্ম হয়, বিকাশ এবং শেষে লয় হয়। মনে হয় এই মন্ত্রটিই ত্রিমূর্তির বীজরূপ। মূলসত্তার তিনটি ভূমিকাকে পৃথকভাবে ভাগ করে প্রতি ভাগকে একটি পৃথক দেবতা রূপে কল্পনা করা হয়েছে। এই ভাবে সৃষ্টির ভূমিকায় ব্রহ্মা অধিষ্ঠিত হয়েছেন, স্থিতির ভূমিকায় বিষ্ণু অধিষ্ঠিত হয়েছেন এবং লয়ের ভূমিকায় মহেশ্বর অধিষ্ঠিত হয়েছেন।

পরবর্তীকালে দেখা যায় ব্রহ্মা তেমন জনপ্রিয় দেবতা হন নি। বিষ্ণু ও শিব প্রাধান্য লাভ করেছেন। শিবের প্রকৃতি পরিবর্তিত হওয়ায় তিনি আশুতোষ নামে ভূষিত হয়েছেন। অতিরিক্তভাবে তাঁরই অঙ্গীভূত শক্তিকে পৃথক করে তাঁর ওপরও দেবত্ব আরোপিত হয়েছে। তিনি শক্তিরূপিনী দুর্জননাশিনী দেবতা। কিন্তু এই দেবতাদের মধ্যে সব থেকে বেশী প্রাধান্য লাভ করেছেন বিষ্ণু। তিনিই সব থেকে জনপ্রিয় দেবতা। তিনি সর্বশক্তিমানরূপে কল্পিত হয়েছেন। শুধু তাই নয় একটি বিশ্বাস গড়ে উঠেছে যে ধর্মের গ্লানি ঘটলে তিনি বিশিষ্টরূপে দুর্গতি মোচনের জন্য অবতীর্ণ হন। তাঁর অবতার রূপে রাম ও কৃষ্ণ স্বীকৃতি লাভ করেছেন। পরিণতিতে কৃষ্ণকে উচ্চতর সম্মানে অধিষ্ঠিত করে বলা হয়েছে

২০। ছান্দোগ্য। ৩।১৪।১

তিনি পরিপূর্ণ অবতার, তিনি স্বয়ং ভগবান। তিনি অবতারী, রাম অবতার মাত্র। এঁদের বিগ্রহ মন্দিরে স্থাপন করে পূজা নিবেদন করা হয়েছে। এইভাবে ভক্তিবাদের পূর্ণরূপ বিকশিত হয়েছে। এই প্রসঙ্গে বলা হয়েছে কলিযুগে ভক্তিই মুক্তির প্রশস্ত পথ।

দুটি আদিকাব্যেই তাদের নায়কদের অবতার পদে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য নানা সংযোজন ঘটেছে মনে হয়। রামায়ণের আদি-কান্ডে এবং উত্তরকান্ডে সংযোজনের সাহায্যে এই তত্ত্ব স্থাপন করা হয়েছে যে তার নায়ক রাম বিষ্ণুর অবতার। অনুরূপভাবে মহা-ভারতের নানা স্থানে সংযোজনের সাহায্যে ঐতিহাসিক মানুষ বসুদেব পুত্র কৃষ্ণকে অবতারে রূপান্তরিত করা হয়েছে। তার মূল ভিত্তি ভীষ্মপর্বে সংযুক্ত গীতা।

ঐতিহাসিক মানুষকে অবতার পদে প্রতিষ্ঠিত করার পশ্চাতে একটি বিশেষ মনোভাব ক্রিয়া করে। তার সহিত পরিচিত হবার প্রয়োজন আছে। এই মনোভাবের সুন্দর আভাস পাওয়া যায় রবীন্দ্রনাথের একটি তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্যের মধ্যে ঃ

॥ আর পাব কোথা ? ॥

দেবতারে প্রিয় করি, প্রিয়েরে দেবতা। (২১)

বাস্তবিকই আমরা যদি কোনো বিশেষ মানুষকে নানা অনন্য-সাধারণ গুণে ভূষিত দেখি তা হলে তাঁর প্রতি প্রথমে শ্রদ্ধার উদয় হয়। তারপর সেই শ্রদ্ধা যখন চূড়ান্ত সীমায় ওঠে তখন সেই মানুষটিকে দেবতার অবতার বলে স্বীকৃতি দিই। সুতরাং অবতারত্ব আন্তরিক শ্রদ্ধার সাক্ষ্য বহন করে। বৈদিক যুগে তা ঘটেছিল রামায়ণের নায়ক রাম এবং মহাভারতের বিশিষ্টতম মানুষ কৃষ্ণের ভাগ্যে। ঐতিহাসিক যুগেও তা একাধিকবার ঘটেছে। বুদ্ধের ভাগ্যে তা ঘটেছিল। হিন্দু সম্প্রদায় এই কারণে তাঁকে অবতার রূপে স্বীকৃতি দিয়েছিল। বৌদ্ধেরা তা পারে না ; কারণ, বৌদ্ধ ধর্মে ঈশ্বর স্বীকৃত হন নি। তবু পরিশেষে বৌদ্ধ সম্প্রদায় এক

২১। রবীন্দ্রনাথ, বৈষ্ণব সঙ্গীত

হিসাবে তাঁকে দেবতার আসনেই অধিষ্ঠিত করেছিল। তাঁর বাণী হতে একদিন বুদ্ধের ব্যক্তিত্ব তাঁর ভক্তদের কাছে বেশী প্রিয় হয়ে উঠেছিল। তাই মহাযান বৌদ্ধধর্ম তাঁর মূর্তি গড়ে মন্দিরে স্থাপন করে তাঁকে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছিল।

এই মনোভাব হতেই মহাভারতে কৃষ্ণকে অবতাররূপে প্রতিষ্ঠিত করবার উদ্দেশ্যে নানা সংযোজন যুক্ত হচ্ছে। অন্যভাবেও মহাভারতের উপর ভক্তিবাদের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। পৌরাণিক দেবতাগণও তার মধ্যে সম্মানের পদে অধিষ্ঠিত হয়েছেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে মূলভারতে দুই স্থানে পৌরাণিক দেবতা দুর্গার পূজার উল্লেখ আছে। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পূর্বে কৃষ্ণ অর্জুনকে যুদ্ধে সাফল্য কামনা করে দুর্গাস্তোত্র পাঠ করতে বলেছেন। (২২) আবার একাদশ বৎসর বনবাস এক বৎসর অজ্ঞাতবাস সফল হবার পর পাণ্ডবগণের দুর্গাস্তব করার উল্লেখ আছে। (২৩) সুতরাং দেখা যায় মহাভারতের মধ্যে ভক্তিবাদ আশ্রিত চিন্তা শুধু অবতাববাদ নয়, পৌরাণিক দেবতার পূজা প্রচারের উদ্দেশ্য দ্বারাও অনুপ্রাণিত হয়েছে। তবে পরবর্তীকালে যে পুরাণগুলি রচিত হয়েছিল তাতে পৌরাণিক দেবতাগণের মহিমা কীর্তনের যে ব্যবস্থা দেখা যায় তা মহাভারতে সংক্রামিত হয় নি।

তবে পরবর্তীকালে যে ধরণের রচনা পুরাণে স্থান পেয়েছিল তাকে মহাভারতে সংযুক্ত করবার চেষ্টা যে আদৌ হয়নি, তা নয়। হরিবংশ ও ভবিষ্য পুরাণকে যে মহাভারতের সহিত সংযুক্ত করার চেষ্টা হয়েছিল তার প্রমাণ মহাভারতেই আছে। ঠিক বলতে কি এক অবস্থায় তাদের মহাভারতের সংকলক তাকে খিল অর্থাৎ পরবর্তী কালে অনুপ্রবিষ্ট বিবেচনা করে বর্জন করেছিলেন। আদিপর্বের অন্তভুক্ত পর্বসংগ্রহ পর্বে তার সুস্পষ্ট উল্লেখ আছে। (২৪) সুতরাং বোঝা যায় হরিবংশ ভবিষ্য পুরাণকে মহাভারতে

২২। উদ্যোগ পর্ব, ২৩তম অধ্যায়

২৩। বিরাট পর্ব, ৫ম অধ্যায়

অনুপ্রবিষ্ট করবার চেষ্টা হয়েছিল ; তবে সে চেষ্টা সফল হয় নি।

এই পর্ব সংগ্রহ পর্বেই একটি তাৎপর্যপূর্ণ শ্লোক পাওয়া যায়। সুতরাং সেটি এখানে উদ্ধৃত করা হল ঃ

অস্যাখ্যানস্য বিষয়ে পুরাণং বর্ততে দ্বিজাঃ।
অন্তরিক্ষস্য বিষয়ে প্রজা ইব চতুর্বিধাঃ ॥ (২৫)

মহাভারতের বিখ্যাত টীকাকার নীলকণ্ঠ শ্লোকটির এই ব্যাখ্যা করেছেন ঃ এই আখ্যানের (মহাভারতের) অন্তর্ভুক্ত নানা বিষয়কে আশ্রয় করে পরবর্তীকালে, অন্তরীক্ষ চর পাখীকে নিয়ে যেমন চার শ্রেণীর প্রাণী আছে, তেমন নানা পুরান লিখিত হয়েছিল। তা ইঙ্গিত করে যে মহাভারতের সহিত সংযোজন প্রক্রিয়া থেমে যাবার পর যখন তা পূর্ণরূপ পেল, তখন পুরাণের আবির্ভাব হল। এই মন্তব্য তথ্য দ্বারা সমর্থিত।

৫

মহাভারতের রচনাকালের ব্যাপ্তি

এখন মহাভারতের আদিরূপ হতে পূর্ণ অবস্থায় রূপান্তরিত হতে কত সময় লেগেছিল, সে বিষয় সিদ্ধান্ত করবার জন্য আমরা এখন প্রস্তুত হয়েছি। মহাভারতের মধ্যে আমরা তিনটি বিভিন্ন যুগের প্রভাব লক্ষ্য করেছি। প্রথম অবস্থায় বৈদিক যুগের প্রভাব লক্ষণীয়, দ্বিতীয় অবস্থায় ধর্মশাস্ত্রের যুগের প্রভাব লক্ষণীয় এবং শেষ অবস্থায় ভক্তিবাদের যুগের প্রভাব লক্ষণীয়। প্রতি যুগের সম্ভাব্য কাল সম্বন্ধে ইতিপূর্বে আমরা একটি সিদ্ধান্ত করে নিয়েছি। তার ভিত্তিতে আমরা এখন মহাভারতের বিকাশের ব্যাপ্তি কতখানি সময় জুড়ে বিস্তৃত সে বিষয় একটি হিসাব করে নিতে পারি।

২৪। আদি পর্ব। ২।৩৭৯ শ্লোকে বলা হয়েছে
খিলেষু হরিবংশচ ভবিষ্যঞ্চ প্রকীর্তিতম্।

২৫। আদি পর্ব। ২।২৮৬

আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে মহাভারতের যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল খৃষ্টপূর্ব দশম শতাব্দীতে বৈদিক যুগের পরিবেশে। সম্ভবত শ্লোক ছন্দের তখন আবির্ভাব হয় এবং মহাভারতের আদি অংশ যাকে 'জয়' নামে অভিহিত করা হয়, তা এই সময় রচিত হয়। তার রচনাকাল খৃষ্টপূর্ব নবম শতাব্দীতে ফেলা যায়। ধর্মশাস্ত্রের যুগ তার পরে। সম্ভবত সেই সময় শান্তিপর্ব এবং অনুশাসন পর্ব রচিত হয়। তারপর খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে দেখি বাসুদেব কৃষ্ণের পূজা প্রচলিত হয়ে গেছে। সুতরাং ধরে নেওয়া যায় তখন ভক্তিবাদ এবং অবতারবাদ প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। সম্ভবত এই সময় বা তার কিছু আগে গীতার অংশটি সংযোজিত হয়েছিল। তারপর দেখি পুরাণগুলির আবির্ভাবের আগে মহাভারত তার পূর্ণরূপ পেয়ে গেছে। তখন পর্ব সংগ্রহ পর্বে তার আলোচ্য বিষয়, পর্ববিন্যাস এবং শ্লোক সংখ্যা নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। এ ক্ষেত্রে পুরাণগুলির রচনাকাল নির্দ্ধারিত হলে মহাভারত রচনার কালিক ব্যাপ্তি ঠিক করা সম্ভব হয়।

আমরা আঠারটি পুরাণ পাই। বিশেষজ্ঞের মতে তাদের মধ্যে বায়ু ও ব্রহ্মাণ্ড পুরান সর্বাপেক্ষা প্রাচীন। ঠিক বলতে কি প্রথম অবস্থায় বায়ু পুরান ব্রহ্মাণ্ড পুরাণের সহিত যুক্ত ছিল। তার রচনাকাল খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে স্থাপন করা হয়; কারণ, তাতে দক্ষিণ ভারতের অন্ধ্র রাজবংশের উল্লেখ আছে। পরবর্তীকালে ব্রহ্মাণ্ড পুরাণকে বিচ্ছিন্ন করে পৃথক গ্রন্থরূপে স্থাপন করা হয়। এই ঘটনার তারিখ ফেলা হয়েছে ৩২৫ খৃষ্টাব্দে; কারণ, তাতে গুপ্তরাজবংশের রাজাদের নামের উল্লেখ আছে। অন্য পুরাণগুলি আরও পরে রচিত হয়। (২৬) সুতরাং ধরা যেতে পারে যে মহাভারতের সংযোজন প্রক্রিয়ার সমাপ্তি ঘটে খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে।

২৬। এই প্রসঙ্গে Cultural Her.iage on India Vol II এর অন্তভুক্ত Rajendra Chandra Hazra লিখিত সন্দর্ভ The Puranas দ্রষ্টব্য

এখন মহাভারতের রচনাকালের ব্যাপ্তি সম্বন্ধে উপরে স্থাপিত তথ্যগুলির ভিত্তিতে একটি হিসাব করে নেওয়া যায়। বিভিন্ন স্তরের রচনার কাল হতে তার সূত্র পাওয়া যাবে। তার মূল বা আদি অংশটি রচিত হয় খৃষ্টপূর্ব দশম শতাব্দীর কিছু পরে এবং তার পূর্ণরূপ পায় নানা সংযোজনের ফলে পুরাণগুলির আবির্ভাবের পূর্বে, অর্থাৎ খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে। কাজেই বলা যায় মহাভারতের রচনার কালিক ব্যাপ্তি এক হাজার বছরের উপর। এমন দৃষ্টান্ত পৃথিবীর সাহিত্যের ইতিহাসে আর মিলবে না। এ বিষয় মহাভারত অনন্যসাধারণ।

এই প্রসঙ্গে বিখ্যাত ভারততত্ত্ববিৎ উইন্টারনিটজ এর মন্তব্যটি অনুবাদে উদ্ধৃত করা যেতে পারে ঃ "মহাভারত তার বর্তমান রূপ পায় খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীর আগে নয় এবং খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর পরে নয়।" (২৭)

এই উক্তিটির একটি ভিত্তি আছে। আমরা পাই চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের রাজসভার গ্রীক দূত মেগাস্থিনিস তাঁর স্মৃতিচারণে বাসুদেব কৃষ্ণের জনপ্রিয়তার কথা উল্লেখ করেছেন। তার ভিত্তিতেই সম্ভবত তিনি পিছনের সময়সীমা নির্দ্ধারণ করেছেন। সম্ভবত তাঁর ধারণায় পুরাণগুলি গুপ্তযুগ হতে রচিত হয়েছে। তাই সামনের দিকের সীমা তিনি খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে স্থাপন করেছেন। কিন্তু কৃষ্ণের জনপ্রিয়তা তাঁর অবতার পদে প্রতিষ্ঠিত হওয়া প্রমাণ করে না। তার সুস্পষ্ট প্রমাণ মেলে এনটিয়ালকাস-এর সভায় গ্রীকদূতের কৃষ্ণভক্তি সূচক বেস নগরের শিলালিপিতে। তার তারিখ খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে। সুতরাং গীতার সংযোজন সেই সময় ঘটা সম্ভব। এটা প্রমাণিত হয়েছে যে পুরাণগুলির মহাভারতে অনুপ্রবেশে নিষিদ্ধ হবার পরই তাদের স্বতন্ত্র আকারে আবির্ভাব ঘটে। বিশেষজ্ঞগণ তার প্রথম আবির্ভাবের কাল খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে স্থাপন করেছেন। তাই সামনের সময়সীমা হিসাবে আমরা তাকেই গ্রহণ করেছি।

২৭। Winternitz, History of Indian Literature, Vol I, P. 405

পঞ্চম অধ্যায়

সংযোজন থামবার কারণ

(১)

সংযোজনের প্রবেশ পথের অবরোধ

উপরের আলোচনায় আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে মহাভারতের যে আদিরূপ ছিল তার সহিত শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে নানা রচনা সংযুক্ত হয়ে তাকে বিরাট গ্রন্থে পরিণত করেছে। এই সংযোজনের এত বিরাটআকারে চেষ্টা কেন হয়েছিল, যে সম্বন্ধে আমরা একটা ধারণা করে নিয়েছি। আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে নানা কবির নানা প্রকৃতির রচনাকে স্থায়িত্ব দেওয়া এবং তাঁদের রচনার প্রচারের উদ্দেশেই এই রীতি অবলম্বিত হয়েছিল। প্রাচীন কালের পরিবেশে একটি সুবিখ্যাত গ্রন্থের আশ্রয় অবলম্বন না করলে দুটি উদ্দেশ্যের কোনোটিই সিদ্ধ হতে পারত না। সেই কারণে যে গ্রন্থ বিশেষ মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত হত, তা যে নাম বহন করে সেই নাম অপরিবর্তিত রেখে তাতে নূতন রচনা সোজাসুজি যুক্ত করে এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করা হত। উপনিষদের ক্ষেত্রে নূতন তত্ত্বের প্রচার সহজলভ্য করার উদ্দেশ্য এই প্রথাটি প্রধানত অবলম্বিত হয়েছিল। মহাভারতের ক্ষেত্রে নূতন রচনাকে স্থায়িত্ব দেওয়াই প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। অবশ্য ভগবদ্‌গীতা তার ব্যতিক্রম।

তা যদি হয় তা হলে প্রশ্ন ওঠে খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতকে এই সংযোজন প্রক্রিয়া থেমে গেল কেন। তখনও ত পূর্বের পরিবেশ বর্তমান ছিল। তখনও পুঁথির আকারে গ্রন্থ রক্ষিত হত, তখনও বর্তমান কালের মত প্রযুক্তিবিদ্যার সাহায্যে সংবাদপত্র, দূরদর্শন প্রভৃতির মাধ্যমে প্রচার কার্যের সুবিধা ছিল না। সুতরাং

এই প্রসঙ্গটি একান্ত যুক্তিসঙ্গত এবং তার একটি সন্তোষজনক মীমাংসার প্রয়োজন।

মনে হয় তার একটি যুক্তিসম্মত উত্তর পাওয়া যায়। এই প্রসঙ্গে প্রথমে কতকগুলি তাৎপর্যপূর্ণ তথ্যের সহিত আমাদের পরিচিত হওয়া প্রয়োজন। সেগুলি সংক্ষেপে নীচে স্থাপিত হল।

প্রথমত লক্ষ্য করা যেতে পারে যে মহাভারতের পর্বসংগ্রহ পর্বে মহাভারতের পূর্ণরূপ সম্বন্ধে একটি সুস্পষ্ঠ পরিচয় দেওয়া আছে। তাতে সুস্পষ্টভাবে উল্লিখিত আছে যে তাতে আঠারটি পর্ব আছে, সেই আঠারটি পর্বের অন্তর্ভুক্ত আলোচ্য বিষয়ের নাম দিয়ে চিহ্নিত একশতটি পর্ব (প্রকৃতপক্ষে উপপর্ব) আছে। তাদের ও পর্ব বলে চিহ্নিত করায় কিছু বিভ্রান্তির অবকাশ থাকে তাই আমরা তাদের উপপর্ব বলে উল্লেখ করব। এই উপপর্বগুলির আলোচ্য বিষয়ের পরিচয় দেয় এমন একটি শিরোনাম দিয়ে শুধু তাদের চিহ্নিত করা হয় নি, প্রতি উপপর্বের অন্তর্ভুক্ত কতগুলি শ্লোক আছে তাও উল্লেখ করা হয়েছে। পর্বসংগ্রহ পর্বে এইভাবে একশতটি উপপর্বের সবিস্তার পরিচয় দিয়ে বলা হয়েছে যে অষ্টা-দশপর্বে মহাভারত সমাপ্ত হয়ে গেছে। এই মন্তব্যটি মহাভারতের বক্তা সৌতির মুখে স্থাপিত হয়েছে (১) এর ফলে নূতন পর্ব বা তার আশ্রিত উপপর্ব সংযোজনের পথে দুর্লঙ্ঘ্য বাধা স্থাপিত হয়েছে। নূতন সংযোজন স্থাপনের আর অবকাশ রাখা হয় নি। পর্ব এবং উপপর্বের আলোচ্য বিষয় নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। অতিরিক্ত ভাবে তাদের জন্য বরাদ্দ শ্লোকগুলির সংখ্যা নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। মহাভারতে যেন এইভাবে এক দুর্ভেদ্য প্রাচীর দিয়ে ঘিরে রাখা হয়েছে। অনুপ্রবেশের সুযোগ রাখা হয় নি।

দ্বিতীয়ত দেখা যায় এই ব্যবস্থা গ্রহণ করার আগে কিছু সংযোজিত অংশ মহাভারত হতে বর্জন করা হয়েছিল। তাতে

১। আদি পর্ব। পর্বসংগ্রহ পর্ব। ৮৪

বোঝা যায় এক অবস্থায় অষ্টাদশ পর্ব হয়ে যাবার পরেও নূতন উপপর্ব সংযোজনের চেষ্টা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে এই শ্লোক দুটি লক্ষ্য করা যেতে পারে ঃ

হরিবংশস্তু পর্ব পুরাণং খিলসংজ্ঞিতম্।
বিষ্ণুপর্ব শিশোশ্চার্ম বিষ্ণোঃ কংস বধস্তথা॥
ভবিষ্যং পর্ব চাপ্যুক্তং খিলেষ্বেতদদ্ভূতং মহৎ।
এ তৎ পর্বশতং পূর্ণং ব্যাসদেবেনোক্তং মহত্মনা!॥ (২)

অর্থাৎ, হরিবংশ নামে পর্ব একটি পুরাণ, তাকে খিল বলে চিহ্নিত করা হয়েছে; বিষ্ণু পর্বে শিশুপাল এবং কংসবধ-সহ ভবিষ্যৎ পর্ব খিল শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। এইগুলি বর্জন করে এক শত উপপর্ব মেলে। মহাত্মা ব্যাস এই কথা বলেন।

কথাগুলি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। এখানে একশতের অতিরিক্ত তিনটি উপপর্ব পূর্বে মহাভারতের সহিত সংযুক্ত হয়েছিল বলে উল্লেখ পাওয়া যায়। আরও পাওয়া যায় যে সেগুলি খিল বলে বিবেচিত হওয়ায় পরে বর্জিত হয়েছিল। আরও লক্ষ্য করা যেতে পারে যে হরিবংশকে এখানে পুরান নামে অভিহিত করা হয়েছে। অন্য দুটি বর্জিত অংশ বিষ্ণুপর্ব এ ভবিষ্যৎ পর্ব পরবর্তী কালে স্বতন্ত্র পুরান নামে প্রচারিত হয়েছিল। পুরাণের জন্ম কোন সূত্র হয়েছিল এই তথ্য তার আভাস দেয়।

তৃতীয়ত, আর একটি রহস্যময় পরিস্থিতির প্রতি আমাদের দৃষ্টি স্বভাবতই আকৃষ্ট হয়ে পড়ে! কতকগুলি গাণিতিক সংখ্যা আছে যাদের প্রাকৃতিক বস্তু বা মানুষের মনের উপর বিশেষ প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। কিছু উদাহরণ স্থাপন করা যেতে পারে। তিন এমন একটি সংখ্যা। প্রাকৃতিক নানা ঘটনার উপর তা সুন্দর ভাবে প্রযোজ্য। যেমন তিনটি সন্ধ্যা। তিন সন্ধ্যায় গায়ত্রী মন্ত্র জপের নির্দেশ আছে। এই তিন সন্ধ্যা। সূর্যের দিবাভাগে আকাশ পথে পরিক্রমণের সময় তিনটি স্থানে অবস্থিতিকে চিহ্নিত করে।

২। আদি পর্ব। পর্বসংগ্রহ পর্ব। ৪২-৪৩

প্রভাতে পূর্বগগন প্রান্তে, মধ্যাহ্নে মধ্যগগনে এবং সূর্যাস্তকালে পশ্চিমগগনপ্রান্তে। তাই ঋগ্বেদে বলা হয়েছে যে সূর্যরূপী বিষ্ণু তিনটি পদক্ষেপে গগন পরিক্রমা করেন। তারপর পাই সাংখ্যাদর্শনে প্রতিপাদিত তিনটি গুণঃ সত্ত, রজঃ ও তমঃ। তারা বিভিন্ন পদার্থের তিনটি স্বাভাবিক অবস্থা সূচিত করে। পাশ্চাত্য দর্শনে তার ভিত্তিতে সংঘাতের ছন্দে চিন্তার বিকাশে তিনটি পদক্ষেপ কল্পিত হয়েছে। আমরা আরও দেখি যে এই 'তিন' সংখ্যাটি দ্বারা প্রভাবিত কত ধারণা এসেছে। যেমন, ত্রয়ী, ত্রিরত্ন ত্রিমূর্তি প্রভৃতি।

'সাত' সংখ্যাটিও অনুরূপ জাদুশক্তি ধারণ করে। তার প্রভাবও প্রকৃতির রাজ্যে বিলক্ষণ লক্ষিত হয়। রামধনুর রঙ সাতটি। তারা সূর্যের রশ্মির উপাদান। তাই ঋগ্বেদের ঋষি বলেছেন সূর্যের রথ সাতটি বিভিন্ন রঙের কিরণরূপী অশ্বদ্বারা পরিচালিত হয়। রাত্রিকালে উত্তর গগনে ধ্রুবতারাকে কেন্দ্র করে সপ্তর্ষি নক্ষত্র মন্ডলী চক্রাকারে আবর্তিত হয়। এমন কি সপ্তপর্ণী নামে একটি গাছও আছে যা সাতপাতার গুচ্ছ নিয়ে নিজেকে ভূষিত করে সাত সংখ্যাটির প্রতি আনুগত্য ঘোষণা করে। মানুষের উপরও তার প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। সপ্তাহের সাতটি দিন তার উদাহরণ। তার ভিত্তিও প্রাকৃতিক গ্রহ-নক্ষত্রের বিন্যাস। তাদের মধ্যে পড়ে খালি চোখে দেখা যায় এমন পাঁচটি নিকটবর্তী গ্রহ, চন্দ্র ও সূর্য।

অনুরূপভাবে মহাভারতের উপর 'আঠার' সংখ্যাটির রীতিমত জাদুশক্তির প্রভাব লক্ষণীয়। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ হয়েছিল আঠার দিন ধরে। সেই যুদ্ধে নিহত হয়েছিল আঠার অক্ষৌহিনী সৈন্য। মহাভারতের পর্বসংখ্যা আঠার। তাই কি গীতার অধ্যায় সংখ্যাও আঠার? সেই জাদুশক্তির প্রভাবেই কি পুরাণগুলির সংখ্যাও আঠার? বিষয়টি রীতিমত রহস্যময় ঠেকে। তবে একথা নিশ্চিত যে মহাভারতের পরিণত রূপে আঠারটি পর্বে সমাপ্তি তার ওপর সংযোজন ক্রিয়া সম্পূর্ণ নিরুদ্ধ করে দিয়েছিল। আঠার সংখ্যার

জাদুশক্তিই এখানে প্রহরীর ভূমিকা গ্রহণ করেছিল মনে হয়।

উপরে স্থাপিত তথ্যগুলির ভিত্তিতে মহাভারতে সংযোজন প্রক্রিয়া থামল কেন তার একটি সন্তোষজনক উত্তর মিলবে মনে হয়। প্রথমে দেখা যায় পর্বসংগ্রহ পর্বে একটি সূচীপত্র এবং আলোচ্য বিষয়গুলিতে নির্বেদিত শ্লোকসংখ্যা নির্দিষ্টভাবে উল্লিখিত হওয়ায় সংযোজনের আর অবকাশ থাকল না। দ্বিতীয়ত শেষ অবস্থায় যেগুলি পরে পুরাণের রূপে প্রচারিত হয়েছে সেগুলি খিল বিবেচিত হয়ে বর্জিত হওয়ায় এই প্রকৃতির সংযোজন করবার উৎসাহ শিথিল হয়ে গিয়েছিল। তৃতীয়ত খুব সম্ভব অষ্টাদশ সংখ্যার জাদুশক্তি সংযোজনকে প্রতিরোধ করল। তবে মূল কারণ নিশ্চিত পর্বসংগ্রহ পর্বের সাহায্যে মহাভারতের একটি অপরিবর্তনীয় রূপ গঠিত হওয়া।

২

পুরাণের জন্মকথা

এই প্রসঙ্গে একটি বিষয় লক্ষ্য করা যেতে পারে। পর্বসংগ্রহ পর্বের ভূমিকা শুধু মহাভারতের সংযোজন প্রক্রিয়াকে থামিয়ে দেওয়ায় সীমিত ছিল না, তার আরও একটি ভূমিকা ছিল। সংযোজনকে বন্ধ করে দেওয়া তার নেতিবাচক দিক। তার একটি ইতিবাচক দিকও ছিল। তা হল পুরাণের জন্মের অনুকূল পরিবেশ রচনা করে তার জন্ম সংঘটিত করা। সুতরাং পর্বসংগ্রহ পর্বের সঙ্গে পুরাণের জন্মের ইতিহাস সংযুক্ত হয়ে আছে।

এই প্রতিপাদ্যের সপক্ষে কিছু প্রমাণ এখানে স্থাপন করা যেতে পারে। এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে যে আমরা ইতিপূর্বে লক্ষ্য করেছি যে বিষ্ণুপর্ব ও ভবিষ্যপর্ব নামে মহাভারতে এককালে দুটি পর্ব সংযুক্ত হয়েছিল। কিন্তু পরে খিল বিবেচিত হয়ে সেগুলি বর্জিত হয়। পরবর্তীকালে দেখা যায় যে বিষ্ণুপুরাণ এবং ভবিষ্য পুরাণ নামে দুটি পুরাণ অষ্টাদশ পুরাণের মধ্যে স্থান

পেয়েছে! সুতরাং আমাদের প্রতিপাদ্য হবে পুরাণগুলির যা আলোচ্য বিষয় তাকে মহাভারতের অন্তর্ভুক্ত করবার চেষ্টা হয়েছিল। কিন্তু পরিণতিতে সেগুলি শুধু বর্জিত হয় নি, তাদের অনুপ্রবেশ নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। তার ফলে বিকল্প ব্যবস্থা হিসাবে স্বতন্ত্র শ্রেণীর গ্রন্থ আকারে পুরাণ নাম দিয়ে তাদের প্রচার আরম্ভ হয়।

এই প্রতিপাদ্যের যুক্তিযুক্ততার বিচারের জন্য প্রথমে পুরাণ সম্বন্ধে কিছু তথ্য স্থাপনের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। আমরা প্রথমে পুরাণগুলির আলোচ্য বিষয় কি সে সম্বন্ধে আলোচনা করে নিতে পারি। আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে দুটি বিভিন্ন উক্তি পাওয়া যায়। একটিতে পুরাণের পাঁচটি লক্ষণ উল্লিখিত হয়েছে। অপরটিতে দশটি লক্ষণ দেওয়া হয়েছে। (৩) সুতরাং দ্বিতীয়টির ভিত্তিতে আলোচনা হতে পারে। পুরাণের যে দশটি লক্ষণ উল্লিখিত হয়েছে সেগুলি হল এই। আলোচ্য বিষয়ের ভিত্তিতেই লক্ষণগুলি বর্ণিত:

সর্গ—সৃষ্টি বিষয়ক আলোচনা;
বিসর্গ—সংহার বা প্রলয় বিষয়ক আলোচনা;
বৃত্তি—বিভিন্ন মানুষের জীবিকার অবলম্বন;
রক্ষা—সৃষ্টির সংরক্ষণ বা স্থিতি বিষয়ক আলোচনা;
অন্তরা—মন্বন্তর, এক যুগ হতে অন্য যুগে সংক্রমণ;
বংশ—বিভিন্ন রাজবংশের আলোচনা;
বংশ্যানুচরিত—বিশেষ বংশের মানুষের কীর্তি;
সংস্থা—আশ্রয়;
হেতু—কারণাদি বিশ্লেষণ;
অপাশ্রয়—আশ্রয় হতে ভ্রংশ।

এখন দেখা যেতে পারে আঠারখানি পুরাণে যা পাওয়া তার আলোচ্য বিষয় কি। আমরা দেখি যে এই পুরাণগুলির মূল

৩। শব্দকল্পদ্রুম।

ভূমিকা হয়ে দাঁড়িয়েছে বিভিন্ন দেবতার মহিমা কীর্তন এবং তাঁদের সহিত সংযুক্ত চরিত্র এবং তাঁদের মহিমাকীর্তন। এই নীতির ভিত্তিতে এই আঠারখানি পুরাণকে চারটি শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করা যায়। এই নীতিপ্রয়োগের ফল তাদের শ্রেনীবিন্যাস এই রকম দাঁড়ায়। কতকগুলি প্রধান পৌরাণিক দেবতাকে বিষয় করে সেগুলি রচিত। প্রধানত তাঁরা ত্রিমূর্তির অন্তভুক্ত তিনটি প্রধান দেবতা। অতিরিক্ত ভাবে কিছু বৈদিক দেবতাও তাদের উপজীব্য। এই ভাবে শ্রেণী বিন্যাস এই রকম দাঁড়ায়ঃ

১। ব্রহ্মা বিষয়ক পুরাণ—ব্রহ্ম পুরাণ, ব্রহ্মান্ড পুরাণ,

২। বিষ্ণু বিষয়ক পুরাণ—বিষ্ণুপুরাণ, ভগবত পুরাণ, বরাহ পুরাণ, বামন পুরাণ, কূর্ম পুরাণ, মৎস্য পুরাণ, নারদীয় পুরাণ, পদ্ম পুরাণ ব্রহ্ম বৈবর্ত পুরাণ, অগ্নি পুরাণ।

৩। শিব বিষয়ক পুরাণ—শৈব পুরাণ, লিঙ্গ পুরাণ, মার্কণ্ডেয় পুরাণ, মৎস্য পুরাণ।

৪। মিশ্র শ্রেণীর পুরাণ—বায়ু পুরাণ, ভবিষ্য পুরাণ।

এদের মধ্যে বিষ্ণু ও মহেশই পুরাণের যুগের সব থেকে প্রিয় দেবতা। তাই বেশির ভাগ পুরাণই এঁদের পরিচয় দানে নিবেদিত। আবার এঁদের মধ্যে বিষ্ণুই অধিকতর জনপ্রিয়। একটি বিশ্বাস গড়ে উঠেছিল যে সংকটের সময় বিষ্ণু নানারূপে অবতীর্ণ হয়ে সংকটমোচন করেন। তাই দেখি তাঁর অবতার রূপগুলির উপর অনেক পুরাণ রচিত হয়েছিল, এই শ্রেণীতে পড়ে বরাহ, বামন, কূর্ম, মৎস্য এবং ভাগবত। ভাগবত পুরাণ তাঁর কৃষ্ণরূপে অবতারকে বিশেষ মর্যাদা দিয়েছে। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণেও কৃষ্ণের ভূমিকা আছে। এখানেই রাধার প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায়। গরুড় এবং নারদ বিষ্ণুর সেবক হিসাবে তাঁদের নামে চিহ্নিত পুরাণ রচনা দ্বারা সম্মানিত হয়েছেন। অগ্নি পুরাণও এই শ্রেণীতে পড়ে; কারণ তাতে বিষ্ণুপূজা এবং শালগ্রাম শিলা পূজার সাহায্যে আলোচিত।

জনপ্রিয়তায় তারপরে আসেন শিব বা মহেশ্বর। তাই দেখা যায় তাঁর বিষয় নিবেদিত অনেকগুলি পুরাণ আছে। এদের মধ্যে পড়ে শৈব; লিঙ্গ, মার্কণ্ডেয় ও স্কন্দ পুরাণ। মার্কণ্ডেয় পুরাণে শিবের অঙ্গীভূত শক্তিকে চণ্ডীরূপে পৃথকভাবে কল্পনা করা হয়েছে। চণ্ডীসপ্তশতী এই পুরাণের অন্তর্ভুক্ত। বাঙালীর কাছে দুর্গাপূজা জাতীয় উৎসবের মর্যাদায় উন্নীত। তার উৎস হল এই চণ্ডী পুরাণটি। স্কন্দ শিবের পুত্র কার্তিকেয়ের নামে নিবেদিত।

ব্রহ্মা তুলনায় তিন মূল পৌরাণিক দেবতার মধ্যে সর্বাপেক্ষা অবহেলিত, তিনি কেবল দেবতাদের পিতামহ বলে সম্মানিত। কারণ, তার মানস পুত্রাদি হতে দেব, অসুর ইত্যাদির উৎপত্তি। তবু তাঁর নামে একখানি পুরাণ পাওয়া যায় যা ব্রাহ্ম পুরাণ বা ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ নামে পরিচিত। তার আলোচ্য বিষয় হল প্রজাপতি দেব, অসুর, যক্ষ প্রভৃতির উৎপত্তি কাহিনী।

চতুর্থ শ্রেণীকে মিশ্রশ্রেণী বলতে পারি। কারণ, এই পুরাণ গুলিতে ত্রিমূর্তির অঙ্গীভূত নয় এমন কতকগুলি বিষয়ও আলোচিত হয়েছে। এই শ্রেণীতে পড়ে বায়ু পদ্ম এবং ভবিষ্য পুরাণ। বায়ুপুরাণে নানা তীর্থের কথা আছে। ব্রহ্মা হরি ও শিবের কথাও আছে। সুতরাং তাতে ত্রিমূর্তির তিনটি দেবতাই স্থান পেয়েছেন। পদ্মপুরাণে ব্রহ্মা, মাধব ও রামের কথা আছে। ভবিষ্য পুরাণে বিষ্ণু ও শিবকে মোক্ষ প্রাপ্তির সহায়ক বলে বর্ণনা করা হয়েছে। ভারতের পরবর্তীকালের ইতিহাসেরও আভাস তাতে মিলবে।

সুতরাং দেখা যাবে যে পুরাণগুলির যে দশটি লক্ষণ উল্লিখিত হয়েছে সবগুলি সকল ক্ষেত্রে পাওয়া যায় না। কাজেই অভিধানে বর্ণিত লক্ষণগুলি দ্বারা তাদের সঠিক পরিচয় পাওয়া যায় না। মোটামুটি বলা যায়, যে বিষয়গুলি পুরাণে আলোচিত হয়েছে তাদের মধ্যে আছে দেবতাদের মহিমাকীর্তন, নানা কাহিনী এবং ধর্ম ও সমাজনীতি সম্বন্ধে আলোচনা। তবে তিনটি মূল পৌরাণিক

দেবতাদের কীর্তি ওকাহিনী বিষয়ক আলোচনাই প্রাধান্য পেয়েছে। তাদের মধ্যে আবার বিষ্ণু সর্বাধিক প্রাধান্য পেয়েছেন। এমন কি তাঁর নানা অবতারকে বিষয় করে বিভিন্ন পুরাণ রচিত হয়েছে।

এই প্রসঙ্গে আর একটি বিষয় লক্ষ্য করা যেতে পারে। দেখা যাবে মহাভারতে সংযোজনের পথ বন্ধ হয়ে যাবার পর হতেই পুরাণগুলির আবির্ভাব হয়। গবেষকদের ধারণায় সব থেকে প্রাচীন উপনিষদ হল বায়ু ও ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ। প্রথম দিকে তারা একই সঙ্গে যুক্ত ছিল। বায়ুপুরাণে পশ্চিম ভারতের অন্ধ্র রাজবংশের উল্লেখ আছে। তাই তাকে খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে স্থাপন করা হয়েছে যে। অনুমান করা হয়েছে ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ খৃষ্টীয় ৩২৫ অব্দে বায়ুপুরাণ হতে পৃথক করা হয়। তাতে গুপ্ত রাজবংশের উল্লেখ আছে। বিষ্ণু পুরাণকে খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে স্থাপন করা হয়। মার্কণ্ডেয় পুরাণকেও প্রাচীন বলে বিবেচনা করা হয়। তবে বিশেষজ্ঞদের মতে চণ্ডীসপ্তশতী তাতে খৃষ্টীয় ৬০০ অব্দে সংযোজন করা হয়। বিখ্যাত ভাগবত পুরাণকে ষষ্ঠ শতাব্দীতে স্থাপন করা হয়েছে। মৎস্য, বরাহ, লিঙ্গ এগুলি অর্বাচীন পুরাণ। বরাহ পুরাণকে খৃষ্টীয় ১১০০ অব্দে স্থাপন করা হয়েছে। সুতরাং পুরাণগুলির রচনাকালও কয়েক শতাব্দী জুড়ে ব্যাপ্ত ছিল। যে তথ্যটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ, তা হল মহাভারতের পূর্ণরূপ পাবার পরই পুরাণ রচনা আরম্ভ হয়েছিল।

এই তথ্যগুলি হতে অনুমান করা যায় যে প্রাচীনকালে একশ্রেণীর লেখক যে উদ্দেশ্যে মহাভারতের আশ্রয় নিতেন সেই উদ্দেশ্যেই পরবর্তীকালে তারা পুরাণ রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। দুই যুগের সন্ধিক্ষণে কিছু রচনা মহাভারতের সহিত যুক্ত করার চেষ্টা হয়েছিল। কিন্তু সেগুলি খিল বলে প্রত্যাখ্যাত হবার পর পরবর্তী কালে আর মহাভারতের সঙ্গে নূতন রচনার সংযোজনের চেষ্টা হয় নি। বিকল্প ব্যবস্থা হিসাবে স্বতন্ত্র প্রকৃতির গ্রন্থের আকারে পুরাণ নাম দিয়ে তাদের প্রচার করা হয়।

সুতরাং আমাদের সিদ্ধান্ত এই দাঁড়ায় যে পর্বসংগ্রহ পর্বে সংযোজনের পথ একেবারে অবরুদ্ধ হয়ে যাবার ফলে। কাজেই সেই সময় মহাভারত তার বর্তমান রূপে স্থিতিশীলতা পায়। তারই প্রতিক্রিয়া হিসাবে অষ্টাদশ পুরাণের জন্ম।

৩

পুরাণ নামকরণের তাৎপর্য

আমরা আরও দেখব যে এই শ্রেণীর রচনাগুলির পুরাণ নামে প্রচারিত করারও একটি তাৎপর্য ছিল। এই নামে তাদের অকারণে চিহ্নিত করা হয় নি। সেই কারণ আবিষ্কার করতে হলে আমাদের পুরাণ নামে প্রচারিত গ্রন্থের প্রাচীন কালে কি প্রকৃতি ছিল ঠিক করার প্রয়োজন হয়ে পড়ে।

দেখা যায় অতি প্রাচীন কাল হতেই পুরাণ নামে চিহ্নিত এক শ্রেণীর রচনা ভারতে প্রচলিত ছিল। তার কিছু দৃষ্টান্ত স্থাপন করা যেতে পারে। এই প্রসঙ্গে পুরাণ শব্দটির অর্থ নিয়ে কিছু আলোচনার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। তার কারণ আছে। আমরা এখনই উল্লেখ করেছি যে মহাভারতের সহিত সংযোজনের পথ বন্ধ হয়ে যাবার পর একশ্রেণীর রচনাকে পুরাণ নামে চিহ্নিত করা হয়েছিল। অতিরিক্তভাবে লক্ষ্য করা যেতে পারে যে বহু প্রাচীন কাল হতে সংস্কৃত সাহিত্যে নানা প্রসঙ্গে পুরাণ কথাটির উল্লেখ পাওয়া যায়। সুতরাং প্রশ্ন ওঠে উভয় ক্ষেত্রেই কি পুরাণ শব্দটি একই অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে?

প্রথমে প্রাচীন সাহিত্যে পুরাণ শব্দের উল্লেখের কথা ধরা যাক। তার প্রথম উল্লেখ পাই অথর্ববেদে। তার পঞ্চদশ কাণ্ডে বলা হয়েছে যে ব্রাত্যগণ ইতিহাস, পুরাণ, গাথা ও নারাশংসী পাঠ করত। (৪) সুতরাং প্রমাণিত হয় এই বিষয়গুলি যজুর্বেদের রচনা

৪। তম্‌ইতিহাসশ্চ পুরাণং চ নারাশংসীশ্চা নব্যচলন্‌। যজুর্বেদ। ১৫।১।৬।১১

কালে প্রচলিত ছিল। গাথা অর্থে বুঝি কাহিনী বা আখ্যান ; নারাশংসী অর্থে বুঝি কোনো বিশিষ্ট নর বা মানুষের প্রশংসাসূচক রচনা। এখন ইতিহাস ও পুরাণ প্রাচীনকালে কি অর্থে ব্যবহৃত হত, তাই আমাদের অনুসন্ধানের বিষয়। ইতিহাসের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ এই ইঙ্গিত করে, তা এমন কাহিনী বলত যার বাস্তব ভিত্তি আছে, অর্থাৎ যা এককালে ঘটেছিল। ইতিহাস শব্দটি প্রাচীন কালে এই অর্থেই ব্যবহৃত হত। পুরাণ বলতে অভিধা অর্থে বোঝায় যা অতি প্রাচীনকালের বিবরণ। তা সত্যই ঘটেছিল কিনা সে সম্বন্ধে তা কোনো আলোকপাত করে না।

পরবর্তীকালে দেখি ইতিহাস ও পুরাণ শব্দ দুটি প্রাচীন সাহিত্যে একসঙ্গে উল্লিখিত হয়েছে। তার দৃষ্টান্ত হিসাবে ছান্দোগ্য উপনিষদের সপ্তম অধ্যায়ের উল্লেখ করা যেতে পারে। প্রসঙ্গটি ছিল এইঃ নারদ ব্রহ্মবিদ্যালাভের আশায় ঋষি সনৎকুমারের শরণাপন্ন হলেন। তখন সনৎকুমার জানতে চাইলেন নারদ ইতিপূর্বে কি কি বিষয় অধ্যয়ন করেছেন। সেই প্রশ্নের উত্তরে নারদ প্রাচীনকালের নানা পাঠ্য বিষয়ের একটি তালিকা দিয়েছেন। তার মধ্যে ইতিহাস এবং পুরাণও স্থান পেয়েছে। (৫) বৃহদারণ্যক উপনিষদে যাজ্ঞবল্ক্য মৈত্রেয়ীকে ব্রহ্মের প্রকৃতি সম্বন্ধে ব্যাখ্যাদানের প্রসঙ্গে এই দুটি শব্দের উল্লেখ করেছেন। (৬) তিনি বলেছেন বেদ, উপনিষদ, ইতিহাস, পুরাণ ব্রহ্ম হতে নিশ্বাসিত।

এই প্রসঙ্গে শঙ্করাচার্য ইতিহাস ও পুরাণের অর্থ সম্বন্ধে একটি ব্যাখ্যা দিয়েছেন। সম্ভবত সেটিই সব থেকে প্রাচীন ব্যাখ্যা। বৃহদারণ্যক উপনিষদের ভাষ্যে তিনি তাদের অর্থ সোজাসুজি বলেন নি, দৃষ্টান্ত দিয়ে তাদের অর্থ বোঝাতে চেষ্টা করেছেন। ইতিহাসের দৃষ্টান্ত হিসাবে তিনি উর্বশী পুরূরবার সংবাদের উল্লেখ করেছেন। সংবাদ শব্দটির ব্যবহারও তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ

৫। ছান্দোগ্য উপনিষদ। ৭। ১। ২

৬। বৃহদারণ্যক উপনিষদ। ২। ৫। ১০

যা ঘটেছে তার সম্বন্ধেই সংবাদ পরিবেশিত হয়। তবে ম্যাক্সমূলার এই কাহিনীর রূপক ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি বলেছেন উর্বশী হলেন ঊষা এবং পুরূরবা হলেন সূর্য। সূর্য আকাশে উদিত হলে উর্বশী তাঁকে ত্যাগ করেন। (৭)

এই ব্যাখ্যায় মনে হয় বিষয়টিকে অতি সরল করে দেখা হয়েছে। উর্বশী ও পুরূরবা কথোপকথন ঋগ্‌বেদের একটি সমগ্র সূক্তের উপজীব্য। (৮) এই কথোপকথনের মধ্যে একটি রীতিমত কাহিনী পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। তাতে পাওয়া যায় উর্বশী পুরূরবার সহিত বিবাহিত হয়েছিলেন। তিনি সন্তান সম্ভবা অবস্থায় পুরূরবাকে ত্যাগ করে যাচ্ছেন। এই সূক্তেই পাওয়া যায় পুরূরবা একজন রাজা ছিলেন, তিনি দেবতাদের জন্য যুদ্ধ করেছিলেন। তিনি অপ্সরাদের সংস্পর্শে এসেছিলেন। উর্বশী পুরূরবাকে তাঁর জন্য ব্যাকুল না হয়ে রাজকার্যে মন দিতে উপদেশ দিয়েছেন। আরও আশ্বাস দিয়েছেন যে তাঁদের পুত্র জন্মগ্রহণ করলে তাকে মানুষ করে পুরূরবার কাছে পাঠিয়ে দেবেন। এ কাহিনী একটি জটিল প্রণয়কাহিনী। একটি প্রাত্যহিক প্রাকৃতিক দৃশ্য যা প্রতিদিন প্রাতঃকালে সংঘটিত হয়, তাকে নিয়ে এমন কাহিনী গড়তে রীতিমত কষ্ট কল্পনার আশ্রয় নিতে হয়। ম্যাক্স মূলারের ব্যাখ্যা যদি সত্য হয় তা হলে ত চিরস্থায়ী বিচ্ছেদের উল্লেখ থাকত না। এই সব দেখে মনে হয় তাঁর ব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য বলা যায় না।

শঙ্কর তাঁর ভাষ্যে যে মন্তব্য করেছেন তা হতে যেন মনে হয় তিনি উর্বশী পুরূরবার কাহিনীকে একটি প্রাত্যহিক প্রাকৃতির ঘটনার ব্যাখ্যা বলে গ্রহণ করেন নি। তাঁর বৃহদারণ্যক উপনিষদের উপর লিখিত ভাষ্যে তিনি দুটি শব্দের অর্থ সোজাসুজি বলেননি; দৃষ্টান্ত দিয়ে তাদের অর্থ বোঝাতে চেষ্টা করেছেন। আগেই বলা

৭। Max Mualler, Selected Essays

৮। ঋগ্‌বেদ ১০। ৯৫

হয়েছে ইতিহাসের দৃষ্টান্ত হিসাবে তিনি উর্বশী পুরূরবার সংবাদের উল্লেখ করেছেন। সংবাদ শব্দটি যা ঘটেছে তার সম্বন্ধে ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ যা বাস্তবিক ঘটেছে তার সম্বন্ধে তা আলোক পাত করে। তার তাৎপর্য এই দাঁড়ায় যে ইতিহাস যে কাহিনী বলে তার বাস্তব ভিত্তি আছে। ইতিহাসের ব্যুৎপত্তিগত বা অভিধা অর্থও তাই বলে। অবশ্য পরবর্তীকালে মহাভারতে ইতিহাস শব্দটি এমন হাল্কাভাবে ব্যবহার করা হয়েছে যে তা সত্য বা কল্পিত উভয় শ্রেণীর কাহিনীকেই সূচিত করে। অর্থাৎ তা আখ্যানের সমার্থ বোধক শব্দ হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। তবে শঙ্করাচার্য স্থাপিত দৃষ্টান্ত হতে একথা পরিষ্কার হয়ে যায় যে বৈদিক যুগে তা সত্য সংঘটিত কাহিনীর প্রসঙ্গেই ব্যবহার করা হত।

পুরাণ প্রসঙ্গে শঙ্করাচার্য বলেছেন 'পুরাণম্ অসদ্ বা ইদমগ্র আসীদিত্যাদি'। দৃষ্টান্ত হতে মনে হয় শ্রুতির যুগে পুরাণের পথ ছিল সৃষ্টি সম্পর্কিত দার্শনিক রচনা। সুতরাং প্রাচীনকালে পুরাণের একটি পারিভাষিক অর্থ ছিল যাপরবর্তীকালে যে পুরাণ নামে চিহ্নিত গ্রন্থগুলি রচিত হয়েছিল তাদের প্রকৃতি-নির্দেশক পথ হতে ভিন্ন।

খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দী হতে যে পুরাণ নামে প্রচারিত বিরাট গ্রন্থগুলি রচিত হয় তাদেরও আলোচ্য বিষয়গুলির সাহায্যে বিশেষ ভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। সেই বিষয়গুলি ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। মূল বিষয় হল সৃষ্টি ও প্রলয়, বিভিন্ন রাজবংশের বিবরণ এবং দেবতা বিশেষের মহিমাকীর্তন। প্রকৃতপক্ষে নানা দেবতা এবং দেবতা বিশেষের বিভিন্ন অবতারের কথাই এই শ্রেণীর পুরাণগুলিতে প্রাধান্য লাভ করেছে। যেহেতু তাতে সৃষ্টির কথা আছে প্রাচীনপুরাণের আলোচ্য বিষয়ও তাদের মধ্যে স্থান পেয়েছে। কিন্তু সাদৃশ্য এতটুকুই। ঠিক বলতে কি তাদের মধ্যে পার্থক্যই বেশী। একটি মৌলিক পার্থক্য দ্বারা প্রাচীনকালের পুরাণ হতে মহাভারতের পরবর্তীকালে রচিত পুরাণগুলিকে পৃথক করা

যায়। প্রাচীন পুরাণে ভক্তিবাদের যুগের দেবতাদের উল্লেখ সম্ভব নয় ; কারণ, তখন ভক্তিবাদ জন্মগ্রহণ করেনি। সেই শ্রেণীর রচনাগুলির প্রকৃতি ছিল দার্শনিক রচনার মত। অপরপক্ষে পরবর্তীকালের পুরাণগুলির মুখ্য ভূমিকা ছিল ভক্তিবাদের যুগের বিভিন্ন দেবতা ও অবতারদের মহত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত করা।

এই প্রসঙ্গে আমরা লক্ষ্য করতে পারি যে পুরাণগুলির জন্মের আগে সেগুলির যা আলোচ্য বিষয় ছিল তাদের আলোচনা অল্পবিস্তর মহাভারতের সহিত সংযোজনের সাহায্যে সম্পন্ন হত। এই প্রসঙ্গে কয়েকটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করা যেতে পারে। মহাভারতে নানা আখ্যায়িকা স্থান পেয়েছে। যেমন যযাতির কাহিনী, নল ও দময়ন্তীর কাহিনী, সাবিত্রী ও সত্যবানের কাহিনী ইত্যাদি। রাজবংশ এবং রাজাদের কাহিনীর উদাহরণ হিসাবে পুরুবংশের কাহিনীর উল্লেখ করা যেতে পারে। পুরাণগুলিতে ধর্ম ও আচার সম্বন্ধেও আলোচনা পাওয়া যায়। তার দৃষ্টান্তও মহাভারতে মিলবে। ধর্ম ও সমাজব্যবস্থা সম্বন্ধে শান্তিপর্ব ও অনুশাসন পর্বে বিস্তারিত আলোচনা আছে। দেবতাদের প্রশস্তি হিসাবে অনুশাসন পর্বে স্থাপিত শিবের সহস্রনাম এবং বিষ্ণুর সহস্রনামের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে।

এই সব তথ্য হতে এমন অনুমান করা অসঙ্গত হবে না যে লেখকদের রচনাকে স্থায়ী আশ্রয় দেবার জন্য এক সময় মহাভারতকে ব্যবহার করা হত। কিন্তু পর্বসংগ্রহ পর্বে মহাভারতের আলোচ্য বিষয় এবং শ্লোক সংখ্যা এমন সুস্পষ্ট ভাবে নির্ধারিত করা হল যে মহাভারতকে এই উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা আর সম্ভব হল না। সেই কারণে এই নূতন শ্রেণীর গ্রন্থের জন্ম হল যা মহাভারতের উত্তরাধিকারী রূপে এই ভূমিকা পালনের উপযুক্ত হবে। সুতরাং মহাভারতের সহিত সংযোজন প্রক্রিয়া থেমে যাবার ফলেই অষ্টাদশ পুরাণের জন্মকাহিনী শুরু হল। তাই কি মহাভারতের অষ্টাদশ পর্বের অনুসরণে অষ্টাদশ পুরাণ রচিত হয়েছিল ?

এখন যে কথাটি বলে নেওয়া বাকি রয়ে গেছে তা বলা যেতে পারে। আমাদের প্রতিপাদ্য হল যে প্রাচীন কালের পুরাণের নাম দিয়ে এই নূতন গ্রন্থগুলিকে চিহ্নিত করারও একটি বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল। যা প্রাচীনকালে ছিল তা একটি বিশেষ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত। সুতরাং এই শ্রেণীর নূতন গ্রন্থগুলি পুরাণ নামে চিহ্নিত হলে বিশেষ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হবে। এই ধরনের একটি চিন্তা খুব সম্ভব এই নামকরণ কে সংঘটিত করেছিল। প্রাচীনকালে ইতিহাস ও পুরাণ নামে দুই শ্রেণীর রচনার উল্লেখ পাওয়া যায়। রামায়ণ ও মহাভারত ইতিহাস নামে খ্যাত হয়েছে। এই শ্রেণীর গ্রন্থগুলিকে পুরাণ নাম দ্বারা ভূষিত করলে সেগুলি প্রায় রামায়ণ ও মহাভারতের সমান মর্যাদা পায়। প্রাচীন কালে বিশেষ শ্রেণীর বিখ্যাত গ্রন্থের নাম ব্যবহার করে নূতন শ্রেণীর রচনাকে মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করবার দৃষ্টান্ত আমাদের দেশে আরও পাওয়া যায়। এই প্রসঙ্গে উপনিষদের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। শ্রুতির অঙ্গীভূত সাহিত্য হিসাবে প্রাচীন উপনিষদগুলি বিশেষ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত ছিল। তাই দেখি ভক্তিবাদের যুগের নানা রচনা উপনিষদ নামে চিহ্নিত হয়েছে।

এই প্রসঙ্গে একটি বিষয় লক্ষ্য করা যেতে পারে যে সবগুলি পুরাণের লেখক রূপে ব্যাস উল্লিখিত হয়েছেন। বিভিন্ন পুরাণগুলি বহু শতাব্দী জুড়ে রচিত হয়েছিল। সে ক্ষেত্রে প্রশ্ন ওঠে একই ব্যক্তির এতকাল ধরে এতগুলি গ্রন্থ রচনা করা সম্ভব হয় কি করে? এই প্রশ্নের উত্তর হিসাবে নারদপুরাণে বলা হয়েছে যে হরি ব্যাসরূপে বিভিন্ন জন্মে অবতীর্ণ হয়ে মানুষের মঙ্গলের জন্য সেগুলি রচনা করেছেন। (৯) তার অর্থ দাঁড়ায় পরোক্ষভাবে স্বীকার করা যে বিভিন্ন কালে বিভিন্ন মানুষ বিভিন্ন পুরাণগুলি রচনা করেন। আর এই লেখকদের ব্যাস নামে চিহ্নিত করার উদ্দেশ্য হল পুরাণগুলির মর্যাদা বর্দ্ধিত করা।

৯। পুরাণ মেকমেবাসীৎ চতুবর্ণস্য বীজম্
হরির্ব্যাস স্বরূপেন জায়তে চ যুগে যুগে"
নারদীয় পুরাণ। পূর্বভাগ। চতুর্থপাদ ৯৩৯ নং

ষষ্ঠ অধ্যায়

মহাভারতের বিভিন্ন স্তর

১

মহাভারতের বিভিন্ন নাম

আমরা লক্ষ্য করে থাকব যে মহাভারতের প্রতি পর্বের প্রথমে একটি নমস্ক্রিয়াসূচক শ্লোক আছে। সেটির বিশেষ তাৎপর্য আছে। তাই তার উদ্ধৃতির এবং ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। শ্লোকটি এইঃ

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্ ।
দেবীং সরস্বতীঞ্চৈব ততো জয়মুদীরয়েৎ ॥

মহাভারতের বিখ্যাত টীকাকার নীলকণ্ঠ তার এই ব্যাখ্যা করেছেনঃ "নারায়ণ, নর, নরোত্তম এবং সরস্বতী দেবীকে প্রণাম জানিয়ে তারপর জয় নামে গ্রন্থটি পাঠ করতে হয়।" এখানে নারায়ণের অর্থ সুস্পষ্ট। তিনি স্বয়ং বিষ্ণু। নর এখানে মহাভারতের অন্যতম বিশিষ্ট চরিত্র অর্জুনকে সূচিত করে; কারণ, তিনিই মহাভারতে বর্ণিত যুদ্ধে মূল ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। নরোত্তম যে শ্রীকৃষ্ণ সেকথা গীতায় বলা হয়েছে। (১) সরস্বতী হলেন পৌরাণিক যুগে পরিকল্পিত বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী। তাঁর সহিত আমরা সুপরিচিত। তিনি বিদ্যা নামেও পরিচিত। সুতরাং এই বিরাট মহৎ কাব্য পাঠের আগে তাকে নমস্কার নিবেদন অবশ্য পালনীয় কর্তব্য। জয় শব্দটি মহাভারত গ্রন্থটিকে সূচিত করে। ইতিপূর্বে উল্লিখিত হয়েছে যে মহাভারতের যে অংশটি সর্বাগ্রে রচিত হয় তার নাম ছিল জয়। তারও একটি কারণ ছিল। মহাভারতের মূল ঘটনা ছিল কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ। যে যুদ্ধ হয়েছিল একটি ন্যায্য অধিকারকে স্বীকৃতি দেবার জন্য। পাণ্ডবদের ন্যায্য দাবী দুর্যোধন দিতে অস্বীকার করায়, তার নিষ্পত্তির জন্য

১। অস্মি বেদে লোকে চ প্রথিতত্ত্ব পুরুষোত্তমঃ ॥ গীতা ১৫। ১৮

এই যুদ্ধ। সুতরাং তা ধর্মযুদ্ধ। মহাভারতের প্রতিপাদ্য বিষয় যে পক্ষের দাবী ধর্মদ্বারা সমর্থিত তার জয় অনিবার্য। 'যতো ধর্ম স্ততো জয়ঃ'; যেখানে ধর্ম সেখানে জয়। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে যে পক্ষের দাবী ধর্ম সমর্থিত তারই জয় হয়েছিল। সুতরাং তা ধর্মের জয়। মহাভারতের প্রথম রচিত অংশটির এই যুদ্ধই উপজীব্য ছিল। সেই কারণেই সম্ভবত তার নাম দেওয়া হয়েছিল 'জয়'।

সেই কারণেই শ্লোকটিতে ঈশ্বর, বাগ্‌দেবী এবং ধর্মের জয় অর্জনে যে দুই ঐতিহাসিক মানুষ মূল ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন তাঁদের নমস্কার নিবেদন করে মহাভারত পাঠের উপদেশ দেওয়া হয়েছে। তা অতি সঙ্গত। তার অতিরিক্তভাবে তার মধ্যে একটি তাৎপর্য অন্তর্নিহিত আছে।

মনে হয় এই চারটি নাম অকারণে এই শ্লোকটির মধ্যে উল্লিখিত হয়নি। প্রথমে নারায়ণের উল্লেখের তাৎপর্য কি দেখা যেতে পারে। তিনি ভক্তিবাদের যুগে যে একেশ্বরবাদ স্থাপিত হয় তার দেবতা। তাঁর আরও জনপ্রিয় নাম বিষ্ণু। সুতরাং তা ভক্তিবাদের চিন্তার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

তারপর আসে নর শব্দের উল্লেখ। মহাভারতের মধ্যে অনেক গুলি প্রধান চরিত্র দেখা যায়। সম্ভবত নায়কও একাধিক; কারণ, দুটি পরস্পর বিরোধী শক্তির দ্বন্দ্ব এই মহৎ কাব্যের প্রধান উপ-জীব্য। ফলে যুধিষ্ঠির এবং দুর্যোধন উভয়েই পারিভাষিক অর্থে নায়ক বলে বিবেচিত হতে পারেন। মহাভারতের কাহিনী এত বিরাট এবং তার মধ্যে এত ঘটনার সমাবেশ হয়েছে যে আরও কয়েকটি চরিত্র তাঁদের উপর আরোপিত ভূমিকার গুণে এমন প্রাধান্য পেয়েছেন যে প্রধান চরিত্র রূপে স্বীকৃতি না দিয়ে উপায় নেই। যেমন ভীষ্ম চরিত্র। এক রকম বলা যায় তিনিই মহা-ভারতের কাহিনীর ভিত্তি স্বরূপ। তাঁর আত্মত্যাগই এই কাহিনীর উৎস। অনুরূপভাবে অর্জুন এবং কৃষ্ণও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। ঠিক বলতে কি যাঁরা পারিভাষিক অর্থে নায়ক তাঁদের

অপেক্ষা এদের ভূমিকা বেশী মূল্যবান।

এই পরিবেশে তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুন বিশেষ সম্মান ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেন। ঠিক বলতে কি কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে তিনি মুখ্য ভূমিকা নিয়েছিলেন। পাণ্ডবদের পক্ষে তিনিই একমাত্র সার্থক মহারথী। তাঁর বীর্যই যুদ্ধে ধর্মের জয়কে সম্ভব করেছিল। তাই জন্যই কি তাঁর আর এক নাম বিজয় ছিল? সে যাই হক তিনি নমস্কার পাবার অধিকার নিশ্চয় রাখেন। সুতরাং এই শ্লোকে তাঁর উল্লেখ অনুমোদন যোগ্য।

তারপর নরোত্তমকে প্রণাম জানান হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের মত তাঁর ভূমিকার গুণে মহাভারতের অন্যতম বিশিষ্ট চরিত্র। অবতারবাদের প্রতীক। সুতরাং তিনি ভক্তিবাদের যুগের কথা স্মরণ করিয়ে দেন।

শেষে আসেন সরস্বতী। তিনি স্পষ্টই পৌরাণিক যুগের প্রতীক। তিনি পৌরাণিক দেবতাদের মধ্যে যাঁরা বিশেষ প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন তাঁদের অন্যতম। বিদ্যাদায়িনী দেবী হিসাবে তিনি বিশেষ জনপ্রিয়। সুতরাং মহাভারতের মত মহৎকাব্যের পাঠের আরম্ভ হবার পূর্বে তাঁকে প্রণাম নিবেদন বিশেষ যুক্তিসম্মত।

মহাভারতের আদিনামের এখানে উল্লেখ ও মনে হয় বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পরিবেশ বৈদিক যুগের পরিবেশ। তখন সমাজ পরিচালিত হত বর্ণ ও আশ্রমধর্ম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে। ক্ষত্রিয়ের বর্ণ অনুসারে কর্তব্য হল যে অধিকার ন্যায়সঙ্গত তা আদায়ের জন্য প্রয়োজন হলে যুদ্ধ করা। সুতরাং কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে ধর্মের পক্ষে জয় বৈদিক যুগের আশ্রমধর্মের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। এইভাবে এই চারটি নামের উল্লেখের মধ্য দিয়ে মহাভারতের রচনাগুলির প্রকৃতিগত ভিন্নতার পরিচয় মিলে যায়। তাতে তিনটি স্তরের রচনা পরস্পর মিশ্রিত আকারে আছে। বৈদিক যুগের ভাবধারা, ভক্তিবাদের যুগের অবতারবাদের ভাবধারা এবং পরবর্তীকালের বহু দেব-দেবী প্রভাবিত পৌরাণিক যুগের

ভাবধারা সুতরাং শ্লোকটিতে চারটি নামের উল্লেখ মহাভারতের বিষয়গত ব্যাপ্তির পরিচয় দেয়। বৈদিক যুগে শেষে তার আরম্ভ এবং প্রাক্ পৌরাণিক যুগ পর্যন্ত তা বিস্তৃত ছিল। এমন কি পৌরাণিক যুগের চিন্তারও তার মধ্যে অনুপ্রবেশ ঘটেছিল।

আমরা আরও জেনেছি যে সংযোজনের ফল মহাভারতের প্রকৃতি এবং আয়তনের যে পরিবর্তন ও পরিবর্দ্ধন ঘটেছে তার সঙ্গে সঙ্গীত রক্ষা করে তার নাম তিনবার পরিবর্তিত হয়েছে। প্রথমে তার নাম ছিল জয়', তারপর তার নাম হল 'ভারত' বা 'ভারতে-তিহাস' এবং সর্বশেষে তার নাম হল 'মহাভারত।' তার আদি নাম 'জয়' হবার কারণ তা সে অবস্থায় কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে পান্ডবদের বিজয়ের কাহিনীর মধ্যে প্রধানত সীমিত ছিল। তারপর তার নাম 'ভারত' বা 'ভারতেতিহাস' হবার কারণ পান্ডব ও কৌরব শাখা যে বংশ হতে উদ্ভূত হয়েছিল তাদের আদি পুরুষ ছিলেন ভরত। তাঁর স্থাপিত বংশের নাম তাই ভারতবংশ। গ্রন্হটির এই বংশের ইতিহাস উপজীব্য হওয়ায় তার নাম হল 'ভারত' বা 'ভারতেতিহাস'। সংযোজনক্রিয়ার যখন সমাপ্তি ঘটল, তখন মহা-ভারত নানা আখ্যায়িকা নানা ধর্মশাস্ত্র বিষয়ক আলোচনাকে আশ্রয় দিয়ে বিরাট এবং ভারী হয়ে উঠল। অনুক্রমণিকা পর্বে তাই বলা হয়েছে যে সেই কারণে সর্বশেষে তার নামকরণ হল 'মহাভারত।' তাই সেখানে বলা হয়েছে মহত্ত্বাচ্চ, ভারত্বচ্চ মহাভারতমুচ্যতে। (১০) মহৎ বলে এবং ভারি বলে তাকে মহাভারত বলা হয়।

২

ভারতবংশের পরিচয়

একটি ধারণা প্রচলিত আছে যে শকুন্তলার পুত্র ভরতের নাম অনুসারে আমাদের দেশের নাম মহাভারত হয়েছে। এ বিষয় কিন্তু বিতর্ক আছে। ভরত নামে এক রাজার নামে যে ভারত

১০। আদিপর্ব ১।২৭৪

চিহ্নিত হয়েছে তাতে বিতর্ক নাই ; কিন্তু সে রাজা কোন রাজা তা নিয়ে মতদ্বৈধ আছে। সেই জন্য বিষয়টি এখানে পরিষ্কার করে নেওয়া দরকার।

ঋগ্‌বেদের একাধিক মণ্ডলে ভারতজাতির উল্লেখ আছে। তৃতীয় মণ্ডলে তাদের বিষয় দুটি সূক্তে এবং সপ্তম মণ্ডলের দুটি সূক্তে তাদের সম্বন্ধে আলোচনা আছে। (১১) এই সূক্তগুলিতে যে তথ্য পাওয়া যায় তাদের ভিত্তি করে একটি কাহিনীও গড়ে তোলা যায়। সেটি এই রকম দাঁড়ায়।

সেকালে সুদাস নামে এক রাজা ছিলেন। ইন্দ্র তাঁর পৃষ্ঠ-পোষক ছিলেন। বশিষ্ঠ ছিলেন তাঁর পুরোহিত। অপর দিকে ভরত নামে এক গোষ্ঠী ছিল। বিশ্বামিত্র তাঁদের পুরোহিত ছিলেন। কাহিনীতে আছে শুতদ্রু ও বিপাসা নদী পার হয়ে ভরতগণ সুদাসকে আক্রমণ করেছিল। সেই যুদ্ধে সুদাস জয়লাভ করেন। এই প্রসঙ্গে বিভিন্ন সূক্তে 'ভরতাঃ', ভরতস্য পুত্রাঃ'—এই কথাগুলির উল্লেখ আছে। সুতরাং অনুমান করা যায় যে বেদের যুগে ভরত নামে এক গোষ্ঠী ছিল ; সম্ভবত তারা ভরত নামে এক রাজার বংশধর। তাদের গোষ্ঠীকে 'ভরতজনও' বলা হত।

ভারত কথাটির সংস্কৃত সাহিত্যে প্রথম উল্লেখ পাই মহাভারতে, তার আদিপর্বে আশ্রিত শকুন্তলা উপাখ্যানের মধ্যে। সে কাহিনী হল এই। শকুন্তলা একদিন রাজা দুষ্মন্তের সভায় অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় উপস্থিত হয়ে তাঁর অন্তঃপুরে প্রবেশের অধিকার চাইলেন। তাঁর এই দাবীর ভিত্তি হল দুষ্মন্ত শকুন্তলাকে গোপনে বিবাহ করেছিলেন এবং শকুন্তলার ভাবী সন্তানের তিনি জনক। দুষ্মন্ত কিন্তু বিবাহ ও পিতৃত্ব দুটি অভিযোগই অস্বীকার করলেন। সেই পরিস্থিতিতে শকুন্তলার ভাগ্যবলে এক 'আকাশচারিণী বাক্' দুষ্মন্তকে এই আদেশ করল ঃ

১১। ঋগ্‌বেদ। ৬। ১৩, ৩। ৫৩, ৭। ১৮ ও ৭। ৮৩ সূক্তগুলি দ্রষ্টব্য

শাকুন্তলং মহাত্মানং দৌষ্মন্তিং ভর পৌরব। (১২)

অর্থাৎ, হে পুরুর বংশধর, শকুন্তলার গর্ভস্থ সন্তান তোমারই পুত্র, তাকে ভরণ কর। একই আকাশবাণী আরও বলল এই পুত্রকে যেহেতু ভরণ করতে বলা হয়েছে সেই হেতু তার নাম হক 'ভরত'। সেই নির্দেশ অনুসারেই নাকি শকুন্তলার এই পুত্রটির নাম হয়েছিল ভরত।

সুতরাং এই কাহিনী হতে জানা যায় দুষ্মন্তের এই পুত্রের নাম কেন ভরত হয়েছিল। তিনিই কৌরবদের বংশের প্রতিষ্ঠাতা। তাই এই বংশের আর এক নাম ভারত বংশ। আদিপর্বে ভরতের বংশের যে তালিকা দেওয়া হয়েছে তাতে দেখা যায় ভারতের উত্তর-পুরুষ শান্তনুর আগে আরও তের জন রাজা ভারত বংশ অলঙ্কৃত করে গেছেন। তাঁদের সকলের নাম এখানে উল্লেখ করবার প্রয়োজন দেখি না। তবে দুজনের নাম উল্লেখের প্রয়োজন আছে; কারণ, এই বংশ তাঁদের নামের সহিত জড়িত। তাঁরা হলেন ভরতের প্রপৌত্র হস্তী। তাঁর নাম অনুসারেই কুরুবংশের রাজধানীর নাম হয়েছে হস্তিনাপুর। হস্তীর বৃদ্ধ প্রপৌত্রের নাম ছিল কুরু। তাঁর নাম অনুসারে এই বংশ কুরুবংশ নামে পরিচিত এবং দুর্যোধন ভ্রাতৃগণ সহ কৌরব গোষ্ঠী বলে পরিচিত। (১৩)

সুতরাং আমরা পাই যে ভরতই কৌরবদের বংশের আদিপুরুষ ছিলেন। অনেকে বলেন এই ভরতের নামেই আমাদের দেশের নাম ভারতবর্ষ; কিন্তু তা তথ্যদ্বারা সমর্থিত নয়। এই প্রসঙ্গে এমন মন্তব্য আছে যা এই ধরনের অনুমানের অবকাশ রাখে না। মহাভারতেই বলা হয়েছে যে দুষ্মন্তের পুত্র ভরত কীর্তিমান রাজা হয়েছিলেন এবং সেই কারণে তাঁর বংশকে ভারতবংশ বলা হয়ে থাকে। প্রাসঙ্গিক মন্তব্যটি এই ঃ

ভরতাদ্ ভারতী কীর্তি র্যেনেদং ভারতং কুলম্। (১৪) অর্থাৎ ভরত কীর্তিমান রাজা ছিলেন এবং সেই জন্য এই কুল ভারত

১২। আদিপর্ব। ৭৪। ১৪৪

নামে পরিচিত। সুতরাং ভরতের মহতী কীর্তি হেতু তাঁর স্থাপিত বংশকে ভারতকুল বা ভারতবংশ নামে চিহ্নিত করা হয়েছিল। সে ক্ষেত্রে আমাদের দেশের নামকরণের সঙ্গে ভরতের নাম সংযুক্ত করার অবকাশ বিশেষ থাকে না।

এরপর ভরত নামটির উল্লেখ পাই ভাগবৎ পুরাণে একটি ভিন্ন সূত্রে। তার পঞ্চম স্কন্দে রাজা ঋষভের পুত্রদের কাহিনী আছে। তাঁর পাঁচটি পুত্র ছিলেন। তাঁদের মধ্যে জ্যেষ্ঠের নাম ভরত ছিল। ইঁনি জ্যেষ্ঠ এবং গুণে শ্রেষ্ঠ হওয়ায় তাঁকেই পিতা সিংহাসনের উত্তরাধিকারী রূপে মনোনীত করেন। তাঁর কাহিনী ভাগবতে একটি বিশেষ কারণে প্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ে। ভাগবতের প্রতিপাদ্য হল ভগবানে ভক্তিতে সাফল্য অর্জনের জন্য ঐকান্তিক নিষ্ঠার প্রয়োজন। একাগ্র মন নিয়ে, তন্ময় হয়ে ঈশ্বরের চিন্তা করতে হবে। ভরতের ভগবানে বিশেষ ভক্তি ছিল। কাহিনীতে আছে একটি হরিণী মৃত্যু বরণ করবার পূর্বে একটি শাবক প্রসব করেছিল। ভরত তার অসহায় অবস্থা দেখে তার প্রতি অনুকম্পা হেতু তাকে পালন করে বড় করেন। ক্রমশ মৃগশাবকটির প্রতি মমতা অত্যন্ত বর্দ্ধিত হওয়ায় তিনি ঈশ্বর চিন্তায় অবহেলা করে সিদ্ধির পথ হতে ভ্রষ্ট হন।

সে যাই হক, এই কাহিনীতেই উল্লেখ আছে যে এই ভরতের নাম অনুসারেই আমাদের দেশের নাম ভারতবর্ষ হয়। মনে হতে পারে শুধু 'ভারত' নাম হলেই ত পারত ; তার সঙ্গে আবার 'বর্ষ' যোগ হল কেন ? আমাদের স্বাধীন ভারত সরকার ত সংবিধানে সেই নামই রেখেছেন। তার একটি সন্তোষজনক ব্যাখ্যা ভাগবতেই পাওয়া যায়। তা প্রস্তুতি হিসাবে পৃথিবী সম্বন্ধে আমাদের

১৩। বিস্তারিত বিবরণের জন্য আদিপর্বের অন্তর্ভুক্ত সম্ভবপর্ব ৯৪ তম অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

১৪। আদিপর্ব ৭৪।১৩২

দেশের প্রাচীন চিন্তার সহিত কিছু পরিচয়ের প্রয়োজন আছে। আমাদের দেশের প্রাচীন ভৌগলিক বিবরণ অনুসারে পৃথিবীতে সাতটি দ্বীপ আছে। তাদের মধ্যে জম্বু দ্বীপ অন্যতম। নয়টি অংশ বা বর্ষে বিভক্ত। ভারত সেই নয়টি অংশের অন্যতম। সেই জন্য ভারতের নাম ভারতবর্ষ। তার অর্থ দাঁড়ায় ভারত হল জম্বু দ্বীপের নয়টি বর্ষের একটি বর্ষ বা অংশ। ভারতের সঙ্গে বর্ষ শব্দটি সংযুক্ত করা হয়েছিল এই কারণে।

সুতরাং তিনটি পৃথক সূত্রে ভারত শব্দটির প্রাচীন সাহিত্যে উল্লেখ দেখা যায়ঃ ঋগ্‌বেদ, মহাভারত এবং ভাগবত। আমরা দেখলাম ভাগবতের কাহিনী অনুসারে আমাদের সংযোগ ঘটেছে ঋষভ পুত্র ভরতের সঙ্গে, দুষ্মন্তের পুত্র ভরতের সঙ্গে নয়। প্রাসঙ্গিক শ্লোকটি এই ঃ

যেষাং খলু মহাযোগী ভরতঃ জ্যেষ্ঠপুত্রঃ শ্রেষ্ঠগুণ আসীৎ
যেনেদং বর্ষং ভারতমিতি ব্যপদিশন্তি ॥ (১৫)

অর্থাৎ (ঋষভদের পুত্রদের মধ্যে) মহাযোগী ভরত জ্যেষ্ঠ এবং গুণে শ্রেষ্ঠ ছিলেন, যার নাম অনুসারে (আমাদের দেশকে) ভারতবর্ষ বলা হয়ে থাকে।

তবে উপরে স্থাপিত শ্লোক হতে এটাও প্রমাণ হয়ে যায় যে দুষ্মন্তের পুত্র ভরতের ভূমিকা ও নামকরণ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। তাঁর স্থাপিত বংশ ভারত বংশ নামে খ্যাতি লাভ করে। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ এই বংশেরই দুই শাখার মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্বের পরিণতি। সেই কারণে মহাভারতের সঙ্গে ভারত নামটি যুক্ত হয়ে পড়ে। মহাভারতে বলা হয়েছে। এ বিষয় আগেই উল্লেখ করা হয়েছে।

আমরা জেনেছি যে মহাভারত যখন সম্পূর্ণভাবে বিকাশ লাভ করে তার বর্তমান বিরাট আকার ধারণ করল তখন তার এই নাম হল। অর্থাৎ ভারত্ব হেতু মহাভারতের নামের সঙ্গে ভারত শব্দটি যুক্ত হয়েছে। আদিপর্বের আরম্ভেই এই ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে।

১৫। ভাগবত ৫। ৪। ৯

বলা হয়েছে যে তাতে মহৎ কাহিনী এবং মহৎ বচন আছে এবং ওজনে ভারী বলে তার নাম মহাভারত হয়েছে। তবু মনে হয় যেন দুষ্মন্ত পুত্র ভরতের বংশের কাহিনী এই মহাগ্রন্থের আলোচ্য বিষয় বলেও তার নাম মহাভারত হয়ে থাকবে। বরং তার সম্ভাবনাই বেশী। পূর্বে মহাভারতের দ্বিতীয় অবস্থায় এই কারণেই তার নাম হয়েছিল ভারত। পরবর্তীকালে অতিরিক্ত সংযোজনের ফলে তা বিরাট হল বলেই তা মহাভারত হয়েছিল। অন্তত এটিও একটি সম্ভাব্য ব্যাখ্যা হতে পারে।

এই প্রসঙ্গে আর একটি বিষয় পরিষ্কার করে নেওয়া যেতে পারে। আমরা জানি যে বংশে দুর্যোধনাদি ধৃতরাষ্ট্রগণ এবং যুধিষ্ঠিরাদি পান্ডবগণ জন্মগ্রহণ করেন তা নানা নামে পরিচিত। যেমন পুরুবংশ, ভারতবংশ, কুরুবংশ। এই নামগুলি এসেছে এই বংশের বিভিন্ন কীর্তিমান রাজার নাম হতে। বেদের পুরূরবার নামে আছে। তিনিই একরকম এই বংশের আদিপুরুষ। সেই কারণে এই বংশের নাম পুরুবংশ এবংএই বংশের সন্তানদের পৌরব বলা হয়। পুরূরবা হতে বিচিত্রবীর্যের পিতা শান্তনুর মাঝখানে বহু পুরুষ আছেন। তাঁদের মধ্যে যাঁরা বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন তাঁদের নাম ধারাবাহিক উল্লেখ করা যেতে পারে। নহুষ ছিলেন পুরূরবার পুত্র। তিনি সশরীরে স্বর্গে যেতে চেয়েছিলেন বলে বিখ্যাত। তাঁরই উত্তর পুরুষ যযাতি। দৈত্য গুরু শুক্রের কন্যা দেবযানী এবং দৈত্যরাজ কন্যা শর্মিষ্ঠার সহিত তাঁর বিবাহ হয়। শর্মিষ্ঠার পুত্র পুরু পিতার ভোগবাসনা তৃপ্তির জন্য নিজের যৌবন দান করে বিখ্যাত হয়েছিলেন। বলা যেতে পারে এঁর নাম হতেও এই বংশের নাম পুরুবংশ হয়ে থাকবে। তবে আদি পুরুষ পুরূরবা হতে নাম আসার সম্ভাবনাই বেশি। সে যাই হক পুরুর পুত্র দুষ্মন্ত। তাঁর পুত্র ভরতের নামে এই বংশ ভারতবংশ বলে খ্যাত। হস্তিনাপুরের স্থাপক হস্তীর উত্তরপুরুষ হলেন কুরু। তাঁর নামেই এই বংশের নাম কুরুবংশ। কুরুর

উত্তরপুরুষ প্রতীপ। তাঁরই পুত্র শান্তনু, যাকে নিয়ে মহাভারতের কাহিনী আরম্ভ।

৩

মহাভারতের রচনার তিনটি স্তর

এখন মূল প্রসঙ্গে ফিরে আসা যেতে পারে। আমরা উপরের আলোচনা হতে পাই যে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে মহাভারতের প্রক্ষিপ্ত সংযোজন হেতু পরিবর্দ্ধিত ও পরিবর্তিত হয়েছে। আদি-রূপের নাম ছিল 'জয়'। তারপর আখ্যায়িকা প্রভৃতি সংযোজনের ফলে তার নাম হল 'ভারত'। সর্বশেষে নানা মিশ্রপ্রকৃতির সংযোজনের ফলে তার আকৃতিও বিরাট হয়ে গেল এবং তার জন্য পরিণত রূপে তার নামে হল 'মহাভারত'।

এইভাবে সংযোজনক্রিয়ার ফলে মহাভারতের মধ্যে নানা কালে নানা প্রকৃতির রচনার মিশ্রণ ঘটেছে। তাই তার বর্তমান রূপে তার মধ্যে নানা যুগের ভাবনা ও চিন্তা ওতপ্রোতভাবে মিশে গেছে। সুতরাং মহাভারতের সামগ্রিক প্রকৃতির সহিত পরিচিত হতে হলে কোন কোন যুগের চিন্তা তার মধ্যে স্থান পেয়েছে সে বিষয় একটি ধারণা করে নেবার প্রয়োজন হয়ে পড়ে।

আমরা দেখতে পাই মহাভারতের উপর তিনটি যুগের প্রভাব এসে পড়েছে। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের তারিখ খৃষ্টপূর্ব দশম শতাব্দী ধরা হয়। তা বৈদিকযুগের মধ্যে পড়ে। তার ওপর সংযোজন প্রক্রিয়ার সমাপ্তি ঘটে পুরাণগুলির রচনা আরম্ভ হবার পূর্ব পর্যন্ত। বিশেষজ্ঞদের মতে প্রথম পুরাণ রচিত হয় খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে। তখন ভক্তিবাদের যুগ আমাদের দেশে সুপ্রতিষ্ঠিত। এই প্রসঙ্গে স্মরণ রাখা উচিত যে ত্রিমূর্তির পরি-কল্পনা এবং তাঁদের তিনটি পৃথক দেবতা রূপে স্বীকৃতি এবং বিষ্ণুর অবতারদের পরিকল্পনা পুরাণগুলি রচিত হবার পূর্বেই আমাদের দেশে বিকশিত হয়েছিল। বিষয়টি পূর্বে আলোচিত

হয়েছে। বেদের যুগ ও ভক্তিবাদের যুগের মাঝখানে একটি মধ্যবর্তী যুগ ছিল যাকে আমরা ধর্মশাস্ত্রের যুগ বলতে পারি। তখনও বৈদিক সমাজ বিন্যাস এবং যজ্ঞকর্ম রীতি প্রচলিত থাকলেও তার কিছু গৌণ পরিবর্তন ঘটেছিল। যেমন নারীর অধিকার সংকুচিত হয়ে গিয়েছিল। এই সময় মনুর বচন প্রচলিত হয় বলে মনুস্মৃতির অনুসরণে তাকে স্মৃতির যুগেও বলা যায়।

সুতরাং আমরা পাই যে মহাভারতের সংযোজন প্রক্রিয়ার ফলে যে বিরাট কাল জুড়ে তা রচিত হয়েছিল তাকে অবলম্বন করে ভারতের ইতিহাসে সামাজিক বিন্যাস, ধর্ম এবং নীতিগত চিন্তার পরিবর্তন ঘটেছিল। তার আনুষঙ্গিক ফল হিসাবে মহাভারতের রচনায় তিনটি বিভিন্ন প্রকৃতির চিন্তার স্তর পরস্পর মিশ্রিত আকারে পাওয়া যায়। এ ক্ষেত্রে আমারা যদি প্রতিটি স্তরের চিন্তা ধর্ম তথা নীতিগত বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে অবহিত হতে পারি, তা হলে মহাভারতের কোন অংশের রচনায় কোন স্তরের লক্ষণগুলি পাওয়া যায় তা আবিষ্কার করে নিতে পারি। তার সাহায্যে কোন অংশ কোন যুগে রচিত তা বার করে দেওয়া সম্ভবত হয়। এই পর্বে প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে প্রতিটি স্তরের প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় স্থাপন করা হবে।

বৈদিকযুগে উপাসনারীতি এবং সমাজজীবন নিয়ন্ত্রিত হত বর্ণ অর্থাৎ বৃত্তিগত জাতিবিন্যাস ও আশ্রয় বা জীবনের বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন ভূমিকার ব্যবস্থার সাহায্যে। সেই কারণে বৈদিক যুগের ধর্মকে বর্ণাশ্রম ধর্ম বলা হত। সমাজে চার শ্রেণীর বর্ণ ছিলঃ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র। আদি অধিবাসীরা শূদ্র শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। অন্য তিন বর্ণ আর্যজাতির মানুষের মধ্যে সীমাবন্ধ ছিল। ব্রাহ্মণ পৌরোহিত্য, অধ্যাপনা ও শাস্ত্রাদি রচনা করত। ক্ষত্রিয় রাজ্যপালন করত এবং যোদ্ধার বৃত্তি অবলম্বন করত। বৈশ্য কৃষি ও ব্যবসায় করে জীবন ধারণ করত। মনীষাদীপ্ত ব্রাহ্মণগণ অরণ্যের পরিবেশে আশ্রম স্থাপন করতেন। যেখানে বেদপাঠ হত,

যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হত এবং গ্রন্হ রচিত হত। এই পরিবেশেই প্রাচীন কালের উপনিষদগুলি রচিত হয়েছিল। যিনি আশ্রমের অধ্যক্ষের ভূমিকা পালন করতেন তাঁকে কুলপতি বলা হত। শূদ্রজাতির জীবিকা ছিল অন্য জাতির সেবা করা বা পশুশিকার করে জীবন ধারণ করা। বর্ণ অনুসারে জীবিকার বিন্যাস প্রথম অবস্থায় শিথিল ছিল। পরে তা কঠোরভাবে পালিত হত।

ব্যক্তিমানুষের জীবন নিয়ন্ত্রিত হত আশ্রম ধর্মের দ্বারা। এই আশ্রমধর্ম তিনটি উচ্চবর্ণের উপর প্রয়োগ করা হত। প্রতি মানুষের জীবনকে চারটি ভাগে ভাগ করা হত এবং প্রতি ভাগকে আশ্রম বলা হত। প্রতি আশ্রমে বিভিন্ন প্রকৃতির জীবনযাত্রা রীতির ব্যবস্থা ছিল। জীবনকে চারটি ভাগে ভাগ করা হতঃ ব্রহ্মচর্য, অর্থাৎ গুরুগৃহে থেকে শিক্ষালাভ ; গার্হস্থ্য অর্থাৎ বিবাহ করে সংসার জীবন যাপন ; বানপ্রস্থ, অর্থাৎ প্রৌঢ় বয়সে বনে গিয়ে বাস ; যতি, অর্থাৎ বার্ধক্যে পরিব্রাজকের জীবন যাপন।

মানুষের জীবনের লক্ষ্য কি হওয়া উচিত তা বুঝাতে সেকালে পুরুষার্থ শব্দটির ব্যবহার করা হত। শ্রুতির যুগের পুরুষার্থ ছিল দুই রকম। প্রথম হল যজ্ঞকর্ম অনুষ্ঠান করে পুণ্য সঞ্চয় ; করে স্বর্গে বাসের অধিকার লাভ। একে কর্মকান্ড বলা হত ; কারণ, যজ্ঞকর্মের সাহায্যে অভীষ্ট লাভ হত। দ্বিতীয় লক্ষ্য ছিল দার্শনিক জ্ঞান সঞ্চয় করে ব্রহ্ম সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন করে ব্রহ্মে বিলীন হওয়া। সেকালে ধারণা ছিল যে ব্রহ্মের উপলব্ধি হলে ব্রহ্মপ্রাপ্তি ঘটে। এখানে জ্ঞানের সাহায্যে অভীষ্ট সিদ্ধি হত বলে একে জ্ঞানকান্ড বলা হত।

এই যুগের মানুষের জীবিকার প্রধান অবলম্বন ছিল কৃষিকার্য ও পশুপালন। পশুদের মধ্যে গরু ছিল সব থেকে বড় সম্পদ উপনিষদে গল্প আছে রাজা জনক দার্শনিক আলোচনা সভায় প্রতিযোগিতায় যিনি শ্রেষ্ঠ বিবেচিত হতেন তাঁকে অনেক গরু দান করতেন।

এই যুগের যা সব থেকে লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য তা হল সে সময় নারী সমাজ বিশেষ মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত ছিল। পুরুষের পাশে তার সকল ক্ষেত্রে সমান অধিকার ছিল। এই কারণেই স্ত্রীর নাম ছিল পত্নী। এক সঙ্গে সমান অধিকার নিয়ে যজ্ঞ করবার অধিকার ছিল বলে বিবাহিত নারীকে পত্নী বলা হত। সেকালে পুরুষের মত নারীর জীবনের বিভিন্ন উৎসবকে অবলম্বন করে বিবাহের অতিরিক্ত সংস্কারের ব্যবস্থা ছিল। সেকালে মানুষের সব থেকে গৌরবের ভূমিকা ছিল বেদের মন্ত্র রচনা করা। দেখা যায় ঋগ্বেদের অন্তর্ভুক্ত নানা সূক্তের ঋষি বা রচয়িতা হিসাবে অনেকগুলি মহিলার নাম পাওয়া যায়।

একটি বিষয় উল্লেখনীয় যে সেই যুগে চিত্তবিনোদনের উপায় হিসাবে অক্ষক্রীড়া অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল। তাতে যেমন সাফল্য এবং পরাজয়ের অনিশ্চয়তা বিশেষ আকর্ষণের বিষয় ছিল, তেমন পরিণতিতে মানুষের ভাগ্যের বিপর্যয় ঘটিয়ে সর্বনাশ সাধন করে বলে সমাজে নিন্দিত হত। তবু তার আকর্ষণ দুর্বার ছিল। যে মানুষ অক্ষক্রীড়ার আকর্ষণে ধরা দিয়েছে তার শোচনীয় অবস্থার একটি সুন্দর বর্ণনা ঋগ্বেদের একটি সূক্তে পাওয়া যায়। তাই তার নাম অক্ষসূক্ত। (১১)

আমরা দেখব মহাভারতের মূলকাহিনীর পরিবেশে শ্রুতির যুগের লক্ষণগুলি পাওয়া যায়। তখনও বর্ণাশ্রম ধর্ম প্রচলিত ছিল। যজ্ঞকর্ম সম্পাদনই ছিল আনুষ্ঠানিক ধর্ম। রাজারা রাজসূয় যজ্ঞ করতেন, অশ্বমেধ যজ্ঞ করতেন। নানা স্থানে বিরাট অরণ্য জুড়ে আশ্রম গড়ে উঠত। কুলপতি তার তত্ত্বাবধান করতেন। মহাভারতের কাহিনীর আরম্ভই ত হল নৈমিষারণ্যে অবস্থিত শৌনক নামে কুলপতির আশ্রমে। এই ধরনের আশ্রম নানাস্থানে অবস্থিত ছিল বলেই পান্ডবদের দীর্ঘকাল ব্যাপী বনবাস সম্ভব হয়েছিল। তাঁরা দ্বৈতবন, কাম্যকবন প্রভৃতি অরণ্যে অবস্থিত

১১। ঋগ্বেদ।১০।৩৪

বিভিন্ন আশ্রমে মুনি-ঋষিদের সান্নিধ্যে বাস করবার সুযোগ পেতেন। সেকালের পরিবেশে বনবাসের জীবন বিলাসবর্জিত ছিল, কিন্তু নিঃসঙ্গ ছিল না; বরং অধ্যাত্মক্ষেত্রে সমৃদ্ধতর জীবন যাপনের অনুকূল পরিবেশ সেখানেই মিলত। ক্ষত্রিয়দের উপর ন্যস্ত ছিল রাজ্যশাসন ও যোদ্ধারবৃত্তি। তাই রাজবংশের সন্তানদের যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষার রীতিমত ব্যবস্থা ছিল। ধর্মরক্ষার জন্য প্রয়োজন মত যুদ্ধ ছিল ক্ষত্রিয়ের অবশ্য পালনীয় কর্তব্য। তাই তাকে ক্ষত্রিয়ের স্বধর্ম বলা হত। তখন আশ্রমধর্ম পালন করা হত। পরিণত বয়সে মানুষ বাণপ্রস্থ অবলম্বন করে অরণ্যের মধ্যে অবস্থিত আশ্রমে বাস করতেন। মহাভারতের আশ্রমবাসিক পর্বে আমরা পাই ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী, কুন্তী ও বিদুর কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পর আশ্রমে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করেন। এগুলি মহাভারতের শ্রুতির যুগের উপাদানের নিদর্শন।

স্মৃতির যুগে মোটামুটি বর্ণাশ্রম ধর্ম অপরিবর্তিত ছিল। তবে বিভিন্ন ক্ষেত্রে দৃষ্টিভঙ্গির এবং সমাজব্যবস্থার কিছু পরিবর্তন ও লক্ষ্য করা যায়। সেগুলি এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। শ্রুতি বা উপনিষদের যুগে কর্মফলের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত জন্মান্তরবাদ বদ্ধমূল সংস্কারে পরিণত হয় নি। আমরা দেখি প্রাচীন উপনিষদে পরজন্ম আছে কিনা, কর্মফল পরজন্ম নিয়ন্ত্রণ করে কিনা এ বিষয় কিছু অস্পষ্ট মন্তব্য ও আলোচনা আছে। তাদের মধ্যে পরস্পর গৌণ বিষয়ে বিরোধও আছে। সংক্ষেপে বলা যায় যে তখন কর্মফল নিয়ন্ত্রিত জন্মান্তরবাদকে বিকাশশীল অবস্থায় পাওয়া যায়। কোথাও বলা হয়েছে যে যেমন বাসনা পোষণ করে সেইমত পরজন্মে তার অনুকূল পরিবেশ পায়। কোথাও বলা হয়েছে পুণ্যকর্মের বলে জন্মান্তরে উন্নততরে জীবন লাভ হয় এবং পাপ কর্মে তা অবনমিত হয়। পরজন্ম বা কর্মফলবাদ তখনও দৃঢ় প্রতীতি বা বিশ্বাসরূপে প্রতিষ্ঠিত হয় নি।
এই জন্মান্তরবাদের প্রতিষ্ঠার সঙ্গে ভারতীয় দার্শনিক দৃষ্টি ভঙ্গি

ও রীতিমত পরিবর্তিত হয়ে যায়। শ্রুতি বা উপনিষদের যুগে বিশ্বকে আনন্দের প্রকাশ রূপে দেখা হত। 'আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি' বলতে ঋষি উল্লাস বোধ করতেন। সেই অর্থেই রবীন্দ্রনাথ সংসারজীবনকে বিশ্বরূপের খেলাঘর, বলে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু জন্মান্তরবাদ প্রতিষ্ঠার সঙ্গে একটি ধারণা ফুটে উঠল যে মানবজীবন দুঃখময়। এই দুঃখবাদ এমন সর্বাত্মক হয়ে দাঁড়াল যে দার্শনিক চিন্তা জন্মবন্ধন হতে মুক্তি-লাভকেই পুরুষার্থরূপে গ্রহণ করল। ফলে এল বুদ্ধের দর্শন। তিনি সংসারে যন্ত্রণা হতে মুক্তির জন্য নির্বাণলাভকেই পুরুষার্থ রূপে স্বীকৃতি দিলেন। হিন্দু ষড়দর্শন জ্ঞানের পথে মুক্তিলাভের উপায় অন্বেষণে আত্মনিয়োগ করল। এই যুগের শাস্ত্রগুলিকে তাই ন্যায়প্রস্থান বলে।

শ্রুতিপ্রস্থান ও ন্যায়প্রস্থানের যুগের মধ্যবর্তীকালে আর এক শ্রেণীর সাহিত্যের উৎপত্তি হয়। তাকে আমরা ধর্মশাস্ত্র বলতে পারি। এ বিষয় ইতিপূর্বে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। আমরা দেখেছি ধর্মশাস্ত্রের উৎপত্তি বৈদিক সাহিত্যের অঙ্গ ধর্মসূত্র হতে। ধর্ম শব্দটি এখানে আনুষ্ঠানিক ধর্ম বোঝায় না। মানুষের সমাজকে যা ধরে রাখে তাই ধর্ম; অর্থাৎ সুনীতি সম্মত আচরণ বিধি। সম্ভবত প্রাচীনকালে প্রজ্ঞায় ভাস্বর এই নীতিবচনগুলি মনুর বচন নামে প্রচলিত ছিল। পরবর্তীকালে স্মৃতিকার এগুলি সম্ভবত সংকলন করে মনুসংহিতা রচনা করেন। তাই সংকলনটি তত প্রাচীন নয়, তবে তার আশ্রিত প্রজ্ঞাবচন প্রাচীনতর কালের জিনিষ।

এই যুগের প্রভাবে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি রীতিমত পরিবর্তিত হয়ে যায়। উপনিষদের যুগে জিজ্ঞাসুর দৃষ্টি ভঙ্গি প্রাধান্যলাভ করেছিল। বিশ্বকে যে শক্তি নিয়ন্ত্রিত করছে তাকে জানা ছিল সে যুগের পুরুষার্থ। তাকে বলা হত পরাবিদ্যা। ধর্মশাস্ত্রের যুগের পুরুষার্থ পরাবিদ্যা নয়, চতুবর্গ লাভ। সেই চারটি

বর্গ হল ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ। এখানে ধর্মের অর্থ হল কর্তব্য কর্ম সম্পাদন। তার দুটি দিক আছে। প্রথমত, বিভিন্ন বর্ণের জন্য নির্দিষ্ট জীবিকা পালন এবং দ্বিতীয়ত নীতিসম্মত সর্বজনীন কল্যাণকর্ম সাধন। যেমন সত্যভাষণ, অহিংসা, অস্তেয় ইত্যাদি। অর্থ হল সম্পদ অর্জন। কাম হল বিভিন্ন বাসনা আচরণবিধি লঙ্ঘন না করে চরিতার্থ করা। শেষে আসে মোক্ষ অর্থাৎ জন্মবন্ধন হতে মুক্তিলাভের জন্য সাধনা। এদের মধ্যে ধর্মই সব থেকে বেশী প্রাধান্য পায়, কারণ, অন্য তিনটি বর্গের সাফল্য নির্ভর করে ধর্ম, অর্থাৎ সর্বজনীন সুনীতিসম্মত আচরণের উপর। এই কারনেই একে ধর্মশাস্ত্রের যুগ বলা যায়।

ধর্মশাস্ত্রের যুগে যা সব থেকে লক্ষনীয় পরিবর্তন তা হল সমাজ ব্যবস্থায় নারীর স্থানের অবনমন। শ্রুতির যুগে সমাজে তার যে অধিকার স্বীকৃত ছিল তা প্রত্যাহৃত করা হল। শ্রুতির যুগে নারী ও পুরুষের মধ্যে কোন অধিকারগত ভেদ ছিল না। এখন রীতিমত ভেদ আরোপিত হল। এখন হতে নারীর জন্য কেবল বিবাহ সংস্কারটি রক্ষিত হল, অন্যগুলি প্রত্যাহৃত হল। (১২) মনুতে স্পষ্টভাবে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে নারীর আদৌ স্বাধীনতা থাকবে না। প্রাসঙ্গিক শ্লোকটি এই ঃ

পিতা রক্ষিত কৌমারে ভর্তা রক্ষতি যৌবনে।
রক্ষন্তি স্থাবিরে পুত্রা ন স্ত্রী স্বাতন্ত্রমে পুতি ॥ (১৩)

অর্থাৎ পিতা কুমারী অবস্থায় রক্ষা করবে, ভর্তা যৌবনে রক্ষা করবে, স্থবির অবস্থায় পুত্রগণ রক্ষা করবে; নারী স্বতন্ত্র ভাবে থাকার যোগ্য নয়। অবশ্য প্রকাশ্যে ভ্রমণের অধিকার সে যুগেও ছিল। পর্দাপ্রথা আমাদের দেশে আরও অনেক পরে গড়ে উঠেছে। তবে এই নূতন দৃষ্টিভঙ্গি যে পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল তার প্রতিক্রিয়া হিসাবে নারীর পতিসেবাকেই আদর্শ বলে প্রচার করা হয়েছে।

১২। মনু।২।৬৭ ১৩। মনু।৯।৩

ধর্মশাস্ত্রের যুগে কিন্তু একটি প্রশংসনীয় পরিবর্তন ঘটেছিল। দ্যূতক্রীড়া একেবারে নিষেধ করে দেওয়া হয়েছিল। শ্রুতির যুগে তা একটি পরিহার্য ব্যসন হিসাবে নিন্দিত হয়েছিল। কিন্তু নিবারিত হয় নি। প্রাসঙ্গিক শ্লোকটি ঃ

দ্যূতমেতৎ পুরা কল্পে দৃষ্টং বৈরকরং মহৎ।
তস্মাদ্ দ্যূতং ন সেবেত হাস্যার্থমপি বুদ্ধিমান॥ (১৪)

অর্থাৎ, পুরাকালে দেখা গেছে যে এই দ্যূতক্রীড়া বড় অনিষ্ট সাধক। সেই কারণে বুদ্ধিমানের উচিত হবে না পরিহাস করেও দ্যূতক্রীড়ায় যোগ দেওয়া।

অথচ আমরা দেখি মহাভারতে অক্ষক্রীড়া বর্জিত হয়নি। ঠিক বলতে কি এই অক্ষক্রীড়াকে কেন্দ্র করেই মহাভারতে মূল ঘটনাটি ঘটেছিল। মাতুল শকুনির অক্ষক্রীড়ায় দক্ষতার সাহায্যে দুর্যোধন যুধিষ্ঠিরকে সর্বস্বান্ত করতে যুধিষ্ঠিরকে অক্ষক্রীড়ায় আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের মূল কারণ তাই। মহাভারতের যুগে একটি রীতি ছিল যে অক্ষক্রীড়ায় আমন্ত্রণ করলে তা প্রত্যাখ্যান করা যাবে না। সুতরাং তা পরোক্ষ ভাবে প্রমাণ করে যে মহাভারতের মূল কাহিনী শ্রুতির যুগের ঘটনা। তখনও অক্ষক্রীড়া ব্যসব হিসাবে নিন্দিত হত কিন্তু নিষিদ্ধ হয় নি।

সর্বশেষে আসে ভক্তিবাদের যুগ। এই যুগে সমাজের নানা ক্ষেত্রে আরও পরিবর্তন এসেছিল। প্রথমে উপাসনা রীতির কথা ধরা যেতে পারে। এখানে বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটেছিল। বৈদিকযুগে অগ্নিতে অহুতি দিয়ে নানা দেবতাকে আহ্বান করে প্রার্থনা বা স্তুতি নিবেদিত হত। এই দেবতাগুলি ছিলেন প্রকৃতির বিশেষ বিশেষ প্রকট শক্তিকেন্দ্র। যেমন অগ্নি, বায়ু, বরুণ, সূর্য প্রভৃতি। তাঁদের উপর মানুষের মত আচরণ

১৪। মনু।৯।২২৭

আরোপিত হত, কিন্তু মানুষের প্রকৃতি আরোপিত হত না; তাঁদের জন্য হস্তপদাদি বিশিষ্ট বিভিন্ন মূর্তি কল্পিত হত না। যেমন বলা হয়েছে, উষা রাত্রির অবসানে মায়ের মত সকলের ঘুম ভাঙিয়ে দেয়; সূর্য সপ্ত অশ্বের রথে চড়ে আকাশ পরিক্রমা করেন। প্রথম ক্ষেত্রে উপমা অলঙ্কার প্রয়োগ করা হয়েছে এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে রূপক অলঙ্কার প্রয়োগ করা হয়েছে। এগুলি কবিত্বসুলভ বর্ণনা রীতি। বেদের মন্ত্রকার ঋষি সত্যই একাধারে কবি ও মনীষী ছিলেন।

কিন্তু আমরা লক্ষ্য করব বৈদিক দেবতাদের উপর হস্তপদাদি-ধারী মানুষের রূপ বা প্রকৃতি অরোপিত হত না। এই দেবতাদের জন্য কোনও নির্দিষ্ট বাসস্থান উল্লিখিত হয় নি। যে প্রাকৃতিক শক্তির উপর দেবত্ব আরোপিত হয়েছে তার ক্রিয়া যেখানে লক্ষিত হয় সেই স্থানই তার বিচরণ ক্ষেত্র ধরা হয়েছে। এই নীতি প্রয়াগে করে বৈদিক দেবতাদের তিনটি স্থানের সহিত সংযুক্ত করা হয়েছে। যাঁদের ক্রিয়া পৃথিবীতে লক্ষিত হয় তাঁরা পৃথিবী স্থানের দেবতা; যেমন অগ্নি, বরুণ ইত্যাদি। ঊর্দ্ধে অবস্থিত দ্যৌ তা আকাশ এবং পৃথিবীর মধ্যবর্তী অঞ্চলে যাঁদের গতিবিধি লক্ষ্য করা যেত তাঁদের অন্তরীক্ষ স্থানের দেবতা বলে চিহ্নিত করা হয়েছে; যেমন বায়ু বা বৃষ্টির দেবতা ইন্দ্র। একেবারে উর্দ্ধগগনে যাদের অবস্থিতি লক্ষ্য করা যেত তাঁদের দ্যু স্থানের দেবতা বলা হয়েছে, যেমন সূর্য, উষা প্রভৃতি।

ভক্তিবাদের যুগে কিন্তু দেবতাদের সম্বন্ধে ধারণা রীতিমত পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছিল। বৈদিক দেবতাদের বেশীর ভাগই অবনমিত হয়েছিলেন। যাঁরা গৃহীত হয়েছিলেন তাঁদের রূপান্তর ঘটেছিল। তাঁরা অন্তহীন শক্তির অধিকারী হলে ও তাঁদের উপর মানুষরে রূপ আরোপিত হয়েছিল। মানুষের মত তাঁদের নির্দিষ্ট বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। বৈকুণ্ঠ, অমরাবতী, কৈলাসের কল্পনা এই চিন্তারই ফলশ্রুতি। এই

দেবতাদের ঐকান্তিক ভাবে ভাগ্যবান মানুষরূপেই যেন চিত্রিত করা হয়েছিল। তাঁরা অমর, তাঁদের জরা আক্রমণ করে না, যৌবনে গিয়ে তাঁদের বয়স থেমে যায়, তাঁদের রাত্রি নিত্য চন্দ্রালোকে আলোকিত, তাঁদের উদ্যানে গাছগুলি নিত্যপুষ্পিতা।

এই যুগে পুরুষার্থ বা জীবনের লক্ষ্য সম্বন্ধে ধারণাও পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছিল। চতুবর্গের পরিবর্তে পুরুষার্থ নির্ধারিত হয়েছে ভক্তি দিয়ে ঈশ্বরের তুষ্টি সম্পাদন করে তাঁর সহিত সালোক্য প্রাপ্তি।

একই সঙ্গে একটি নূতন তত্ত্ব বিকাশ লাভ করেছে দেখতে পাই। দেবতাদের মধ্যে বিষ্ণু প্রধান দেবতারূপে স্বীকৃতি লাভ করেছেন। আরও কল্পনা করা হয়েছে যে এই বিষ্ণুরূপী ঈশ্বর সংসারে বিপর্যয় ঘটলে মানুষ জননীর কোলে মানুষ রূপে জন্মগ্রহণ করে মানুষের পরিত্রাণ ঘটান। ঈশ্বরের এই বিশেষ প্রকাশকে অবতার হওয়া বলা হয়েছে সুতরাং এই অবতাররূপী ঈশ্বরকে পূজা করেও তাঁর কৃপালাভ সম্ভব। অতিরিক্ত ভাবে আরও দেবদেবী কল্পিত হয়েছেন। তাঁদের মূর্তি গড়ে মন্দিরে স্থাপন করে তাঁদের পূজারীতি প্রবর্তিত হয়েছে। তাঁদের পূজা করে বিপদ হতে মুক্তি এবং বিশেষ কামনা পূরণ করবার ব্যবস্থা হয়েছে।

পুরাণের যুগে এই ভক্তিবাদ পূর্ণরূপে বিকাশ লাভ করেছিল। সেযুগ এখনও হিন্দুসমাজের পূজারীতিকে নিয়ন্ত্রণ করে। বিভিন্ন দেবতার কল্পিত মূর্তি পূজাই বর্তমানে হিন্দুসমাজের উপসনারীতি। আমরা দেখব, এই ভক্তির যুগের উপাদানও মহাভারতের নানা স্থানে সংযোজিত হয়েছে। তার উৎকৃষ্ট উদাহরণ হল ভীষ্মপর্বের সহিত সংযুক্ত বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থগীতা। তাতে বিষ্ণু ব্যক্তিরূপী ঈশ্বররূপে স্বীকৃত এবং ঐতিহাসিক মানুষ কৃষ্ণ তাঁর অবতারে রূপান্তরিত। এমন কি পৌরাণিক যুগের দেবতা দুর্গার উপাসনার কথাও মহাভারতে পাওয়া যায়।

সপ্তম অধ্যায়

সংযোজনের ফলে দেবতাদের রূপান্তর

১

বৈদিক যুগের দেবতা ও দেবলোক

আমরা ইতিপূর্বে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে মহাভারতের পরিণত রূপটি বিভিন্ন কালে নানা সংযোজনের ফলে গড়ে উঠেছিল এবং সেই কালের ব্যাপ্তি সহস্রাধিক বৎসর। আর ও জেনেছি এই দীর্ঘ কালের মধ্যে ভারতীয় চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গির একাধিক বার পরিবর্তন ঘটেছে। পরিবর্তনের ফলে যে নূতন পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে তা সংযোজনের প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রিত করেছে। ধর্মশাস্ত্রের যুগের সংযোজন তার প্রকৃতিকে বহন করে। অনুরূপ ভাবে ভক্তিবাদের যুগের পরিবেশের রচনা তার প্রকৃতি দ্বারা চিহ্নিত পূর্বের অধ্যায়ে আমরা দেখিয়েছি সমাজবিন্যাস এবং বিশেষ করে উপাসনারীতি ভক্তিবাদের যুগে রীতিমত পরিবর্তিত হয়েছিল। তার আনুষঙ্গিক ফল হিসাবে দেবতাদের সম্বন্ধে ধারণারও পরিবর্তন ঘটেছিল। বৈদিকযুগের দেবতারও রূপান্তর ঘটেছিল। বর্তমান অধ্যায়ে নূতন যুগের প্রভাবে বৈদিকযুগের দেবতাদের কি রূপান্তর ঘটেছিল, তার আলোচনায় নিবেদিত হবে।

এই আলোচনা দুই পর্যায়ে করলে সুবিধা হবে। দেবতাদের রূপান্তর সম্বন্ধে প্রথমে সাধারণ ভাবে আলোচনা হবে। একই সঙ্গে যে দেবতারা বিশেষ প্রাধান্য পেয়েছিলেন তাঁদের সম্বন্ধে পৃথক আলোচনা হবে। দ্বিতীয় পর্যায়ে তাঁদের অবস্থান ক্ষেত্র সম্বন্ধে আলোচনা হবে। এই দুটি বিষয় সম্বন্ধে আমরা প্রথমে বৈদিক-যুগের দেবতাদের বিষয় আলোচনা করব।

নিরুক্তকার যাস্ক ব্যুৎপত্তির ভিত্তিতে দেবতা শব্দটির তিনটি অর্থ দিয়েছেনঃ দেব অর্থে যিনি দান করেন বা যিনি দীপ্তি পান বা যিনি দ্যুলোকে অবস্থান করেন। (১) দেবতাদের উপর আরোপিত এই গুণগুলি সকল বৈদিক দেবতার উপর প্রযুজ্য নয়। বৈদিক দেবতাদের যজ্ঞ করে তুষ্ট করলে তাঁরা বাসনা পূরণ করতেন এই বিশ্বাস যজমানের ছিল। সুতরাং তাঁরা দান করেন। এই গুনটি সকল দেবতাদের উপর প্রযোজ্য। কিন্তু সব দেবতাই যে দীপ্ত হয়ে শোভা পান তা নয়। যেমন রাত্রি একটি বৈদিক দেবতা। তিনি এ গুণ ধারন করতেন না। তৃতীয় গুণ হল দ্যুস্থান অর্থাৎ ঊর্দ্ধগগনে অবস্থান করা। এ গুণটিও সকল দেবতার উপর আরোপ করা যায় না। কেবল কয়েকটি দেবতা দ্যুলোকে অবস্থান করেন; যেমন সূর্য, উষা, অশ্বিদ্বয়। সুতরাং যে গুণটি সকল ক্ষেত্রে প্রযোজ্য তা হল দান। মনে হয় দেবতা অর্থে আমাদের ধরা উচিত যে শক্তি যজমানের কামনা পূরণ করতে পারেন। তাঁকেই দেবতা বলা হত।

ঋগ্‌বেদের পুরুষসূক্তে উল্লেখ আছে একটি যজ্ঞ করা হল। তাতে একটি পুরুষকে উৎসর্গ করা হল। (২) সেই পুরুষ হতে বিশ্বের বিভিন্ন অংশ উৎপাদিত হল। দেবতারাও এইভাবে উৎপাদিত হলেন। আরও বলা হল যে এই দেবতারা স্বর্গে বাস করেন। আরও বলা হয়েছে সেই বিরাট পুরুষের মাথা হতেই স্বর্গ সৃষ্টি হয়েছে। সেই স্বর্গ পরম ব্যোমে অবস্থিত। সুতরাং দেবতাদের দ্যুলোক বাসী সত্তারূপে কল্পনা করা হয়েছে। আমরা পরবর্তী আলোচনা হতে বুঝতে পারব যে এই দেবতারা সাধারণ দেবতা। যেমন মানুষের সমাজে সাধারণ মানুষ থাকে এবং বিশিষ্ট মানুষ থাকে। এও সেই রকম। যাঁদের আমরা বৈদিক

১। দেবো দানাদ্‌ বা দীপনাদ বা দ্যুস্থানে ভবতীতি বা। নিরুক্ত। ৭।১৬

২। ঋগ্‌বেদ। ১০।৯০

দেবতা বলে পূজা করি এঁরা ঠিক সে দেবতা নন। এঁরা স্বর্গ-বাসী সাধারণ সত্তা।

এই কারণেই ঋগ্‌বেদে বিভিন্ন প্রসঙ্গে দেবতাদের যে সংখ্যা উল্লেখ করা হয়েছে তার মধ্যে অনৈক্য দেখা যায়।৬।২৮।১ ঋকে দেবতাদের সংখ্যা ৩৩ বলে উল্লিখিত হয়েছে। আবার ৩।৯।৯ ঋকে এবং ৬০।৫২।৬ ঋকে তাঁদের সংখ্যা ৩৩৩৯ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। সায়ন এই অসঙ্গতির মীমাংসা করতে চেয়েছেন এই বলে যে প্রকৃত-পক্ষে দেবতাদের সংখ্যা ৩৩ এবং অতিরিক্ত সংখ্যাগুলি তাঁদের মহিমা সূচিত করতে উল্লিখিত হয়েছে। কিন্তু এর ব্যাখ্যা গ্রহণ করা শক্ত হয়ে পড়ে। পুরুষ সূক্তে বলা হয়েছে যে দেবতারা পরম ব্যোমে বাস করেন। অথচ আমরা জানি বেদের প্রধান দেবতাগুলি পৃথিবী স্থান, অন্তরীক্ষ স্থান এবং দ্যুস্হানে অবস্হান করেন।

দেবতাদের সংখ্যা সম্বন্ধে আরও জটিলতা আছে। নিরুক্ত-কার যাস্ক অন্য প্রসঙ্গে বলেছেন যে মাত্র তিনটি দেবতা আছেন। তারা বলেন পৃথিবী স্হানের অগ্নি, অন্তরীক্ষ স্হানের ইন্দ্র বা বায়ু এবং দ্যুস্থানের সূর্য। (৩) শুধু তাই নয়, ঋগ্‌বেদে এমন অনেক সূক্ত আছে যাতে দেবতা বলে যিনি উল্লিখিত হয়েছেন। তিনি দেবতার গুণ আদৌ ধারণ করেন না। যেমন বিভিন্ন সূক্তে প্রস্তরখণ্ড, ধনুক, মণ্ডূক প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ সূক্তের দেবতা বলে উল্লিখিত হয়েছে। দুটি অবস্থাই বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে, তবে তাদের ব্যাখ্যা মেলে। নিরুক্তে যে তিনটি দেবতার উল্লেখ করা হয়েছে তা মনে হয় বিভিন্ন স্থানে অবস্থানের ভিত্তিতে এক বা একাধিক দেবতার নাম দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লিখিত হয়েছে। এটা সম্পূর্ণ তালিকা নয়, দৃষ্টান্ত স্বরূপ এক বা একাধিক দেবতার নাম উল্লিখিত হয়েছে। সম্ভবত মূল দেবতা হিসাবে কেবলমাত্র তাঁদের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে বোঝাই যায়

৩। তিস্র এব দেবতা ইতি নৈরুক্তা অগ্নিঃ পৃথিবী স্থানো বায়ুরিন্দ্রো বা অন্তরীক্ষ স্থানঃ সূর্যো দ্যুস্থানঃ।

দেবতা শব্দটিকে ব্যাপক অর্থে প্রয়োগ করা হয়েছে। যেখানে মণ্ডূক বা ধনুক ইত্যাদিকে দেবতা বলে উল্লেখ করা হয়েছে, সেখানে ধরতে হবে দেবতা অর্থে আলোচ্য বিষয়কে সূচিত করা হয়েছে।

মনে হয় ৩৩৩৯ সংখ্যা এবং ৩৩ সংখ্যার অসঙ্গতির ও একটি মীমাংসা পাওয়া যায়।

উপরের আলোচনা হতে বোঝা যায় ঋগ্‌বেদে দুই শ্রেণীর দেবতা ছিলেন যাঁরা পরমব্যোমে অবস্থিত স্বর্গে বাস করতেন। তাঁরা একশ্রেণীর বিশেষ ভাগ্যবান সত্তা। তাঁদের কামনা চরিতার্থ করবার সামর্থ ছিল না। আমরা জানি বেদের কর্মকাণ্ডে যজ্ঞের যে ব্যবস্থা আছে তার দ্বারা যজমানের যে অপবর্গ লাভ হত তা হল স্বর্গ বা দেবলোকে বাস। পুণ্য ক্ষয় হলে আবার স্বর্গ হতে পতন ঘটত। এই শ্রেণীর দেবতারা সেখানে বাস করতেন। আর এক শ্রেণীর দেবতা ছিলেন যাঁরা যাঁরা পৃথিবী, অন্তরীক্ষ বা দ্যুলোকে বাস করতেন। এ স্বর্গ বা দেবলোকবাসী দেবতাদের নিয়ে সংখ্যা হল ৩৩৩৬। আর যে শ্রেণীর দেবতা প্রকৃতির মধ্যে বিশেষ শক্তি রূপে প্রকট তাদের সংখ্যা ছিল ৩৩। ৩৩০৩+৩৬ দুই যোগ করে মোট সংখ্যা ৩৩৩৯। এই দ্বিতীয় শ্রেণীর দেবতারাই ঋগ্‌বেদের প্রকৃত দেবতা। কারণ যজ্ঞে তাঁদের প্রশস্তি পাঠ হত এবং তাঁদের নিকট প্রার্থনা নিবেদিত হত। এই শ্রেণীর দেবতা গণনা করে দেখলে প্রায় ৩৩এর কাছাকাছি যায়। সে যাই হক এঁরাই দেবতার যে গুণ তাঁকে বৈশিষ্ট্য দান করে সেই গুণে ভূষিত ছিলেন। অর্থাৎ তারাই যজমানের কামনাকে পূরণ করবার শক্তি ধারণ করতেন। এখন আমরা এই শ্রেণীর দেবতাদের বিষয় আলোচনার জন্য প্রস্তুত হয়েছি।

তেত্রিশটি দেবতাদের মধ্যে পড়েন মূলদেবতাগুলি। তাঁদের মধ্যে আছেন অগ্নি, বায়ু, ইন্দ্র, বরুণ, সূর্য, নাসত্য ভ্রাতৃদ্বয় প্রভৃতি। এঁদের আমরা বিভিন্ন প্রাকৃতিক শক্তির প্রতীকরূপে গ্রহণ করতে পারি। যেখানে কোনও প্রাকৃতিক শক্তির বিশেষ প্রকাশ দেখা

গিয়াছে সেখানেই বৈদিক ঋষি তার উপর দেবত্ব আরোপ করেছেন। তঁাদের উপর মানবিক আচরণ আরোপ করা হয়েছে, কিন্তু সর্বাত্মক ভাবে তঁাদের উপর মানবিক রূপ আরোপিত হয় নি পুরাণের যুগে যেমন বিভিন্ন দেবতার ধ্যানমূর্তি বর্ণিত হয়েছে তঁাদের সম্বন্ধে তেমন কোনও ধ্যানমূর্তি কল্পিত হয় নি। তাঁদের মূর্তি গড়ে পূজা করবার রীতিও প্রচলিত হয় নি। অগ্নি জ্বেলে তাতে আহুতি দেওয়া হত, অগ্নি নির্দিষ্ট দেবতার কাছে সে অর্ঘ্য পেঁাছে দিতেন। এই অগ্নির আর এক নাম পুরোহিত। সুতরাং আমরা নিশ্চিত তাদের বিভিন্ন প্রাকৃতিক শক্তির প্রতীক হিসাবেই গ্রহণ করতে পারি।

এই দেবতাদের মানুষের মত কোনও আবাসগৃহের প্রয়োজন হত না। কারণ, তঁারা ত মানবধর্মী ছিলেন না, তারা ছিলেন প্রাকৃতিক শক্তি। কাজেই যে পরিবেশে তাঁদের শক্তির পরিচয় মিলত সেখানেই তঁাদের অবস্থান মেনে নেওয়া হত। এই নীতি প্রয়োগ করে দেবতাগুলির উদ্দেশ্যে যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হত, তাঁদের অবস্থিতির ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট হত। এই সম্ভাব্য স্থান তিনটি হতে পারে ভূতল, উর্ধ আকাশ এবং এই দুইস্থানের মধ্যবর্তী দেশ তৃতীয় স্থান যাকে অন্তরীক্ষ বলা হত। ভূমিস্থানের দেবতা হলেন অগ্নি, অন্তরীক্ষ স্থানের দেবতা হলেন বায়ু এবং বজ্রধারী ইন্দ্র এবং দ্যুলোকের দেবতা হলেন সূর্য, ঊষা প্রভৃতি। তাঁদের আবাসস্থান বলে কিছু ছিল না ; তবে তাঁদের প্রকাশস্থান ছিল।

তবে অন্তরীক্ষ এবং দ্যুলোকের অতিরিক্ত ভাবে শ্রুতির সাহিত্যে আরও দুটি লোকের উল্লেখ আছে : পিতৃলোক ও দেব-লোকে। ঋগ্‌বেদের দশম মণ্ডলে পিতৃলোকের উল্লেখ আছে। সেখানে বলা হয়েছে মৃত্যুর পর মানুষ পিতৃলোকে যায়। যম ও বরুণ এই লোকের অধিষ্ঠাতৃ-দেবতা। আরও বলা হয়েছে এই পিতৃলোকে 'পরম ব্যোমে অবস্হিত'। প্রাসঙ্গিক ঋক্ দুটি এই :

প্রেহি প্রেহি পথিভিঃপূর্বে ভির্যত্রা নঃ পূর্বে পিতরঃ পরেয়ুঃ।
উভা রাজানা স্বধয়া মদন্তা যমং পশ্যামি বরুণং চ দেবম্ ॥
সংগচ্ছস্ব পিতৃভিঃ সঃ যমেনেষ্টা পূর্তেন পরমে ব্যোমন্।
হিত্বায়বদ্যং পুনরস্তেমহি সংগচ্ছস্ব তন্বা সুবর্চাঃ। (৪)

অর্থাৎ, আমাদের পূর্বপুরুষগণ যে পথ দিয়ে যে স্থানে গিয়েছেন, তুমিও সেই পথ দিয়ে সে স্থানে যাও। সেখানে দুই রাজা যম ও বরুণকে প্রমোদে নিরত অবস্থায় অবলোকন কর। সেই পরম ব্যোমে অবস্থিত লোকে পিতৃগণের সহিত মিলিত হও, তোমার যজ্ঞফলের গুণে যমের সহিত মিলিত হও।

এই পিতৃলোকের কথা এবং অতিরিক্তভাবে চন্দ্রলোকের কথা বৃহদারণ্যক উপনিষদেও পাওয়া যায়। সেখানে দুই শ্রেণীর সাধকদের জন্য দুই বিভিন্ন ব্যবস্থার উল্লেখ আছে। যিনি যজ্ঞে,দান এবং তপস্যা করেন,অর্থাৎ বেদের কর্মকাণ্ডের অনুসরণ করেন তিনি প্রথমে ধূমে পরিণত হন, তারপর রাত্রিতে, তারপর দক্ষিণায়ণে। তারপর তিনি পিতৃলোকে যান। তারপর চন্দ্রলোকে যান। সেখানে পুণ্য ক্ষয় হলে তাঁরা আকাশে যান, আকাশ হতে বায়ুতে, বায়ু হতে বৃষ্টিতে, বৃষ্টি হতে পৃথিবীতে। সেখানে তাঁরা অন্ন পরিণত হন, অন্ন হতে পুরুষে সংক্রামিত হন এবং পুরুষ হতে নারীতে গিয়ে পুনরায় জন্মগ্রহণ করেন। (৫)

আর যাঁরা জ্ঞানকাণ্ড অনুসরণ করে সত্যের সাধন করেন তাঁদের জন্য ভিন্ন ব্যবস্থা। তাঁরা প্রথমে অর্চিতে পরিণত হন, তারপর দিনে, তারপর শুক্লপক্ষে, তারপর উত্তরায়ণে ছয়মাস অবস্থান করেন। সেখান হতে তাঁরা দেবলোকে যান, দেবলোক হতে আদিত্যে, আদিত্য হতে বিদ্যুতে এবং সেখান হতে যান ব্রহ্মলোকে, আর ফেরেন না। (৫)

এই প্রসঙ্গে পুরুষ সূক্ত সম্বন্ধে একটু বিস্তারিত আলোচনা

৪। ঋগ্বেদ। ১০। ১৫। ৭-৮

৫। বৃহদারণ্যক। ৬। ২। ১৬

প্রয়োজন হয়ে পড়ে। কারণ, এই সূক্তটির মধ্যে যেমন সর্বব্রহ্ম-বাদের বীজ আছে তেমন এক বিরাট পুরুষ হতে সকল পদার্থের উৎপত্তির কথাও বলা হয়েছে। এই সূক্তের দুটি ভাগ আছে। প্রথমে পাই এক সহস্রশীর্ষ সহস্রাক্ষ পুরুষ; তাঁর এক অংশ ব্যাপ্ত করেছে সকল জীব এবং অন্য তিন অংশ ঊর্ধ্ব আকাশকে ব্যাপ্ত করে আছে। এটি সর্বেশ্বরবাদের বীজ। আরও দেখি তাঁর থেকে উৎপন্ন হলেন এক বিরাট পুরুষ। তাঁকেই যজ্ঞের পশু রূপে ব্যবহার করে দেবতা ও সাধ্যগণ যজ্ঞ করলেন। সেই যজ্ঞ হতে নাক অর্থ স্বর্গ সৃষ্টি হল। সেখানে দেবতা ও সাধ্যগণ বাস করেন। (৬) দুঃখ নেই বলে স্বর্গের আর এক নাম নাক। মনে হয় এই নাকে যাঁরা বাস করেন তাঁরা সাধারণ দেবতা; ইন্দ্র, বরুণআদি দেবতা হতে তাঁরা পৃথক। তাঁদের নিয়েই দেবতাদের সংখ্যা ৩৩ হতে বর্দ্ধিত হয়ে ৩৩৩৯ এ দাঁড়িয়েছে। সুতরাং আমরা দুই শ্রেণীর দেবতা পাচ্ছি। এক শ্রেণীর দেবতা দেবলোকে বাস করেন; তাঁদের সংখ্যাই বেশী। আর এক শ্রেণীর দেবতা যজ্ঞে উপাসিত হন। তাঁদের অবস্থিত তিনটি ক্ষেত্রে ঃ পৃথিবী, অন্তরীক্ষ এবং ব্যোমে।

২

ভক্তিবাদের যুগে দেবতাদের রূপ এবং আবাসস্থানের পরিবর্তন

এবার দেখাতে চেষ্টা করা হবে ভক্তিবাদের প্রভাবে বৈদিক দেবতাদের সম্বন্ধে ধারণা কি ভাবে পরিবর্তিত হয়ে গেল। এই পরিবর্তন দুই ভাবে ক্রিয়া করেছিল। প্রথমত যে প্রাকৃতিক শক্তি গুলির উপর বৈদিক যুগে দেবত্ব আরোপ করা হয়েছিল তাঁদের মানুষের রূপ, মানুষের আচরণ দিয়ে ভূষিত করে ব্যক্তিরূপী অতি-মানুষে রূপান্তরিত করা হল। দ্বিতীয়ত দেবতাদের আবাসস্থান সম্পর্কেও ধারণা পরিবর্তিত হয়ে গেল। উপরের আলোচনায়

৬। পুরুষ সূক্ত ঋগ্বেদ। ১০। ৯০। ১৬

আমরা দেখেছি বৈদিক দেবতা দুই শ্রেণীর ছিলেন, যাঁরা যজ্ঞে আহুতি দ্বারা সম্মানিত হতেন তাঁরা আর যাঁরা নাক বা স্বর্গে বাস করেন। উভয় শ্রেণীর দেবতার আবাসস্থান সম্বন্ধে ধারণা পরিবর্তিত হয়ে গেল। সুতরাং বর্তমান আলোচনা দুই পর্যায়ে করা হবে।

আমরা প্রথমে দেখি যে প্রধান দেবতাগণের বৈদিক যুগে যজ্ঞে আহ্বান করে বিশেষ ভাবে উপাসিত হতেন তাঁদের বিভিন্ন পৌরাণিক দেবতায় রূপান্তরিত করা হল। এই শ্রেণীতে পড়েন ব্রহ্মণস্পতি, বিষ্ণু ও রুদ্র। পরিবর্তিত রূপে ভক্তির যুগে এরা প্রধান দেবতার সম্মানিত পদে স্থাপিত হলেন।

এই পরিবর্তনের পথে প্রথম পদক্ষেপ ত্রিমূর্তির পরিকল্পনা। বিশ্ব সম্বন্ধে ঈশ্বরের তিন ভূমিকা স্বীকৃত হয়ঃ সৃষ্টি, স্থিতি এবং প্রলয়। এই চিন্তাটি আমরা প্রথম বীজ আকারে পাই ছান্দোগ্য উপনিষদে। সেখানে আছে 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলানীতি।' (৭) অর্থাৎ, বিশ্বে যা কিছু আছে সবই ব্রহ্মে আশ্রিত; তাঁর আশ্রয়ে তাদের উৎপত্তি, বিকাশ এবং বিলয়। এখানে ঈশ্বর নৈর্ব্যক্তিক সর্বব্যাপী সত্তারূপে কল্পিত। ভক্তিবাদের যুগে সে দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তিত হয়ে যায়। তাঁর উপর ব্যক্তিত্ব আরোপিত হয় এবং তাঁর স্রষ্টারূপে প্রাধান্য পায়। সুতরাং তিনি সৃষ্টি হতে পৃথক হয়ে যান। এই পরিবর্তনের পথে প্রথম পদক্ষেপ ত্রিমূর্তি পরিকল্পনা। এই তিনটি পৃথক ভূমিকার জন্য তিনটি পৃথক ব্যক্তিত্ব বিশিষ্ট শক্তির পরিকল্পনা হিন্দুর চিন্তায় উদিত হয়। ঈশ্বরের এই তিন ভূমিকার ভিত্তিতে তিনটি পৃথক দেবতার আবির্ভাব হয়।

এরা হলেন ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং মহেশ্বর। এই তিনজনকে একত্রিত করে ত্রিমূর্তির পরিকল্পনা। সামগ্রিকভাবে দেখতে গেলে তাঁরা একই মূলশক্তির তিন রূপ। এখন দেখা যাবে দেবতাদের

৭। ছান্দোগ্য উপনিষদ ৩।১৪।১

রূপ পরিবর্তিত করেই এই তিন পৃথক দেবতার বিষয় ধারণা গড়ে উঠেছে।

প্রথমে ব্রহ্মার কথা ধরা যাক। বেদে ব্রহ্মা নামে কোনও দেবতা নাই। ব্রহ্মণস্পতি নামে একটি বৈদিক দেবতা আছেন। বেদের সংহিতা অংশে ব্রহ্মের অর্থ হল মন্ত্র। সুতরাং ব্রহ্মণস্পতি অর্থে বুঝি মন্ত্রের দেবতা। মনে হয় সেই ব্রহ্মণস্পতিই ভক্তির যুগে ব্রহ্মায় রূপান্তরিত হয়েছেন। তাঁর উপর যে রূপ আরোপ করা হয়েছে তার মধ্যেই আমাদের এই প্রতিপাদ্যের সমর্থন মিলে যাবে। তাঁর চারটি মুখ আছে। তাই তাঁর আর এক নাম চতুরানন। আমরা জানি চারটি বেদ আছে। এক একটি বেদকে প্রতীক হিসাবে ধরে তার চারটি মুখ কল্পিত হয়েছে। অর্থাৎ তিনি চারটি বেদে আশ্রিত সকল মন্ত্রের অধিপতি। সুতরাং তিনি প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্মণস্পতিই রয়ে যান। তবে নূতন রূপে তাঁকে একটি বিশেষ ভূমিকা দেওয়া হয়েছে। তিনি বিশ্বের স্রষ্টারূপে কল্পিত হয়েছেন। সুতরাং তিনি হলেন স্রষ্টারূপী ঈশ্বর। এই ভূমিকা ভক্তিবাদের যুগে প্রতিষ্ঠিত হবার পূর্বে স্মৃতির যুগেই তাঁর উপর আরোপ করা হয়েছিল। মনুস্মৃতির প্রথম অধ্যায়ে তাঁর বিষয় সবিস্তার আলোচনা আছে। মহাভারতে ব্রহ্মার উপর অনেক ভূমিকা ন্যস্ত হয়েছে।

এবার বিষ্ণুর বিষয় আলোচনা করা যেতে পারে। ঋগ্‌বেদে আমরা বিভিন্ন সূক্তে তিনটি দেবতার উল্লেখ পাই : বিষ্ণু, সবিতা এবং সূর্য। তাঁদের উদ্দেশ্যে নিবেদিত সূক্তগুলিতে তাঁদের সম্বন্ধে যে বর্ণনা পাই তা স্পষ্টই ইঙ্গিত করে যে তাঁরা পৃথক দেবতা নন, একই দেবতা। সেই দেবতা হলেন সূর্য। পৃথিবীর মানুষের কাছে সব থেকে বিরাট প্রকট শক্তির উৎস হিসাবে বেদে তাঁর উপর দেবত্ব আরোপ করা হয়েছে। বলা হয়েছে, তিনি সাতটি কিরণ রূপ অশ্ব দ্বারা বাহিত রথে আরোহণ করে আকাশ পরিক্রমা করেন। (৮)

৮। ঋগ্‌বেদ ১।৫০।৫

আরও বলা হয়েছে তিনি সকল স্থাবর ও জঙ্গম প্রাণীর আত্মা-স্বরূপ।

সবিতাকে উদ্দেশ্য করেই বিখ্যাত গায়ত্রী মন্ত্র রচিত হয়েছে। বেদের ঋষি তাঁর কাছে এই প্রার্থনা নিবেদন করেছিলেন যে সবিতা যেন তাঁকে এমন ধীশক্তি দান করেন যাতে সবিতার রহস্যকে ভেদ করবার ক্ষমতা অর্জিত হয়। (৯) অতিরিক্তভাবে আমরা দেখি ঋগ্‌বেদের দশম মণ্ডলের একটি সূক্তে তাঁকে সূর্যের প্রতিশব্দ রূপে ব্যবহার করা হয়েছে। তাঁকে কোথাও সবিতা বলা হয়েছে। কোথাও সূর্য বলা হয়েছে। (১০) সুতরাং আমরা অনায়াসে এই সিদ্ধান্ত করতে পারি যে তাঁরা অভিন্ন দেবতা।

এখন বিষ্ণুর বিষয় আলোচনা করতে পারি। তাঁর সম্বন্ধে যে বিশেষ ভূমিকার উল্লেখ পাই তাতে বলা হয়েছে যে তিনি তিন পদক্ষেপে সমগ্র আকাশ পরিক্রমা করেন: 'বিষ্ণু বিচক্রমে ত্রেধা নিদধে পদম্।' (১১) সায়ন বলেন, এই তিন পদক্ষেপ হল পৃথিবী, অন্তরীক্ষ এবং আকাশ। প্রথম পদক্ষেপ উদয়কালে, দ্বিতীয় পদক্ষেপ ঊর্ধ্বাকাশে মধ্যাহ্নে এবং তৃতীয় পদক্ষেপ অস্ত-গমনের সময়। সুতরাং সন্দেহ নাই যে বিষ্ণু সূর্য হতে অভিন্ন। বিষ্ণুর তিনটি পদক্ষেপ সূর্যের আকাশ পথে পরিক্রমণের সময় তিন স্থানে অবস্থিতির সূচনা করে।

ব্রাহ্মণদের জন্য যে সন্ধ্যাবিধির ব্যবস্থা আছে তাও পরোক্ষভাবে ইঙ্গিত করে যে সূর্য বা সবিতা এবং বিষ্ণু একই দেবতা। সন্ধ্যা-বিধিতে তিনটি সন্ধ্যায় গায়ত্রী মন্ত্র জপ করবার নির্দেশ আছে। এই তিনটি সন্ধ্যা হল প্রাতঃকাল, মধ্যাহ্ন এবং দিবসের অবসান কাল। গায়ত্রী মন্ত্র সবিতা দেবতার উদ্দেশ্যে নিবেদিত। সন্ধ্যা-

---

৯। ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ।

১০। ঋগ্‌বেদ। দশম মণ্ডল। ৫১ তম সূক্ত

১১। ঋগ্‌বেদ ১। ২২। ১৭

বিধি অনুসারে এই মন্ত্রের তিনটি সন্ধ্যার জন্য তিনটি বিশেষ ধ্যানরূপ পরিকল্পিত হয়েছে। প্রাতঃকালে গায়ত্রীর কুমারী রূপ, তিনি হাতে ঋগ্‌বেদ ধারণ করে আছেন ; মধ্যাহ্নের সন্ধ্যায় তিনি যুবতীর রূপ ধারণ করেন এবং তাঁর হাতে থাকে সামবেদ; সায়াহ্নের সন্ধ্যায় তিনি প্রৌঢ়ার রূপ ধারণ করেন এবং হাতে ধরেণ যজুর্বেদ। বিষ্ণুর তিন পদক্ষেপকে লক্ষ্য করে তিনটি সন্ধ্যায় যে গায়ত্রী মন্ত্র জপ হয় তা সবিতা দেবতাকে উদ্দেশ করে রচিত। সুতরাং ত্রিসন্ধ্যার জপবিধি সূর্য, সবিতা এবং বিষ্ণুকে একই দেবতা রূপে স্বীকৃতি দেয়।

তারপর আসেন মহেশ্বর। যেহেতু ত্রিমূর্ত্তি পরিকল্পনাতে তাঁকে ধ্বংস বা প্রলয় ঘটানোর ভূমিকা দেওয়া হয়েছে, তাঁকে ঋগ্‌-বেদের রুদ্র নামে দেবতার পরিবর্তিত রূপে বলে ধরা যায়। কিন্তু ভক্তিবাদের যুগে শিবের সম্বন্ধে ধারণা কিছু পরিবর্তিত হয়েছে। তিনি ধ্বংসের দেবতা হলেও তাঁর উপর কল্যাণ সাধকের ভূমিকা অর্পণ করা হয়েছে। তাই ত তাঁর নাম শিব, তাঁর নাম আশুতোষ। শুধু তাই নয়, তাকে পশুপতিও বলা হয়েছে। কারণ, সংসারের জন্মচক্রে বদ্ধ পশুদের তিনি পালক। এই পশু হল বদ্ধজীবরূপী মানুষ। দেখা যায় শিবের এই দ্বিতীয় রূপটির উৎস হল যজু-র্বেদ। সুতরাং এ বিষয় একটু বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন হয়ে পড়ে।

ঋগ্‌বেদের রুদ্র অন্তরীক্ষ স্থানের দেবতা। মনে হয় প্রলয়ংকর ঝড়ের সংহার শক্তিকে ঋগ্‌বেদে রুদ্ররূপে কল্পনা করা হয়েছে। কারণ, বলা হয়েছে তিনি মরুৎগণের পিতা এবং মেঘ তাদের মাতা। (১২) ঋগ্‌বেদে তাঁর যে চিত্র আঁকা হয়েছে তাতে তিনি ক্রোধপরায়ণ এবং ধ্বংসবিলাসী রূপে পরিকল্পিত। এখানে ভক্তির প্রেরণা যেন ভয়। তাঁকে হব্য দিয়ে খুশি করবার চেষ্টা হয়েছে যাতে তিনি মানুষ এবং পশুদের হিংসা হতে বিরত

১২। ঋগ্‌বেদ ১। ১১৪। ৮

থাকেন। (১২) আরও বলা হয়েছে তিনি উগ্র স্বভাব (১৩) এবং ক্রোধপরায়ণ (১৪)।

তবে রুদ্রের দক্ষিণ মুখের পরিচয় যজুর্বেদে পাওয়া যায় মনে হয়। শুক্ল যজুর্বেদের ষোড়শ অধ্যায়ে রুদ্রদেবতাকে নিবেদিত একটি সূক্তে তাঁর বাম মুখ এবং দক্ষিণ মুখ—উভয়েরই-উভয়েরই পরিচয় মেলে। তার প্রথম কণ্ডিকাতেই 'রুদ্রের ক্রোধ' এবং 'শিব তনুকে' নমস্কার জ্ঞাপন করা হয়েছে। এখানে আরও কিছু বর্ণনা পাই যার মধ্যে শিব সম্বন্ধে পরবর্তীকালে যে কাহিনী রচিত হয়েছিল তার উৎসের সন্ধান মিলবে। সেই তাৎপর্যপূর্ণ কণ্ডিকাটি এখানে উদ্ধৃত করা হল ঃ

নমঃ ভবায় চ রুদ্রায় চ।
নমঃ সর্বায় চ পশুপতয়ে চ।
নমঃ নীলগ্রীবায় চ শিতিকণ্ঠায় চ ॥ (১৫)

এখানে তিনি একাধারে রুদ্র এবং শিবরূপে কল্পিত, তিনি শর্ব অর্থাৎ পাপনাশক এবং পশুদের অর্থাৎ অজ্ঞানতিমিরে আচ্ছন্ন মানুষদের পতি। আরও বলা হয়েছে তাঁর কণ্ঠ নীল এবং ময়ূরের কণ্ঠের মত। এই ঘন নীল রঙ ঝড়ের মেঘের গায়ে দেখা যায়। তাই বোধ হয় এই বর্ণনা। তাকে অবলম্বন করেই পরবর্তীকালে শিবের হলাহল পান করে নীলকণ্ঠ হবার কাহিনীর উৎপত্তি।

কেহ কেহ বলেন, ভক্তিবাদের যুগের শিবের পরিকল্পনার উপর হরাপ্পা সংস্কৃতির প্রভাব প্রতিফলিত হয়েছে। তার ভিত্তি হল এই। শিবকে পশুপতি নামে ভূষিত করা হয়েছে। অপরপক্ষে হরাপ্পার ধ্বংসাবশেষ হতে প্রাপ্ত একটি পোড়ামাটির 'সীলের' ওপর একটি যোগের ভঙ্গিতে উপবিষ্ট মনুষ্যমূর্তি পাওয়া যায়, যাকে ঘিরে স্থাপিত হয়েছে হস্তী, ব্যাঘ্র, গণ্ডার এবং মহিষ। ভারততত্ত্ববিৎ পিগোটের ধারণায় এই আবিষ্কার প্রমাণ করে যে হরাপ্পা

১৩। একই ২।৩৩।৯ ১৪। একই ২।৩৩।৫

১৫। শুক্ল যজুর্বেদ ১৬।২৮

সংস্কৃতি হতেই মহেশ্বরের যোগী ও পশুপতি রূপের উৎপত্তি হয়েছিল। (১৬) তা ঠিক বলে মনে হয় না। পশুর আর এক অর্থ যে কর্মফল বন্ধন স্বরূপ পাশবদ্ধ মানুষ তার প্রতি তাঁর দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় নি। স্পষ্টই বোঝা যায় যজুর্বেদে তাঁকে পশুপতি নামে ভূষিত করা হয়েছিল বলেই তিনি পশুপতি। তাছাড়া ঋগ্‌বেদের রুদ্র যে বৈদিক যুগেই শিব এবং নীলকণ্ঠ রূপে ভূষিত হয়েছিলেন তার প্রমাণও ত যজুর্বেদে মিলে যায়।

ঋগ্‌বেদে অন্তরীক্ষের দেবতা ইন্দ্রের নামেই সব থেকে বেশী সংখ্যক সূক্ত নিবেদিত। তাঁর দুটি ভূমিকা ঃ দস্যু জাতির সহিত সংঘর্ষে আর্যদের সহায়তা করা এবং বৃত্র নামে অসুরকে সংহার করে মেঘ হতে বৃষ্টিপাত ঘটান ও ক্ষীণস্রোত নদীগুলিকে জলে ভরে দিয়ে প্রবাহিত করা। ভক্তিবাদের যুগে তিনি দেবতাদের রাজার পদে অধিষ্ঠিত হয়েছেন। তবে সে যুগে তাঁর থেকে বেশী ক্ষমতা ধারণ করেন এমন দেবতাও স্বীকৃত হয়েছেন, যেমন বিষ্ণু ও শিব। কাজেই রাজসম্মানে ভূষিত হলেও তিনি সর্বাত্মক ক্ষমতা ধারণ করেন না। তাঁর অবস্থা যেন অনেকটা স্বাধীন ভারতের সংবিধান নিয়ন্ত্রিত রাষ্ট্রপতির মত।

আর দুটি দেবতার মহাভারতের আলোচনা প্রসঙ্গে পরিচয় দেবার প্রয়োজন আছে। তাঁরা হলেন নাসত্য বা অশ্বী ভ্রাতৃদ্বয়। ঋগ্‌বেদে তাঁরা দ্যুস্থানের দেবতা ; তাঁরা প্রভাতে তিনচাকার রথে চড়ে সূর্যের আগে আগে চলেন। তারা দ্যৌ-এর নপাতা অর্থাৎ দৌহিত্র (১৭) এবং রুদ্রের পুত্র (১৮) তাঁরা সূর্যের কন্যা সূর্যাকে বিবাহ করেছিলেন। মহাভারতে তাঁদের রূপের কোনও পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় না।

মহাভারতে ধর্ম নামে এক দেবতাকে বিশেষ ভূমিকা দেওয়া

১৬। Stuart Pigatt, Prehistoric India, Chap V, P. 202

১৭। ঋগ্‌বেদ। ১০। ৬১। ৪

১৮। ঋগ্‌বেদ। ১০। ৬১। ১৫

হয়েছে। বনপর্বের শেষে তিনি যক্ষের রূপ ধরে যুধিষ্ঠিরের ধর্মজ্ঞান সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন ও পরীক্ষা করেছিলেন। মহাপ্রস্থানের পথেও তিনি কুকুরের ছদ্মবেশে যুধিষ্ঠিরের সঙ্গী হয়েছিলেন। ঋগ্‌বেদে কিন্তু ধর্ম নামে কোনও দেবতার উল্লেখ পাই না। তবে তিনি যে বৈদিক দেবতা ছিলেন না তা নয়। শুক্ল যজুর্বেদে তাঁর কিছু পরিচয় পাওয়া যায়।

শুক্ল যজুর্বেদের সপ্তবিংশ অধ্যায়ের ত্রয়োদশ হতে বিংশ কণ্ডিকায় ধর্মদেবের প্রশস্তি আছে। সেখানে বলা হয়েছে তিনি সূর্য হতে উৎপন্ন। বলা হয়েছে হৃদয়ের সুস্থতার জন্য, মনের শুদ্ধির জন্য এবং স্বর্গপ্রাপ্তির জন্য তাঁকে স্তব করা হয়। আরও বলা হয়েছে 'পিতা নোঽসি পিতা নো বোধি নমস্তে অস্ত মা মা হিংসীঃ।' তুমি আমাদের পিতার মত, তুমি আমাদের পিতার মত জ্ঞান দাও, তোমাকে নমস্কার, তুমি আমাদের হিংসা কোরো না। উদ্ধৃত অংশটি ব্রাহ্মসমাজে বিশেষ সম্মানের স্থান পেয়েছে।

এই মন্তব্যগুলি হতে বোঝা যায় ধর্ম মানুষকে ন্যায় পথে পরিচালিত করতেন। সেই পথ হতে ভ্রষ্ট হলে শাস্তি দিতেন। তাই তাঁর কাছে প্রার্থনা নিবেদিত হয়েছে তিনি যেন যজমানকে শাস্তি না দেন। ন্যায়ের পথে চালিত হলে মনে শান্তি থাকে এবং স্বর্গপ্রাপ্তি ঘটে। মনে হয় এই চিন্তাটিই মহাভারতের যুগে ধর্ম রূপে একটি বিশেষ দেবতায় এবং সম্ভবত তার উৎস হল যজুর্বেদের ওই সূক্তটি।

ধর্মের বিশেষ ভূমিকা হল মানুষকে ন্যায়ের পথে কর্তব্যের পথে পরিচালিত করা। এখানে কর্তব্য অর্থে বুঝতে হবে বিশেষ বিশেষ শ্রেণীর মানুষের জন্য যে আচরণ বিধি নির্দিষ্ট হয়েছে তা পালন করা। বেদের যুগে ধর্মসূত্রে এবং পরবর্তীকালে ধর্মশাস্ত্র বা সংহিতায় সেই বিধির উল্লেখ আছে। যেমন ক্ষত্রিয়ের ধর্ম, রাজধর্ম, স্ত্রীধর্ম ইত্যাদি। মহাভারতে যক্ষের রূপ ধরে ধর্ম যুধিষ্ঠিরকে যে সব প্রশ্ন করেছিলেন তা হতে মনে হয় যে ধর্মের

অঙ্গ হিসাবে কতকগুলি মানবিক গুণের উপরও বিশেষ গুরুত্ব আরোপিত হত।

দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে বনপর্বে দেখি যুধিষ্ঠিরের পরীক্ষায় সন্তুষ্ট হয়ে যক্ষরূপী ধর্ম তাঁর মৃত চার ভ্রাতার একজনকে উজ্জীবিত করতে সন্তুষ্ট হলেন। তখন যুধিষ্ঠির সহদেবকে পুনরায় উজ্জীবিত করতে অনুরোধ করলেন। এখানে বৈমাত্রেয় ভ্রাতার দাবী সহোদর ভ্রাতার দাবীর উপর অগ্রাধিকার পেল। আমরা দেখি স্বর্গের দরজায় এসে যুধিষ্ঠির কুকুরের বেশধারী ধর্মকে বর্জন করে একা স্বর্গে প্রবেশ করতে অস্বীকার করলেন। তাতে আশ্রিতের প্রতি তাঁর বাৎসল্য প্রমাণিত হল। স্বর্গে প্রবেশের পর তাঁকে অলীকভাবে দেখান হল যে তাঁর চার ভ্রাতা নরকে নির্যাতিত হচ্ছেন। তা দেখে তিনি স্বর্গ ত্যাগ করে তাঁদের কাছে যেতে চাইলেন। তাতে তাঁর মমতাবোধ প্রকট হয়। সুতরাং বোঝা যায় আচরণবিধি পালনের তথা মহৎগুণের উৎসাহ-দাতা দেবতা হিসাবেই ধর্ম পরিকল্পিত হয়েছেন। এইভাবে তাঁরও কিছু রূপান্তর ঘটেছে।

পুরাণের যুগে ধর্মের চরিত্রকে নানাভাবে রঞ্জিত করা হয়েছে। পদ্মপুরাণে তাঁর উৎপত্তিকাহিনী বলা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে যে ব্রহ্মার দক্ষিণ স্তন হতে তিনি উদ্ভূত হয়েছিলেন। আরও বলা হয়েছে যে দক্ষ তাঁর বহু কন্যার মধ্যে তেরো জনের তাঁর সহিত বিবাহ দিয়েছিলেন। মহাভারতে এ বিষয় উল্লেখ আছে। (১৮) এই পত্নীদের মধ্যে আছেন ঃ কীর্তি, লক্ষ্মী, ধৃতি, মেধা, পুষ্টি, শ্রদ্ধা, ক্রিয়া, বুদ্ধি, লজ্জা ও মতি। বোঝাই যায় এখানে প্রতীক রূপেই এই নামগুলির ব্যবহার হয়েছে। তাদের কতকগুলি ধর্ম সম্মত জীবনের সহায়ক গুণ, যেমন ধৃতি, শ্রদ্ধা, লজ্জা, মতি। আবার কতকগুলি অবস্থার উল্লেখ আছে যা ধর্মপথে চললে মানুষ পুরস্কার রূপে পাবার অধিকারী হয়। যেমন ধর্মসম্মত আচরণ দ্বারা লক্ষ্মী, কীর্তি ও পুষ্টি লাভ হয়।

এইবার আমরা দ্বিতীয় পর্যায়ের আলোচনা আরম্ভ করতে পারি। আমরা লক্ষ্য করব বৈদিক দেবতাদের রূপান্তর ঘটার সঙ্গে তাঁদের অধিষ্ঠান ভূমি এবং বাসস্থানের পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। দেবতাদের রূপ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে তাঁদের আবাস বা অবস্থান ভূমিরও পরিবর্তন সাধিত হয়েছে।

আমরা লক্ষ্য করেছি যে বৈদিকযুগের দেবতারা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত ছিলেন। এক শ্রেণীতে পড়েন সাধারণ দেবতা। তাঁরা পরমব্যোমে 'নাকে' অর্থাৎ স্বর্গলোকে সাধ্যদের সঙ্গে বাস করতেন। আর একশ্রেণীর দেবতা প্রাকৃতপক্ষে নানা প্রকৃতিক শক্তির প্রকাশ। তাঁদের কোনও আবাসভূমি ছিল না; কারণ, তাঁরা ত মানুষের মত দেহধারী জীব ছিলেন না যে বাসগৃহের প্রয়োজন হবে। তাঁদের অবস্থান ক্ষেত্রের ভিত্তিতেই তাঁদের বিশেষ বিশেষ স্থানের দেবতা বলে চিহ্নিত করা হত। এইভাবে তাদের তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছিল ঃ দ্যুস্থানের দেবতা, অন্তরীক্ষস্থানের দেবতা এবং পৃথিবী স্থানের দেবতা।

পরবর্তীকালে দেখা যাবে প্রাকৃতিক শক্তির উৎসরূপে যে দেবতাগুলি কল্পিত হয়েছিলেন, তাঁদের উপর মানবোচিত আচরণ আরোপ করা হলেও তাঁদের মানুষে রূপান্তরিত করা হয়নি। ভক্তির যুগে তাদের উপর মনুষ্য প্রকৃতিও আরোপ করা হল। ফলে তাঁরা ঐকান্তিক ভাবে সৌভাগ্যশালী মানুষে রূপান্তরিত হলেন। তাঁদের অজর, অমর, নিত্যসুখী সত্তায় পরিণত করা হল। ফলে তাঁদের উপযুক্ত বাসভূমিরও প্রয়োজন হয়ে পড়ল। তাঁদের বাসস্থান কল্পিত হল হিমালয়ের সেই অঞ্চলে যেখানে বর্তমানে বদরিনাথের মন্দির অবস্থিত। তার বিস্তারিত বর্ণনা দেওয়া হয়েছে পদ্মপুরাণে। বদরিনাথের পশ্চিমে অবস্থিত সুমেরু পর্বতে ইন্দ্রপুরী অমরাবতী স্থাপিত হল। তার উত্তরে কৈলাস পর্বতে স্থাপিত হল কুবেরের নগরী অলকা। এই কৈলাস পর্বতেরই এক অঞ্চলে পার্বতী

সহ শিবের বাসস্থান নির্দিষ্ট হল। কাছেই বিষ্ণুর বাসস্থান বৈকুণ্ঠ অবস্থিত। (১৯)

এই স্বর্গধামের একটি মনোরম বর্ণনা মহাকবি কালিদাস রচিত খণ্ডকাব্য মেঘদূতের উত্তর মেঘের প্রথম অংশে পাওয়া যায়। তার প্রাসঙ্গিক অংশের অনুবাদে উদ্ধৃতি এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না ঃ

ফুলের বাহার নিত্য তাহার,
মুখর ভ্রমর শোভা,
বাপি মাঝে তার হংসের সার,
নিত্য পদ্ম শোভা,
ভবনশিখীর হর্ষ নিবিড়
কলপেতে ভাস্বর,
জ্যোৎস্নার আলো হানে তমজাল
সন্ধ্যায় সুন্দর।
নয়নের জল সেথায় কেবল
সুখের কারণে বহে,
প্রণয়জ দুখ শুধু হানে সুখ,
অন্য কারণে নহে ;
মিলনে সেথায় বিচ্ছেদ নাই
প্রণয় কলহ ছাড়া,
বিত্তবানের সীমা বয়সের
যৌবনে হয় হারা।

সুতরাং বোঝাই যায় স্বর্গের কোনও বাস্তব ভিত্তি নাই। মানুষের বাসনার শেষ নাই। ভোগেন্দ্রিয়গুলির পরিপূর্ণ তৃপ্তির জন্য মানুষ এক কল্পনার লোক সৃষ্টি করে। তার নাম দেয় স্বর্গ। তিল তিল করে সকল বাসনার বিষয়গুলির তৃপ্তির উপকরণ একত্র করে এই কল্পনার স্বর্গ গড়ে উঠেছে।

১৯। পদ্মপুরাণ, স্বর্গখণ্ড, ষষ্ঠ অধ্যায় দ্রষ্টব্য

৩

দেবতারা কি ভিন্ন নক্ষত্র জগৎ হতে এসেছিলেন ?

এই প্রসঙ্গে ডানিকেন প্রতিপাদিত নূতন তত্ত্বটি প্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ে। তাঁর বিশ্বাস পুরাণাদিতে কথিত দেবতারা কল্পিত নয়, তারা সত্তাবান পদার্থ এবং তারা ভিন্ন সৌরজগতের অন্তর্ভুক্ত কোনও গ্রহের জীব। তাদের প্রযুক্তিবিদ্যা এতখানি অগ্রসর হয়েছিল যে তারা আকাশবিহারী যান উদ্ভাবন করে তার সাহায্যে মহাকাশ পাড়ি দিয়ে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছিল। পশ্চিমের মানুষের বুদ্ধিমত্তা সম্বন্ধে আমরা ভারতীয়েরা উচ্চ ধারণা পোষণ করে থাকি। কাজেই ডানিকেনের এই মন্তব্য অনেকেই উল্লাসের সহিত দ্বিধাহীন চিত্তে গলধঃকরণ করে। সুতরাং বিষয়টি যুক্তির সাহায্যে ভাল করে বিচার করে দেখার প্রয়োজন হয়ে পড়ে।

আমরা দুই শ্রেণীর তথ্য পাই ঃ একটি বিজ্ঞান পরিবেশিত, অপরটি দর্শন পরিবেশিত। বিজ্ঞান যে তথ্য প্রতিপাদন করে তা নিশ্চিতভাবে সত্য অর্থাৎ ঘটে থাকে। দুটি বিষয়ের মধ্যে যে সম্বন্ধ তা আরোপ করে তা অবশ্য ঘটবে। এই জন্য এই শ্রেণীর জ্ঞানকে নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান বলা হয়। (২০) দর্শন যে তথ্য স্থাপন করে তা নিশ্চয়াত্মক নয়। তা নানা প্রমাণিত তথ্যকে ভিত্তি করে যা পায় তা সম্ভাবনাত্মক জ্ঞান। অর্থাৎ তা যা বলে তা খুব সম্ভব ঘটে, তবে তা যে নিশ্চিত ঘটে থাকে তা বলা যায় না। সুতরাং তা যা দেয় তা হল সম্ভাবনাত্মক জ্ঞান (২১) তাই জন্য দার্শনিক তত্ত্বগুলির মধ্যে এত বিতর্ক দেখা যায়। আর এক শ্রেণীর তথ্য প্রচারিত হয় যা আপাতদৃষ্টিতে মনে হবে সম্ভাব্য, কিন্তু তার সম্ভাবনা এতই নগণ্য যে তা ঘটবে না ধরে নেওয়াই যুক্তিযুক্ত। যেমন ধরে নেওয়া যাক একটি টাইপ করার যন্ত্রে কাগজ লাগিয়ে

20। judgment of necessity

21। judgment of probability

দিয়ে যদি একটি শিম্পাঞ্জিকে তার বোতাম টিপতে শেখান হয়,তা হলে বহু চেষ্টার ফলে এমন ও হতে পারে যে একটি কবিতা কাগজে ছাপা হয়ে যাবে। তা সম্ভব, কিন্তু সে সম্ভাবনা এত ক্ষীণ যে তা ঘটতে পারে না ধরে নেওয়াই যুক্তিসম্মত হবে। এই ধরনের তথ্যকে আমরা তথাকথিত সম্ভাব্য জ্ঞান বলতে পারি।(২২)

ডানিকেনের স্থাপিত তত্ত্ব এই তৃতীয় শ্রেণীতে পড়ে। এই এই প্রসঙ্গে যে বৈজ্ঞানিক তথ্য এবং তত্ত্বকে ভিত্তি করে এই তত্ত্বটি প্রতিপাদিত হয়েছে তাদের আলোচনা করে নেওয়া যেতে পারে।

আমাদের সৌরজগতে পৃথিবী ভিন্ন অন্য কোনও গ্রহে জীব আছে বলে প্রমাণিত হয়নি। অন্য কোনও সৌরজগতে মানুষের মত বুদ্ধিধারী সত্তা যে আছে তার প্রমাণ এ পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। তবু ধরে নেওয়া যায় বিশ্বে যে কোটি কোটি সূর্য আছে তাদের গ্রহও আছে এবং সেই গ্রহগুলির কোনও কোনওটিতে মানুষের সমস্থানীয় বুদ্ধিমান জীবও বাস করে। এ পর্যন্ত অনায়াসে স্বীকার করে নেওয়া যায়।

এখন ভিন্ন সৌরজগতের অন্তর্ভুক্ত কোনও গ্রহের প্রযুক্তিবিদ্যা কুশল জীবের পৃথিবীতে আসার সম্ভাবনা কতখানি তা দেখা যেতে পারে। আমাদের সৌরজগতের সব থেকে নিকটবর্তী যে নক্ষত্র আছে তার নাম প্রক্সিমা সেন্টরি। তা দক্ষিণ আকাশের তারা। তা আমাদের সৌরজগত হতে চার আলোক বৎসর দূরে অবস্থিত।

এখন মহাশূন্যে ব্যোমযান (২৩) চলে তার সম্ভাব্য গতিবেগ (২৪) কতখানি হতে পারে তা বিবেচনা করা যাক। আমাদের সূর্যের গতিবেগ ঘন্টায় ৪৭,০০০ মাইল, অর্থাৎ প্রতি সেকেন্ডে ১৩ মাইল। মানুষের নিজের নির্মিত ব্যোমযানের গতিবেগ তার থেকে অনেক কম। বিশ্বের সব থেকে দ্রুতগতি সম্পন্ন নক্ষত্র-র গতিবেগ হল ঘন্টায় ৭২,০০০ মাইল অর্থাৎ সেকেন্ডে ২০ মাইল।

22। judgment of…

23। Space Ship 24। Speed

ধরা যাক ডানিকেন যে ভিন্ন সৌর জগতের জীবদের কথা বলেছেন তাদের প্রযুক্তিবিদ্যা এত উচ্চমানের মহাকাশচারী ব্যোমযান নির্মাণ করতে পারে যে তার গতিবেগ দ্রুততম তারকার গতিবেগের আড়াই গুণ বেশী, অর্থাৎ সেকেণ্ডে ৫০ মাইল। এই গতিবেগ সম্পন্ন আকাশযানের এক আলোক বৎসরের দূরত্ব অতিক্রম করতে ৩৬৪০ বছর লাগবে। সুতরাং প্রক্সিমা সেণ্টৌরি হতে তার পৃথিবীতে আসতে ১৪৫৬০ বছর লেগে যাবে। এতদিন কোনও জীব বাঁচবে না।

এখন বলা হতে পারে যে আইনস্টাইন স্থাপিত বিশেষ আপেক্ষিক তত্ত্ব (২৫) অনুসারে কোনও বস্তুর গতিবেগ যদি আলোর গতিবেগের কাছাকাছি যায় তা হলে সময় অতি ধীর পদক্ষেপে চলবে; সুতরাং জরা এবং মৃত্যু বিলম্বিত হবে। কিন্তু আলোর গতিবেগ হল সেকেণ্ডে ১,৮৬,০০০ মাইল। যেখানে মহাশূন্যে ধাবমান নক্ষত্রগুলির গতিবেগ পঞ্চাশ মাইলও নয় সেখানে আলোর গতিবেগের কাছাকাছি গতিবেগ লাভ প্রযুক্তিবিদ্যার নাগালের মধ্যে আসবে কি করে? তা যে গতিবেগ উৎপাদন করতে পারবে তা আলোকের গতিবেগের ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ মাত্র হবে। তাতে জরার আগমন থামিয়ে রাখা যাবে না; মৃত্যুও এমন কিছু বেশী কাল বিলম্বিত হবে না। সুতরাং ডানিকেনের স্থাপিত তত্ত্বের ভিত্তি নিতান্তই দুর্বল। তার সম্ভাব্যতা অত্যন্ত ক্ষীণ বলে ধরে নেওয়া যায়, সমুদ্রের সহিত বারিবিন্দুর অনুপাতের। মতো সুতরাং দেবতারা ভিন্ন জগত হতে এসেছিলেন বলে যে দাবী করা হয়েছে তাকে সম্পূর্ণ অবজ্ঞা করাই যুক্তিসম্বত।

শিশুদের জন্য রূপকথা লেখা হয়। তাতে যা ঘটতে পারে না এমন কথা উল্লেখের যথেষ্ঠ উদাহরণ মেলে। শিশুরা তা গ্রহণ করে; কারণ, তাদের বোধশক্তি এতখানি বিকাশ লাভ করেনি যে সত্যের সঙ্গে মিথ্যার ভেদ বুঝতে পারবে। সেই জন্য এই শ্রেণীর কাহিনী হতে তাদের রসগ্রহণ করতে অসুবিধা হয় না। সেই কারনেই ত

এই শ্রেণীর সাহিত্যকে রূপকথা বলা হয়ে থাকে। তারা যে জগতে শিশুদের নিয়ে যায় তা বাস্তব জগত হতে স্বতন্ত্র। বয়স্ক মানুষের সত্য মিথ্যা জ্ঞান এত প্রখর যে তাদের পক্ষে রূপকথা পড়ে রস গ্রহণ করা সম্ভব হয় না।

তবু দেখা যায় বয়স্ক মানুষও অবস্থা বিশেষে শিশুসুলভ বিলাসে গা ভাসাতে উৎসুক হয়। এই শ্রেণীর বৃদ্ধ শিশুদের দলে পড়েন ভক্তিমার্গের সাধকরা। দেবতাদের মহিমাকীর্তনে পুরাণগুলিতে যে কত আজগুবি কাহিনী স্থান পেয়েছে তা গণনা করে শেষ করা যায় না। তাঁরা তাতে রস পান; কারণ, ভক্তির আতিশয্য তাঁদের বিশ্বাস করবার শক্তিকে এমন বলবতী করে তোলে যে তারাও শিশুদের মত সত্য ও মিথ্যার মধ্যে ভেদ টানবার ক্ষমতা হারান।

তথাকথিত শিক্ষা অভিমানী বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী আধুনিক মানুষের মধ্যেও এই শ্রেণীর বৃদ্ধ শিশুর দর্শন মিলবে। তাঁরা 'সায়ান্স ফিকশন' পড়ে চিত্তবিনোদন করে। তাতে এমন অসম্ভব কাহিনী থাকে যার ভিত্তি বৈজ্ঞানিক তথ্যের কনা মাত্র। কাজেই তাদের সম্ভাব্যতা শতকরা একভাগেরও ভগ্নাংশ মাত্র। ডানিকেনের প্রতিপাদিত তত্ত্ব এই শ্রেণীতে পড়ে। আজগুবিকে সত্য বলে প্রচারের চেষ্টা বললে তা অত্যুক্তি হবে না।

অষ্টম অধ্যায়

সংযোজনের প্রভাবে মূলকাহিনীর পরিবর্তন

১

কাহিনীর রূপান্তর দুই পর্যায়ে

উপরের আলোচনা হতে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে মহাভারত সহস্রাধিক বৎসর ধরে সংযোজন প্রক্রিয়ার সাহায্যে বিকাশ লাভ করে বিরাট আকার ধারণ করেছে। এই দীর্ঘকালের মধ্যে ভারতবাসীর চিন্তা ও ধর্মবিশ্বাস পরিবর্তিত হয়েছে। এর মধ্যে আমরা তিনটি স্তরের সন্ধান পেয়েছি ঃ শ্রুতির স্তর, ধর্ম-শাস্ত্রের স্তর এবং ভক্তিবাদের স্তর।

আমরা দেখব এই পরিবর্তন মহাভারতের কাহিনীর উপরও রীতিমত প্রভাব বিস্তার করেছে। সেই প্রভাব সংক্রামিত হয়েছে দুইভাবে। প্রথমত ধর্মবিষয়ক বিশ্বাসের পরিবর্তনের ফলে মহাভারতের চরিত্রগুলির রূপান্তর ঘটান হয়েছে। ফলে কেহ দেবতার পদে উন্নীত হয়েছেন, কেহ দেবতার আত্মজরূপে স্বীকৃত হয়েছেন। এই পথে প্রভাব মূল কাহিনীরও পরিবর্তন ঘটিয়েছে। তার উৎকৃষ্ট উদাহরণ মহাভারতের মধ্যেই ঐতিহাসিক মানুষ কৃষ্ণ বিষ্ণুর অবতারে রূপান্তরিত হয়েছেন। একই কারণে স্বাভাবিক পিতৃত্ব অস্বীকার করে নিয়োগবিধির প্রয়োগে কয়েকটি চরিত্রকে বিভিন্ন দেবতার আত্মজরূপে চিত্রিত করা হয়েছে। দ্বিতীয় পথে নিকৃষ্ট চরিত্রগুলিকেও রাক্ষসাদির অবতারে রূপান্তরিত করে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধকে দেবাসুরের যুদ্ধের পুনরাবৃত্তি রূপে স্থাপনের চেষ্টা হয়েছে।

এই দুই শ্রেণীর প্রভাবেরই উৎস হল কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের প্রকৃতি। এই যুদ্ধ যে একটিঐতিহাসিক ঘটনা তাধরেনেওয়া যায়।

এমন অনেক তথ্য পাওয়া গেছে যাকে ভিত্তি করে একাধিক খ্যাতি-মান ঐতিহাসিক তার ইতিহাসগত সত্যতা স্বীকার করে নিয়েছেন। মূল ঘটনা হল ভারতবংশের দুই ভ্রাতা ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডুর পুত্রদের মধ্যে রাজ্যের অধিকার নিয়ে বিবাদ। ধৃতরাষ্ট্রের জন্মান্ধতাই এই বিবাদের মূলে। তিনি যদি স্বাভাবিক দৃষ্টি-সম্পন্ন মানুষ হতেন তা হলে তিনি জ্যেষ্ঠত্বের দাবীতে অবিসম্বাদি-ভাবে রাজা হতেন। তা ছিলেন না বলে পাণ্ডু রাজা হন। তাঁর অকাল মৃত্যুর ফলে সন্তানগণ অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছিল বলে ধৃতরাষ্ট্র অন্ধত্ব সত্বেও রাজা হলেন। এইভাবে জটিলতার মীমাংসা হয়।

কিন্তু ধৃতরাষ্ট্রের দুর্বলতার মুহূর্তে উদারতা বিষয়টিকে আবার জটিল করে তোলে। যতুগৃহ অগ্নিদগ্ধ হবার পর দীর্ঘকাল অজ্ঞাতবাস করে পাণ্ডবরা যখন দ্রৌপদীকে বিবাহ করেন, তখন ধৃতরাষ্ট্র তাঁদের আশ্রয় দেন। শুধু আশ্রয় নয়, রাজ্যের এক অংশ ভাগ করে যুধিষ্ঠিরকে তার রাজপদে অভিষিক্ত করেন।

তারপর পাণ্ডবদের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি ঈর্ষাপরায়ণ দুর্যোধনের অসহ্য হওয়ায় তিনি দ্যূতক্রীড়ার সাহায্যে পাণ্ডবদের নির্বাসিত করেন, কিন্তু রাজ্য দাবী করবার অধিকার হতে তাঁদের ভ্রষ্ট করতে পারেননি। তাই শেষে বিবাদ চূড়ান্ত পর্যায়ে এল। দ্যূতক্রীড়ার পরাজয় হেতু পাণ্ডবদের উপর যে সর্ত আরোপ করা হয়েছিল তা নিষ্ঠার সহিত পালন করে পাণ্ডবগণ রাজ্য ফিরে পাবার দাবী উত্থাপন করলেন। দুর্যোধনের অনমনীয় মনোভাব হেতু আলাপ আলোচনার সাহায্যে তার নিষ্পত্তি সম্ভব হল না। কাজেই যুদ্ধের সাহায্যে তার মীমাংসার জন্য কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ সংঘটিত হল।

এই যুদ্ধ এমন সর্বাত্মক এবং তার পরিণতি এমন ধ্বংসাত্মক যে তা প্রাচীনকালের ভারতীয় ইতিহাসে সব থেকে স্মরণীয় ঘটনা বলে স্বীকৃতি লাভ করেছিল। বৈদিক সাহিত্যের মধ্যে তার একটি উল্লেখও পাওয়া যায়। অশ্বলায়নের গৃহ্যসূত্রে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের উল্লেখ আছে। মূল ঘটনা হল ভারতবংশের দুই ভ্রাতা ধৃতরাষ্ট্র ও

পান্ডুর পুত্রদের মধ্যে রাজ্যবিভাগ নিয়ে বিরোধ। পরিণতিতে কুরুক্ষেত্রে যে ধ্বংসাত্মক যুদ্ধ হয়েছিল তা প্রাচীনযুগের সব থেকে স্মরণীয় ঘটনা বলেই সেখানে তার উল্লেখ পাই।

অতিরিক্তভাবে তার দুই বিবদমান পক্ষ এমন ভাবে গঠিত যে তার একপক্ষের দিকে ন্যায় এবং অপর পক্ষের দিকে অন্যায় যেন পরস্পর সংঘাতে জড়িত হয়ে পড়েছিল। তাই তা এক রকম ন্যায়ের সহিত অন্যায়ের, ধর্মের সহিত অধর্মের সংঘর্ষের রূপ নিয়েছিল। এই সংঘর্ষে যে চরিত্রগুলি জড়িত হয়ে পড়েছিল তাদের মধ্যে অনেকে নানা মহৎগুণে ভূষিত আবার অনেকে নানা দোষে কলঙ্কিত। এই পরিবেশে ঐতিহাসিক চরিত্রগুলি পরবর্তী-কালের চিন্তায় পূজিত বা নিন্দিত হয়েছিল। তাদের আনুষঙ্গিক ফল হিসাবে তাদের উপর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে দেবত্ব বা রাক্ষসত্ব আরোপ করা হয়েছিল। এমনকি কোনও কোনও বিভিন্ন চরিত্রের জন্মকাহিনীও পরিবর্তিত করা হয়েছিল। তাকে সম্ভব করবার জন্য মূলকাহিনীরও পরিবর্তন ঘটেছিল।

আমরা দেখব এই পরিবর্তন সংঘটিত হয়েছিল দুই পর্যায়ে। প্রথম পর্যায়ে দেখি কয়েকটি চরিত্রের মধ্যে নানা দেবোচিত গুণ আবিষ্কৃত হয়েছে। ফলে তাঁদের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা উৎপাদিত হয়েছে। তারই পরিণতি হিসাবে কাউকে দেবতা পদে উন্নীত করা হয়েছে ; যেখানে তা সম্ভব হয়নি সেখানে চরিত্রগুলিকে দেবতার আত্মজে রূপান্তরিত করা হয়েছে। কাজেই তাদের সম্ভাব্যতার পরিবেশ রচনার জন্য মূল কাহিনীর প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সাধিত হয়েছে; এমন কি তার সমর্থনে অবাস্তব কাহিনীও সংযুক্ত হয়েছে।

দ্বিতীয় পর্যায়ে নজর পড়েছে সেই চরিত্রগুলির উপর যাদের আচরণ একান্ত বিগর্হিত এবং নীতি বিরুদ্ধ। তাদের প্রতি ঘৃণার উদ্রেক হবার ফলে তাদের নিকৃষ্ট শক্তি বা প্রাণীর অবতার রূপে কল্পনা করা হয়েছে। তার আনুষঙ্গিক ফল হিসাবে কুরুক্ষেত্রের

যুদ্ধকে পুরাণে বর্ণিত দেবতা ও অসুরদের সংঘর্ষের পুনরাবৃত্তি রূপে চিহ্নিত করা হয়েছে। ফলে যে মানুষগুলি ভারতবংশের দুই শাখার আত্মঘাতী সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছিলেন তাঁদের দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে। তাঁদের মধ্যে এক দলের মানুষকে বিভিন্ন দেবতার অবতার এবং প্রতিপক্ষ দলের মানুষকে বিভিন্ন অশুভ শক্তি ও রাক্ষসদের অবতাররূপে চিহ্নিত করা হয়েছে।

আমরা এখন দুই পর্যায়ে এই ভাবে কি রূপান্তর ঘটেছিল তার একটু বিস্তারিত পরিচয় সংগ্রহ করব।

২

প্রথম পর্যায়ের রূপান্তর : মূলচরিত্রগুলির উপর অবতারত্ব বা বিভিন্ন দেবতার পিতৃত্ব আরোপ

মহাভারতের মূল কাহিনীর সহিত মোটামুটি আমরা পরিচিত। শান্তনুর মৃত্যুর পর ভীষ্ম বিচিত্রবীর্যকে কুরুরাজ্যের শূন্য রাজ-পদে অধিষ্ঠিত করলেন। তিনি স্বেচ্ছায় সিংহাসনে উত্তরাধিকারের দাবী ত্যাগ করেছিলেন বলে উত্তরাধিকারের প্রশ্নে জটিলতা দেখা দিল না। বিচিত্রবীর্য অকালে নিঃসন্তান অবস্থায় মারা গেলে এক নূতন সমস্যার উদ্ভব হল। ভীষ্মের সম্মতি নিয়ে সত্যবতীর ইচ্ছায় বিচিত্রবীর্যের পত্নীদের গর্ভে দুই নিয়োগপুত্র ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডু জন্মগ্রহণ করলেন। তাঁদের মধ্যে ধৃতরাষ্ট্র যদিও অগ্রজ তিনি জন্মান্ধ হয়ে মাতৃক্রোড়ে ভূমিষ্ঠ হলেন। অদৃষ্টের এই পরিহাস মনে হয় কুরুবংশের ধ্বংসের বীজ বপন করেছিল। এই কারণে পরে জন্মগ্রহণ করেও পাণ্ডু কুরুদের রাজা হলেন।

ভাগ্যের প্রতিকূলতায় পাণ্ডু অকালে মৃত্যু বরণ করেছিলেন। এদিকে সিংহাসন অধিকার করবার উপযুক্ত অপর কেহ না থাকায় অন্ধ হয়েও ধৃতরাষ্ট্র সিংহাসন লাভ করলেন। এই নূতন পরিস্থিতি ধৃতরাষ্ট্রের জ্যেষ্ঠপুত্রের সিংহাসনে উত্তরাধিকারের একটি অনুকূল অবস্থা রচনা করল। কিন্তু ভাগ্যের আর এক প্রতিকূলতা সেই

সম্ভাবনাকে বিঘ্নিত করল। পাণ্ডুর প্রথম পুত্র যুধিষ্ঠির ধৃতরাষ্ট্রের প্রথম পুত্র দুর্যোধনের পূর্বে, জন্মগ্রহণ করলেন। সুতরাং সিংহাসনে উত্তরাধিকারের দাবী যুধিষ্ঠিরের বেশী যুক্তিসঙ্গত হল এবং দুর্যোধনের উত্তরাধিকারের সম্ভাবনা ক্ষীণ হয়ে পড়ল। যেহেতু যুধিষ্ঠির দুর্যোধনের অগ্রজ এবং তাঁর পিতা মৃত্যু পর্যন্ত রাজা ছিলেন হস্তিনাপুরের সিংহাসনে তাঁর অগ্রাধিকার।

দুর্যোধন ভাগ্যের এই বিরোধিতাকে স্বীকার করে নিতে চাইলেন না। তিনি ঈর্ষার বশীভূত হয়ে নানা কৌশলে পাণ্ডবদের বিতাড়িত করতে এমন কি সম্ভব হলে প্রাণনাশ করতে চাইলেন। তাঁর এই দুরভিসন্ধির সহায়তা করল পিতা ধৃতরাষ্ট্রের অন্ধ পুত্র-বাৎসল্য। তিনি যে একেবারেই কর্তব্যবোধ সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন না তা নয়। তবে প্রতিসংকটের মুহূর্তে তাঁর বাৎসল্য তাঁর কর্তব্যবোধকে স্তিমিত করে দিত।

সুতরাং দেখি দুর্যোধন বাল্য হতেই পাণ্ডবদের ঘোর শত্রু হয়ে দাঁড়ালেন। তার মন যে পাণ্ডবদের প্রতি বিরূপ এবং তাঁদের বিপদে ফেলতে পারে এবং তাঁর বুদ্ধিশক্তি যে তাঁকে অভিসন্ধি-মূলক আচরণে উৎসাহিত করতে পারে তার প্রমাণ তিনি বাল্যেই দিলেন। কুরুবংশের রাজপুত্রদের জন্য গঙ্গার তীরে একটি জল-ক্রীড়ার ব্যবস্থা ছিল। তাকে প্রমাণকোটি বলা হত। তিনি সেখানে সহোদর এবং জ্ঞাতিভ্রাতা পাণ্ডবদের নিয়ে জলক্রীড়া এবং বহির্-ভোজনের ব্যবস্থা করলেন। সেখানে দুর্যোধন ভীমের খাদ্যের সহিত বিষ মিশিয়ে দেওয়ায় জলক্রীড়ার সময় ভীম অচৈতন্য হয়ে জলে ডুবে যান। সৌভাগ্যক্রমে দুর্যোধনের এইভাবে ভীমের প্রাণ-নাশের চেষ্টা সফল হয় নি। ভাগ্যের আনুকূল্যে ভীম জীবিত অবস্থায় ফিরে এসেছিলেন।

দুর্যোধনের পরবর্তী ষড়যন্ত্র আরও মারাত্মক। তাঁর অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য ছিল মাতা সহ পঞ্চপাণ্ডবদের এক সঙ্গে হত্যা করা। দুর্যোধন বারণাবতে একটি মনোরম অট্টালিকা নির্মাণ করে

সেখানে পাণ্ডবদের থাকতে অনুরোধ করলেন। গৃহটি যতু দিয়ে নির্মিত। উদ্দেশ্য পাণ্ডবদের রাত্রে অগ্নিসংযোগে ঘুমন্ত অবস্থায় পুড়িয়ে মারা। পাণ্ডবরা সে চক্রান্ত ধরে ফেললেন এবং আত্ম-রক্ষার জন্য আত্মগোপন করাই নিরাপদ মনে করলেন। তাই নিজেরাই যতুগৃহে আগুন লাগিয়ে সুড়ঙ্গপথে পালিয়ে গিয়ে অজ্ঞাতবাস আরম্ভ করলেন। প্রচার হল পাণ্ডবরা অগ্নিদগ্ধ হয়ে মারা গেছেন। কিন্তু দ্রৌপদীর সয়ম্বর সভায় অর্জুনের লক্ষ্যভেদ পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটাল। একদিকে যেমন আবিষ্কৃত হল যে পাণ্ডবরা জীবিত আছেন, অপরদিকে পাণ্ডবদের অনুকূল একটি নূতন অবস্থার সৃষ্টি হল। এতদিন তাঁরা সহায়হীন অবস্থায় দুর্যোধনের ঈর্ষাজনিত প্রতিকূলতায় রীতিমত বিপন্ন ছিলেন। এখন দ্রৌপদীর সহিত বিবাহের ফলে তাঁরা এক শক্তিশালী রাজার ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ে পরিণত হলেন। ফলে তাঁরা খানিকটা নিরাপদ হলেন।

তখন ধৃতরাষ্ট্রও বিবেকের দংশনে পাণ্ডবদের অন্যায়ের একটি ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করলেন। তাঁর রাজ্য দুভাগ করে একটি অংশের রাজপদে যুধিষ্ঠিরকে স্থাপন করলেন। পূর্বপুরুষ স্থাপিত রাজধানী হস্তিনাপুর তাঁর অংশের রাজধানী রয়ে গেল; যুধিষ্ঠিরকে ইন্দ্রপ্রস্থে নূতন রাজধানী গড়ে তুলতে হল। অল্প কালের মধ্যেই অনুজ ভ্রাতাদের আনুগত্য এবং বীর্যের সহায়তায় তিনি সাফল্যের সহিত রাজসূয় যজ্ঞ সম্পাদন করে খ্যাতিমান হয়ে উঠলেন।

এই রাজসূয় যজ্ঞের সমারোহ দুর্যোধনের ঈর্ষা ও বিদ্বেষ ভাবকে রীতিমত বর্দ্ধিত করল। তিনি পাণ্ডবদের খ্যাতি ও প্রতিপত্তি সহ্য করতে পারলেন না। এবার মাতুল শকুনির পরামর্শে কৌশলে পাণ্ডবদের দমন করতে চাইলেন। মাতুলের পরামর্শে যুধিষ্ঠিরকে অক্ষক্রীড়ায় আমন্ত্রণ করলেন। সেকালে রীতি ছিল অক্ষক্রীড়ায় আমন্ত্রণ করলে তা প্রত্যাখ্যান করতে নেই। সুতরাং যুধিষ্ঠিরের সে আমন্ত্রণ গ্রহণ করা ছাড়া উপায় ছিল না। অক্ষক্রীড়ায় পরাজিত হয়ে চার ভ্রাতা ও দ্রৌপদী সহ তাঁকে দুর্যোধনের দাসত্ব গ্রহণ করতে

লুউসা রহলে। আতিশয্যে দুঃশাসন অন্তঃপুর হতে দ্রৌপদীকে বলপূর্বক প্রকাশ্য সভায় এনে লাঞ্ছিত করলেন। প্রশ্ন উঠেছিল যিনি পাঁচ ভ্রাতার পত্নী তাঁকে দাসত্বে আবদ্ধ করবার একক যুধিষ্ঠিরের অধিকার ছিল কিনা। এমন কি দুর্যোধনের বিকর্ণ নামে এক ভ্রাতা এই প্রতিবাদের সমর্থন করেছিলেন; কিন্তু এই চূড়ান্ত অপমান হতে দ্রৌপদীকে রক্ষা করতে পারেন নি।

এই বর্বরোচিত আচরণ ধৃতরাষ্ট্রের কর্ণগোচর হলে তিনি ক্ষুব্ধ হলেন। তিনি দ্রৌপদী সহ পঞ্চ পাণ্ডবকে দাসত্ব হতে মুক্তি দিলেন। তাঁর এই আচরণ ধৃতরাষ্ট্রের মনের দোটানা ভাবের সুন্দর পরিচয় দেয়।

কিন্তু দুর্যোধন ছাড়বার পাত্র নন। আবার পূর্বের কৌশল প্রয়োগ করে মাতুলের সাহায্যে দ্যূতক্রীড়ায় যুধিষ্ঠিরকে পরাস্ত করে পাণ্ডবদের দ্বাদশ বৎসরের জন্য নির্বাসন করা হল। তার সঙ্গে একটি সর্ত জুড়ে দেওয়া হল যে শেষের এক বৎসর অজ্ঞাত-বাস করতে হবে। আবিষ্কৃত হলে আবার দ্বাদশ বৎসর নির্বাসন। সৌভাগ্যক্রমে পাণ্ডবগণ এইকঠিন সর্ত পালন করতে পেরেছিলেন। কিন্তু সর্ত পালন করে দ্বাদশ বৎসর পরে পাণ্ডবগণ যখন নিজেদের রাজ্য ফিরে চাইলেন দুর্যোধন সম্মত হলেন না। যুদ্ধের দ্বারা মীমাংসা অবাঞ্ছনীয় বিবেচনা করে যুধিষ্ঠির পাঁচ ভ্রাতার জন্য পাঁচখানি গ্রাম চাইলেন। দুর্যোধন তাঁকে ভুল বুঝলেন, ভাবলেন পাণ্ডবগণ ভয় পেয়ে যুদ্ধ বর্জন করতে চাইছেন। তিনি বললেন বিনা যুদ্ধে সূচ্যগ্র পরিমান ভূমিও মিলবে না। অগত্যা যুদ্ধের সাহায্যেই পাণ্ডবদের এই ন্যায়সঙ্গত দাবীর মীমাংসা হল। সেই যুদ্ধের শেষে পঞ্চপাণ্ডব ব্যতীত কুরুবংশের আর কেউ জীবিত রইল না। এই ধ্বংসাত্মক পরিণতির জন্য সে যুদ্ধ ইতিহাসে অমর হয়ে রইল। এই অমরত্ব লাভের আরও একটি কারণ ছিল। তা অর্জুনের এই ভবিষ্যদ্বানীকে সত্য প্রমাণিত করেছিল যে যেদিকে ধর্ম সেদিকে জয়। 'যতো ধর্মস্ততো জয়ঃ।'

দীর্ঘকাল ধরে বিকাশের পর মহাভারত যখন পূর্ণ আকার ধারণ করল তখন তার যিনি সম্পাদনা করেছেন তিনি অনুক্রমণিকা পর্বে এই কাহিনীটির প্রকৃতির একটি সুন্দর বিশ্লেষণ দিয়েছেন। তা এমন সহজ ভাষায় লিখিত হয়েছে যে মূলটি উদ্ধৃত করলে যিনি সংস্কৃতে বিশেষ অধিকার রাখেন না, তাঁরও বুঝতে অসুবিধা হবে না। প্রাসঙ্গিক বিশ্লেষণটি এই ঃ

দুর্যোধনো মন্যুমযো মহাদ্রুমঃ
স্কন্ধঃ কর্ণঃ শকুনিস্তস্য শাখাঃ ।।
দুঃশাসনঃ পুষ্পফলে সমৃদ্ধে
মূলং রাজা ধৃতরাষ্ট্রো মনীষী ॥
যুধিষ্ঠির ঃ ধর্মময়ো মহাদ্রুমঃ
স্কন্ধোঽর্জুনো ভীম সেনোঽস্য শাখাঃ।
মাদ্রী সুতৌ পুষ্পফলে সমৃদ্ধে
মূলং কৃষ্ণো ব্রহ্ম চ ব্রাহ্মণাশ্চ ॥ (১)

মহাভারতের কাহিনী যেন দুই বিপরীত মহাশক্তির দ্বন্দ্ব। প্রতিশক্তিকে একটি মহাদ্রুমের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। যাঁরা দুই পক্ষে বিভিন্ন ভূমিকা নিয়েছিলেন তাঁদের ভূমিকার গুরুত্ব এবং প্রকৃতি অনুসারে তাঁদের দুটি মহাবৃক্ষের বিভিন্ন অঙ্গের সহিত তুলনা করা হয়েছে।

সুন্দর উপমাভিত্তিক বিশ্লেষণ। ঈর্ষার সঙ্গে ন্যায়সঙ্গতভাবে গড়ে ওঠা সৌভাগ্যের সংঘাত। ফলে একটি বিখ্যাত রাজবংশ উভয় পক্ষের মিত্ররাজগণ সহ ধ্বংস হয়ে গেল। একটি মাত্র সান্ত্বনা বিজয়লক্ষ্মী তিলক পরালেন যিনি ধর্মসম্মত পথ অনুসরণ করে-ছিলেন তাঁর কপালে। তা সম্ভব হয়েছিল যে দুটি মানুষের সহায়তায় তাঁরা হলেন অর্জুন ও কৃষ্ণ। অর্জুনের বীর্য সে বিজয় সম্ভব করেছিল এবং কৃষ্ণের প্রজ্ঞা ও উপদেশ তাকে অনুকূল

১। আদিপর্ব। ১। ১১০-১১

পরিণতির পথে পরিচালিত করেছিল। তাই তারা স্বীকৃতি পেলেন নর এবং নরোত্তম রূপে।

শুধু অর্জুন ও কৃষ্ণ নন, অন্য পান্ডব ভ্রাতাগণও সত্য ও ন্যায়ের পথ অবলম্বন করে যে দৃষ্টান্ত রাখলেন তার ফলে তাঁরা যুগ যুগ ধরে অগণিত মানুষের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করলেন। এই পরিস্থিতিতে ভারতের মাটির গুণে যা ঘটবার তাই ঘটল। আমরা ভারতবাসীরা ব্যক্তিবিশেষের মধ্যে অনন্যসাধারণ গুণ ও খ্যাতির পরিচয় পেলে মুগ্ধ হয়ে প্রথমে তাঁকে ভালবাসি, তারপর তাঁকে শ্রদ্ধা করি এবং অবশেষে শ্রদ্ধা ও ভক্তির আতিশয্যে তাঁকে দেবতা বা দেবকল্প মানুষে রূপান্তরিত করি। তাঁদের মধ্যে আবার যিনি অপরিসীম শ্রদ্ধা ও ভক্তি আকর্ষণ করেন, তাঁকে ঈশ্বরের অবতার রূপে স্বীকৃতি দিই। মহাভারতের অন্যতম মূল চরিত্র কৃষ্ণের ক্ষেত্রে তাই ঘটেছিল। তাঁকে বিষ্ণুর অবতার পদে স্থাপন করা হয়েছিল। আর যে দেবকল্প চরিত্রের মানুষগুলির তিনি নেতৃত্ব গ্রহণ করে ধর্মযুদ্ধকে বিজয়ের পথে পরিচালিত করেছিলেন তাঁদের দেবকল্প চরিত্ররূপে স্থাপনের চেষ্টা হয়েছিল তাঁদের উপর বিশেষ বিশেষ দেবতার পিতৃত্ব আরোপ করে। এইভাবে বিকাশের পথে কতকগুলি কাহিনী মহাভারতের অন্তর্ভুক্ত করে কয়েকটি চরিত্রের প্রথম পর্যায়ে পরিবর্তন ঘটান হয়েছিল।

ভক্তদের মনের মধ্যে এই প্রতিক্রিয়ার প্রভাবে কৃষ্ণ উন্নীত হলেন বিষ্ণুর অবতারের পদে আর পঞ্চপান্ডবের সহিত বিভিন্ন দেবতার পিতৃত্বের সম্বন্ধ আরোপ করা হল। অথচ আমরা ভুলে যাই কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল বৈদিক যুগে যখন এই দেবতাগুলি কতকগুলি প্রাকৃতিক শক্তির উৎসস্বরূপ এবং তাঁদের উপর তখনও মানবপ্রকৃতি আরোপ করা হয়নি। অথচ যে দেবতা-গুলির সহিত কাহিনীর রূপান্তর ঘটিয়ে পান্ডদের পিতা-পুত্র সম্বন্ধ আরোপিত হয়েছে তাঁরা পৌরাণিক যুগের দেবতা। তাঁদের প্রকৃতি কল্পিত হয়েছে মানুষের প্রকৃতির অনুরূপ। এই পরিবর্তন

কি উপায় অবলম্বন করে সংঘটিত হয়েছিল সে বিষয় আলোচনা করে দেখা প্রয়োজন।

প্রথমে কৃষ্ণের কথা ধরা যাক। তাঁকে বিষ্ণুর অবতারের পদে স্থাপন করা হয়েছে ভীষ্ম পর্বের মধ্যে গীতার সংযোজন ঘটিয়ে। (২) তার ফলে কি ভাবে ঐতিহাসিক মানুষ কৃষ্ণ ভগবানে রূপান্তরিত হলেন সে বিষয় পূর্বের এক অনুচ্ছেদে আলোচনা করা হয়েছে। সুতরাং তার বিস্তারিত আলোচনার এখানে প্রয়োজন নাই।

একই মানসিকতা যে পঞ্চপাণ্ডবের পিতৃত্বের রূপ পরিবর্তিত করেছিল এমন মনে করবার সঙ্গত কারণ আছে। স্বাভাবিক ভাবে পাণ্ডুরই তাঁদের জনক হওয়া উচিত। বিচিত্রবীর্য হতে পাণ্ডুর অবস্থা ভিন্ন প্রকৃতির। বিচিত্রবীর্য নিঃসন্তান অবস্থায় দুই বিধবা পত্নী রেখে মারা যান। এদিকে ভীষ্ম ভীষণ প্রতিজ্ঞা করেছিলেন তিনি চিরকুমার থাকবেন। এই পরিস্থিতিতে বংশধারা রক্ষার জন্য নিয়োগপুত্র উৎপাদনের ব্যবস্থা স্বাভাবিক। অপর পক্ষে পাণ্ডু দুই পত্নীসহ সুস্থশরীরে বনে বাস করছেন এবং পাঁচটি পুত্র লাভ করছেন, অথচ তিনি তাদের প্রকৃত জনক হলেন না—এটি একটি অস্বাভাবিক এবং অবাস্তব অবস্থা। এই কথাটি মনে রেখে আমরা পাণ্ডবদের যে জন্মকাহিনী মহাভারতে স্থাপিত হয়েছে তার বাস্তব ভিত্তি আছে কিনা তা পরীক্ষা করে দেখে নিতে পারি।

কাহিনীটি আদি পর্বের ১১৮ হতে ১১৯ অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে। সংক্ষেপে তা এই রকম দাঁড়ায়। ধৃতরাষ্ট্র অগ্রজ হলেও অন্ধ হওয়ায় পাণ্ডুকে রাজা করা হল। তিনি বনে মৃগয়া করতে ভালবাসতেন। একদিন মৃগয়া করতে গিয়ে এক কামাসক্ত

২। ভীষ্ম পর্বের অন্তর্ভুক্ত চারটি (উপ) পর্ব আছে ঃ জম্বুখণ্ড, নির্মাণ পর্ব, ভূমিপর্ব, ভাগবদ্গীতা পর্ব। ভাগবদ্গীতা পর্বে ৪২টি অধ্যায় আছে। তাদের মধ্যে পঞ্চবিংশ অধ্যায় দ্বিচত্বারিংশ অধ্যায় নিয়ে গীতা।

হরিণকে শরাঘাত করলেন। তখন মৃত্যুর যন্ত্রণায় কাতর অবস্থায় সে মানুষের ভাষায় পাণ্ডুকে বলল: সে প্রকৃতপক্ষে কিন্দব নামে এক মুনি; হরিণীর প্রতি আসক্ত হয়ে হরিণরূপ ধরে যখন সে কামাসক্ত ছিল, সেই অবস্থায় পাণ্ডু তাকে শরাঘাত করেছেন এবং ফলে তার মৃত্যু ঘটতে চলেছে। এই পাপ হেতু পাণ্ডুকে সে এই অভিশাপ দিয়ে গেল যে তিনিও কামাসক্ত অবস্থায় মারা যাবেন। তখন পাণ্ডু দুই পত্নীকে সঙ্গে নিয়ে বনবাসে গেলেন। উদ্দেশ্য, তিন জনেই বনে গিয়ে তপস্যা করে জীবন অতিবাহিত করবেন।

কাহিনীটিতে এত বেশী কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করা হয়েছে যে আপাতদৃষ্টিতে অসম্ভব মনে হবে। মানুষ ইচ্ছামত মৃগরূপ ধরবে, যিনি মুনি তিনি এইরূপ নির্লজ্জ আচরণ করবেন এবং এমন মুনির অভিশাপ ফলে যাবে—এতগুলি ঘটনা ঘটেছে ধরে নিতে হলে বুদ্ধিশক্তিকে সম্পূর্ণ বনবাসে পাঠাতে হয়। তারপর কামাসক্ত হয়ে মৃত্যুর আশঙ্কা থাকলে পাণ্ডু যখন স্বেচ্ছায় আত্ম-নির্বাসনের ব্যবস্থা করেছিলেন তখন দুই পত্নীকে বর্জন করাই যুক্তি সম্মত ছিল। কিন্তু কাহিনী বলে পাণ্ডু সে সাবধানতা অবলম্বন করেন নি। সুতরাং কাহিনী একেবারেই প্রকৃতির নিয়ম বিরুদ্ধ এবং যুক্তি দ্বারা সমর্থিত নয়। ঐতিহাসিক কাহিনীতে তার স্থান হতে পারে না।

কাহিনীতে এই পরিবেশে পাণ্ডবদের জন্মকাহিনী স্থাপিত হয়েছে। মুনির অভিশাপ হেতু পাণ্ডু পত্নীদের সহিত সহবাস করতে পারেন না। কাজেই তাঁর সন্তান হবার পথ অবরুদ্ধ। তিনি জানতে পারলেন কুন্তী কুমারী অবস্থায় দুর্বাসাকে সেবা করে সন্তুষ্ট করে তাঁর কাছ হতে এই বর পেয়েছিলেন যে, যে দেবতাকে তিনি আহ্বান করবেন তিনি এসে তাঁর গর্ভে সন্তান উৎপাদন করবেন। পাণ্ডুর ইচ্ছায় কুন্তীর এই বিশেষ শক্তির সাহায্যে তাঁর গর্ভে এবং সপত্নীর গর্ভে পঞ্চপাণ্ডবের জন্ম হল। এইভাবে মন্ত্র বলে বিভিন্ন

দেবতাদের নিয়োগে পঞ্চপাণ্ডবের উৎপত্তি। ধর্ম হতে যুধিষ্ঠিরের বায়ু হতে ভীমের, ইন্দ্র হতে অর্জুনের মাতৃত্ব লাভ করলেন কুন্তী। পাণ্ডুর অনুরোধে মাদ্রীর গর্ভে অশ্বিভ্রাতৃদ্বয়ের সাহায্যে কুন্তী নকুল ও সহদেব নামে যমজ ভ্রাতৃদ্বয়ের জন্ম সংঘটিত করলেন।

নিয়োগপুত্র উৎপাদনের বিধি অবশ্য সেকালে ছিল। বিচিত্রবীর্যের পত্নীদের ক্ষেত্রে তা প্রয়োগ করা হয়েছিল। মনুস্মৃতিতে নিয়োগ বিধির বিস্তৃত আলোচনা আছে। (৩) সেখানে বলা হয়েছে যে সন্তান নষ্ট হলে বংশরক্ষার প্রয়োজনে দেবর বা সপিণ্ডের সাহায্যে স্বামীর অভাবে নারী সন্তান উৎপাদন করতে পারে। যে সন্তান উৎপাদিত হত তাকে মৃত পতির সন্তানই বিবেচনা করা হত। তাকে নিয়োগপুত্র বলা হত।

এই বিধানের ভিত্তি হল সেকালের একটি ধারণা যা বর্তমানে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ফলে অপ্রমাণিত হয়ে গেছে। সেকালে বিশ্বাস ছিল সন্তানের উৎপাদনে নারীর কোনও সক্রিয় ভূমিকা নাই। ভূমিতে বীজ পড়লে তা নিজেই অংকুরিত হয়, ভূমি বা ক্ষেত্র তাকে পুষ্টি দেয় মাত্র। এই দৃষ্টান্ত হতে অনুমান করা হত যে নারী যেন ক্ষেত্র এবং শুক্রকীট যেন বীজ; নারীর জরায়ু তাকে কেবল পুষ্টি দেয় মাত্র। সন্তানের উৎপাদনে নারীর কোনও সক্রিয় ভূমিকা থাকে না।

এই বিশ্বাসের ভিত্তি এই ধারণা যে পত্নী স্বামীর অধিকারে স্থাপিত একটি ক্ষেত্র স্বরূপ। কাজেই তার গর্ভে অন্য পুরুষের সাহায্যে উৎপাদিত সন্তান তার নিজের সন্তান। কোনও জমিতে বায়ু চালিত হয়ে বা পাখী দ্বারা আনীত হয়ে বীজ পড়ে যদি কোনও গাছ উৎপাদিত হয় তা জমির মালিকের গাছ বলে স্বীকৃত হয়ে থাকে। এইজন্য এই ভাবে উৎপাদিত সন্তানকে ক্ষেত্রজ সন্তানও বলা হয়ে থাকে। এই তত্ত্বের কথাও মনুতে উল্লেখ

৩। মনু সংহিতা। ৯। ৫৯

আছে। (৪) এই তত্ত্ব এখন ভ্রান্ত প্রমানিত হয়েছে। মানুষের উৎপাদক কোষে পুরুষ ও নারী উভয়েরই প্রদত্ত উপাদান থাকে। ঠিক বলতে কি পুরুষ একটি অর্দ্ধকোষ দেয় এবং নারী অপর অর্দ্ধকোষটি দেয়। নারীর কোষকে ডিম্বকোষ বলে এবং পুরুষের কোষকে শুক্রকীট বলে। উভয়ের মিলনে যে পূর্ণকোষটি উৎপাদিত হয় তাই জরায়ুতে স্থাপিত হয়ে ভ্রূণে পরিণত হয়। সুতরাং সন্তানের উৎপাদনে নারী ও পুরুষের সমান ভূমিকা। অতিরিক্ত ভাবে নারী জরায়ুতে পূর্ণকোষে আশ্রয় দিয়ে পুষ্ট করে মানব শিশুতে পরিণত করে। নারী শুধু ক্ষেত্র নয় সন্তানের উৎপাদিকাও বটে।

এই কাহিনীর অবাস্তবতার কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। এখন দেখা যেতে পারে, যে পরিবেশে পাণ্ডবদের জন্ম হয়েছিল সেখানে নিয়োগ পুত্র উৎপাদনের কোনও প্রয়োজনীয়তা ছিল কিনা। কুরুবংশের দুই ভ্রাতা, ধৃতরাষ্ট্র ও পান্ডু। অভিশাপের ফলে পান্ডু সন্তানলাভের সৌভাগ্য হতে বঞ্চিত হলেও ধৃতরাষ্ট্রের ত পিতৃত্বলাভের সম্ভাবনা অক্ষুণ্ণ ছিল। কাহিনী অনুসারে ভীমের জন্মের পূর্বেই ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রদের জন্ম হয়। এক্ষেত্রে বংশরক্ষার জন্য এতগুলি নিয়োগপুত্র উৎপাদনের প্রয়োজন ছিল না।

তৃতীয়ত দেখা যাবে মহৎ-গুণ-সম্পন্ন মানুষের উপর দেবত্ব আরোপ করার বিকল্প রীতিও সেকালে প্রয়োগ করা হত। সে রীতি কৃষ্ণের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়েছে। তাঁকে বিষ্ণুর অবতার রূপে স্থাপন করা হয়েছে। অনুরূপ ভাবে পাণ্ডব ভ্রাতাদের বিভিন্ন দেবতার অবতার রূপে স্থাপন করা যেত। এখানে কেন তা করা হল না বোঝা যায় না। অথচ দেখা যায় পাণ্ডবদেরও দ্বিতীয় পর্যায়ে রূপান্তর ঘটাবার সময় সেই ব্যবস্থা অবলম্বন করে বিভিন্ন দেবতার অবতার রূপে স্থাপন করা হয়েছে।

৪। মনু। ৯। ৩৩

দ্বিতীয় স্তরে নিকৃষ্ট চরিত্রগুলির উপর রাক্ষসত্ব আরোপ

এই সূত্রেই আমরা দ্বিতীয় পর্যায়ের পরিবর্তনের কথায় এসে পড়ি। আমরা দেখব এখানে পাণ্ডবদের বিরোধী চরিত্রগুলিকে নিকৃষ্ট শ্রেণীর সত্তার অবতার রূপে স্থাপন করা হয়েছে। এই রীতি পাণ্ডবদের উপর দেবত্ব আরোপের জন্য যে রীতি প্রয়োগ করা হয়েছিল তা হতে স্বতন্ত্র। পাণ্ডবদের ক্ষেত্রে তাঁদের উপর বিভিন্ন দেবতার নিয়োগ পুত্রত্ব আরোপ করা হয়েছিল। এখানে বিভিন্ন চরিত্রগুলির উপর নিকৃষ্ট প্রকৃতির সত্তার অবতারত্ব আরোপ করা হয়েছে। তাই বলছিলাম এই রীতি পাণ্ডবদের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হল না কেন বোঝা যায় না।

আমরা দেখব এই দ্বিতীয় স্তরের রূপান্তর আরও ব্যাপক। তাতে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধকে একরকম দেবতা ও অসুরদের মধ্যে সংঘর্ষের পুনরাভিনয়ে রূপান্তরিত করার চেষ্টা হয়েছে। কাজেই দুর্যোধন-আদিকে যেমন রাক্ষস-আদির অবতাররূপে কল্পনা করা হয়েছে তেমন পাণ্ডবদেরও এই পর্যায়ে বিভিন্ন দেবতার অবতার-রূপে কল্পনা করা হয়েছে।

এই স্বতন্ত্র ব্যাখ্যাটি পাই আশ্রমবাসিক পর্বের ৩১ অধ্যায়ে। সেখানে স্বয়ং ব্যাস ব্যাখ্যাতা এবং গান্ধারী শ্রোতা। সেখানে ব্যাস বলছেন কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে যাঁরা ভূমিকা নিয়েছিলেন তাতে যেমন বিভিন্ন দেবতার অবতারগণ ছিলেন তেমন রাক্ষস প্রভৃতির অবতারগণও ছিলেন। মূলচরিত্রগুলির মধ্যে কে কার অবতার হয়ে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছিলেন তার একটি তালিকাও এখানে স্থাপন করা হয়েছে। বিশ্লেষণ করলে তা এই রকম দাঁড়ায়ঃ

ধৃতরাষ্ট্র ছিলেন গন্ধর্ব রাজের অবতার,
পাণ্ডু ছিলেন মরুদ্‌গণের অবতার,
যুধিষ্ঠির ছিলেন ধর্মের অবতার,

ভীম ছিলেন মরৎগণের অবতার,
অর্জুন ছিলেন নরঋষির অবতার,
নকুলও সহদেব ছিলেন অশ্বিভ্রাতৃদ্বয়ের অবতার,
হৃষিকেশ ছিলেন নারায়ণের অবতার,
ধৃষ্টদ্যুম্ন ছিলেন অগ্নির অবতার,
দ্রোণ ছিলেন বৃহস্পতির অবতার,
দুর্যোধন ছিলেন কলির অবতার,
শকুনি ছিলেন দ্বাপরের অবতার,
দুঃশাসনাদি ভ্রাতৃগণ ছিলেন রাক্ষসের অবতার।

সুতরাং আগের কাহিনীর সহিত এই কাহিনীর নানা বিষয়ে রীতিমত পার্থক্য এসে পড়ে। প্রথমত এখানে নিয়োগপুত্র উৎপাদনের আদৌ উল্লেখ নাই; বিভিন্ন পান্ডবকে বিভিন্ন দেবতা বা ঋষির অবতার রূপে কল্পনা করা হয়েছে। যুধিষ্ঠির ও নকুল এবং সহদেব সম্বন্ধে অবতারত্ব বা পিতৃত্ব সম্বন্ধে অনৈক্য নাই; কিন্তু ভীম ও অর্জুন সম্বন্ধে অনৈক্য দেখা যায়। প্রথম পর্যায়ের কাহিনীতে ভীমকে বায়ুর নিয়োগপুত্র বলা হয়েছে; এখানে তাঁকে মরৎগণের অবতার বলে বর্ণনা করা হয়েছে। অর্জুনের ক্ষেত্রেও রীতিমত পার্থক্য দেখা যায়। প্রথম পর্যায়ের কাহিনীতে তিনি দেবতাদের রাজা ইন্দ্রের নিয়োগপুত্র; কিন্তু এখানে তাঁকে এক ঋষির অবতাররূপে বর্ণনা করা হয়েছে। সেই ঋষির নাম নর। (৫) তাই কি মহাভারতের প্রতি পর্বের আরম্ভে যে নমস্ক্রিয়াসূচক শ্লোকটি স্থাপিত হয়েছে, তাতে 'নরের' প্রতিও নমস্কার নিবেদিত হয়েছে।

আরও দেখা যাবে কৌরবদের মধ্যে দুর্যোধন ব্যতীত তাঁর সকল ভ্রাতাদের রাক্ষসের অবতার বলে বর্ণনা করা হয়েছে। দুর্যোধনই বিরোধী চরিত্রগুলির নেতা। তাকে কলির অবতার বলে বর্ণনা করবার উদ্দেশ্য বোধ হয় কলিতে অধর্মই প্রাধান্য পায় বলে। তিনি

৫। নরঋষিং পার্থং ধনঞ্জয়ম্। আশ্রমবাসিক পর্ব।৩১।১১

মূর্তিমান ঈর্ষা, তিনি দুর্নীতি অবলম্বন করে অপরের ঐশ্বর্য হরণ করতে দ্বিধাবোধ করেন না। কিন্তু দুঃশাসন ব্যতীত অন্য ভ্রাতারা ত তাঁর আজ্ঞাবর্তী অনুচর মাত্র। তাঁদের এমন হীন করা হল কেন। অন্তত বিকর্ণ ত তাঁদের মধ্যে নিজেকে ন্যায়ানুবর্তী রূপে আচরণ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করেছেন। সভায় যখন দুঃশাসন দ্রৌপদীকে লাঞ্ছিত করছিলেন তিনিই একমাত্র ব্যক্তি যিনি তার প্রতিবাদ করেছিলেন। তাঁকে রাক্ষসের অবতার বলে চিহ্নিত করা যুক্তিদ্বারা সমর্থন করা যায় না।

এক্ষেত্রে কিন্দব মুনির অভিশাপ কাহিনী এবং তার ফলে পাণ্ডুর বাধ্য হয়ে বিভিন্ন দেবতার আনুকূল্যে নিয়োগপুত্র উৎপাদনের কাহিনীর ভিত্তি বেশ আলগা হয়ে পড়ে। মহাভারতের মধ্যেই দুই পরস্পর বিরোধী কাহিনী পাওয়া যায়। অতিরিক্ত ভাবে এই কাহিনীর বাস্তবতা আলোচনা প্রসঙ্গে তার প্রতিকূল দুটি যুক্তি ইতিপূর্বে উপরে স্থাপন করা হয়েছে। প্রথমত, কাহিনীটি নিতান্তই অপ্রাকৃত এবং অবাস্তব; দ্বিতীয়ত, বংশরক্ষার জন্য নিয়োগপুত্রের কোনও প্রয়োজন ছিল না। তৃতীয়ত, দেখা গেল মহাভারতের মধ্যেই এই কাহিনীর ভিন্ন ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। আশ্রমবাসিক পর্বে স্থাপিত ব্যাখ্যাটিতে নিয়োগপুত্রের আদৌ উল্লেখ নাই। এক্ষেত্রে আদিপর্বে স্থাপিত কিন্দব মুনির অভিশাপের ফলে নিয়োগপুত্র উৎপাদনের ব্যবস্থার কাহিনীকে কল্পিত বলে ধরে নেওয়া বেশী যুক্তিসম্মত।

মনে হয় নিয়োগপুত্র উৎপাদনের কাহিনী মূল কাহিনীর সহিত পরবর্তীকালে সংযোজন করা হয়েছে। সম্ভবত পাণ্ডু অতিশয় মৃগয়া আসক্ত ছিলেন বলে পত্নীদ্বয় সহ বনে বাস করতেন। সেখানেই তাঁর পুত্রদের জন্ম হয়েছিল। সুতরাং কিন্দব মুনির অভিশাপে মাদ্রীর প্রতি কামাসক্ত হয়ে পাণ্ডুর অকাল মৃত্যুর কাহিনীও গ্রহণ করা যায় না। সম্ভবত মাদ্রীর সহিত ভ্রমণরত অবস্থায় আকস্মিক দুর্ঘটনায় তাঁদের মৃত্যু হয়। বৈদিক যুগে

সহমরণের প্রথা প্রচলিত ছিল বলেও ত মনে হয় না। বরং ঋগ্-বেদের একটি সূক্তে পাই মৃতভর্তৃকা নারীকে স্বামীর সমাধি স্থান ত্যাগ করে সংসারে প্রত্যাবর্তন করতে উপদেশ দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ সহমরণ রীতি নিন্দিত হয়েছে। (৬)

এই প্রসঙ্গে একটি বিষয় লক্ষ্য করা যেতে পারে। দুই পর্যায়ে যে এই কাহিনীটির পরিবর্তন ঘটান হয়েছিল তার পশ্চাতে দুটি ভিন্ন প্রকৃতির মনোভাব ক্রিয়া করেছিল। প্রথম পর্যায়ে পরিবর্তন ঘটান হয়েছিল পাণ্ডবদের প্রতি শ্রদ্ধা হেতু। দ্বিতীয় পর্যায়ের পরিবর্তনের দৃষ্টিভঙ্গি আরও ব্যাপক। যাঁরা শ্রদ্ধার পাত্র তাঁরা যেমন তার অন্তর্ভুক্ত যাঁরা শ্রদ্ধার পাত্র নন তাঁদেরও এই পরিবর্তনের অঙ্গীভূত করা হয়েছে। অপরপক্ষে যাঁদের প্রতি ঘৃণার উদ্রেক হয়েছিল তাঁদের দ্বাপর বা কলি বা রাক্ষসের অবতার বলে চিহ্নিত করা হয়েছে।

৬। ঋগ্‌বেদ। ১০। ১৮। ৮

নবম অধ্যায়

মহাভারতের সংযোজন পূর্ব আদিরূপ

১

আদিরূপ নির্ণয় কতখানি সম্ভব

এ পর্যন্ত আমরা মহাভারত সম্বন্ধে যে আলোচনা করেছি তার ভিত্তিতে কতকগুলি মৌলিক সিদ্ধান্ত করা যায়। আমরা জেনেছি মহাভারতের মূল ঘটনা বৈদিকযুগে সংঘটিত। তাকে ভিত্তি করে যে আদিগ্রন্থ রচিত হয় তাও বৈদিক যুগে রচিত। তা আকারে বড় ছিল না। তারপর মহাভারত শত শত বৎসর ধরে সংযোজন প্রক্রিয়ার সাহায্যে পরিবর্দ্ধিত হয়। অবশেষে খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে মহাভারত তার বর্তমান রূপ পায়। এই সুদীর্ঘকালের মধ্যে ভারতের ধর্মচিন্তা, দর্শনচিন্তা এবং সমাজ ব্যবস্থা পরিবর্তিত হয়ে যায়। এই পরিবর্তনের ফলে তিনটি স্তর পাওয়া যায়ঃ শ্রুতির যুগের স্তর, ধর্মশাস্ত্রের যুগের স্তর এবং ভক্তিবাদের যুগের স্তর।

এখন স্বভাবতই এই প্রশ্ন ওঠে মহাভারতের শ্রুতির যুগে রূপটি কেমন ছিল সে বিষয় কিছু ধারণা করা যায় কিনা। মনে হয়, যে সব তথ্য সংগৃহীত হয়েছে তার ভিত্তিতে মোটামুটি একটি ধারণা করে নেওয়া যায়। তবে কাজটি বেশ কঠিন। সংযোজিত অংশ এমন নিপুণ ভাবে মূলের সহিত জুড়ে দেওয়া হয়েছে যে সুস্পষ্ট ভাবে সর্বক্ষেত্রে তার শ্রুতির যুগের রূপকে সংযোজিত অংশ হতে পৃথক করা যায় না। কোথাও সম্পূর্ণ পর্ব সংযোজিত হয়েছে ; কোথাও বিশেষ পর্বের মধ্যে অধ্যায় আকারে সংযোজন স্থাপিত হয়েছে ; কোথাও বা মূল অংশের সঙ্গে কিছু নূতন অংশ জুড়ে দেওয়া হয়েছে। এ ক্ষেত্রে একটি অস্পষ্ট রূপের অতিরিক্ত কিছু পাওয়া সম্ভব বলে মনে হয় না।

যে তথ্যগুলি আমাদের কাজে বিশেষ সহায়তা করবে তাদের এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে। আমরা দেখেছি তার দীর্ঘকাল ব্যাপী বিকাশের ইতিহাসে মহাভারত তিনটি নামে পরিচিত ছিল। প্রথম নাম জয়। তাতে কুরুবংশের দুই শাখার স্বার্থের সংঘর্ষ এবং যুদ্ধে তার নিষ্পত্তির বর্ণনা ছিল। তারপর তার নাম হয় ভারত বা ভারতেতিহাস। তখন তাতে ভারতবংশের ইতিহাস সংযুক্ত হয়েছিল। শেষে পরিণত অবস্থায় তার নাম দেওয়া হয়েছিল মহাভারত। তার সেই অবস্থায় আকৃতির বিরাটত্বের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যই এই নাম। বলা হয়েছে তাতে অনেক মহৎগুণের পরিচায়ক কাহিনী আছে এবং পরিণামে তা ভারি হয়ে গেল বলে তার এই নূতন নাম রাখা হল। ভারি হবার মূল কারণ, তাতে শেষের অবস্থায় ব্যাপক হারে সংযোজন ঘটেছে। এই সংযোজন এসেছে দুই পর্যায়ে। প্রথমে ধর্মশাস্ত্রের যুগের প্রভাবে ব্যক্তিগত বা শ্রেণীগত আচরণবিধি হিসাবে আলোচনা এসেছে। তাকে অনুশাসন বলে। সমগ্র অনুশাসনপর্ব তার নিদর্শন। দ্বিতীয় পর্যায়ে ভক্তিবাদের যুগের প্রভাবে নানা কাহিনী সংযুক্ত হয়েছে। যেমন কিরাত ও অর্জুনের কাহিনী। এমন কি তার প্রভাবে পাণ্ডবদের জন্মকাহিনীও পরিবর্তিত হয়েছে।

এই প্রতিপাদ্যগুলির সমর্থন মহাভারতের অনুক্রমণিকা পর্বেই কিছু পাওয়া যায়। আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি যে শ্রুতির যুগেই মহাভারতের দুটি পৃথক নাম ছিল। প্রথম নাম জয়, দ্বিতীয় নাম ভারত। কাজেই শ্রুতির যুগের রূপ বলতে আমরা গ্রন্থটি যখন ভারত নামে পরিচিত ছিল সেই রূপটি আবিষ্কারের চেষ্টা করব। এ বিষয় অনুক্রমণিকাপর্বে বেশ তাৎপর্য পূর্ণ সূত্র মেলে। তাতে বলা হয়েছে ঃ

চতুর্বিংশতি সাহস্রীং চক্রে ভারতসংহিতাম্।
উপাখ্যানৈ র্বিনা তাবদ্ ভারতং প্রোচ্যতে বুধৈঃ ॥ (১)

১। আদিপর্ব। ১। ১০২-০৩

অর্থাৎ, (ব্যাস) উপাখ্যান বর্জন করে ভারত কথা রচনা করেন; তাতে চব্বিশ হাজার শ্লোক ছিল এবং তা ভারত নামে প্রচারিত হয়। তার সহিত সংযোজন প্রক্রিয়ার ফলে পূর্ণ বিকাশের পর যখন তা বর্তমান রূপ পায় এবং তার নাম পরিবর্তিত করে মহাভারত রাখা হয়, তখন তার শ্লোক সংখ্যা দাঁড়ায় এই সংখ্যার তিন গুণের উপর। সুখথাংকরের প্রস্তাবিত সংস্করণে তার শ্লোক সংখ্যা ৮২, ১৩৮।

এইভাবে যে বিপুল মাত্রায় সংযোজন ঘটেছে তার প্রকৃতি সম্বন্ধে পূর্বে আলোচনা হয়েছে। বর্তমান প্রসঙ্গে তার একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা দিলেই চলবে। মোটামুটি যে সব বিভিন্ন প্রকৃতির রচনা সংযোজিত হয়েছে তাদের এইভাবে কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়ঃ

১। নানা উপাখ্যানের সংযোজন।

২। নানা ধর্মশাস্ত্র অনুমোদিত আচরণবিধি বা অনুশাসনের সংযোজন।

৩। শ্রুতির পরবর্তী যুগে বিকশিত দর্শন, ধর্মবিশ্বাস প্রভৃতির সংযোজন।

৪। বিশেষ চরিত্রকে অবতার রূপে প্রতিষ্ঠিত করতে বা দেবতার আত্মজরূপে স্থাপিত করতে বা নিকৃষ্ট শ্রেণীর সত্তার অবতার রূপে স্থাপন করতে নানা কাহিনীর সংযোজন এবং মূলকাহিনীর পরিবর্তন।

৫। মিশ্র জাতীয় কাহিনী বা তথ্য বা চিন্তার সংযোজন।

এখন আমরা শ্রুতির যুগে মহাভারতের যে রূপটি ছিল সেটি আবিষ্কার করবার চেষ্টা করতে পারি। এখানে স্মরণ রাখতে হবে যে শ্রুতির যুগের মহাভারত একটি ছোট আদিরূপ হতে পরিবর্দ্ধিত হয়ে যে রূপ পায় তার নাম ছিল ভারত এবং অনুক্রমণিকা-পর্ব অনুসারে তার শ্লোক সংখ্যা ছিল চব্বিশ হাজার। সেই রূপটি আবিষ্কার করাই আমাদের লক্ষ্য।

আমাদের অবলম্বন হবে যে রীতিতে প্রত্নতাত্ত্বিক প্রাচীন কালের

সংস্কৃতিগুলির কাল নিরূপণ করেন তাই। তার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ এখানে দেবার প্রয়োজন আছে। প্রাগৈতিহাসিক যুগে বিকশিত বিভিন্ন সংস্কৃতির কাল নির্দেশ করতে প্রত্নতত্ত্বে একটি অনুরূপ সমস্যার উদ্ভব হয়। প্রাচীন কালে এক একটি বিশেষ স্থান আবাসভূমি হিসাবে প্রাচীন কালের মানুষের বিশেষ প্রিয় ছিল। ফলে প্রাগৈতিহাসিক যুগে বিভিন্ন কালের মানুষ সেখানে পর পর এসে বাস করে বিলুপ্ত হয়েছে। প্রতি গোষ্ঠী তাদের সংস্কৃতির নিদর্শন হিসাবে তাদের ব্যবহৃত বিভিন্ন ভোগ্যদ্রব্যের নিদর্শন সেখানে রেখেগেছে। কালক্রমে তার উপর ধুলা, আবর্জনা, পাতা প্রভৃতির আস্তরণ পড়ে সে নিদর্শন গুলি চাপা পড়ে গেছে। তার ফলে বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন গোষ্ঠীর সংস্কৃতির নিদর্শনগুলির উপর আস্তরণ পড়ে সেই স্থানটি একটি বড় ঢিপিতে পরিণত হয়। তার তলায় বিভিন্ন যুগের মানুষের ব্যবহৃত বস্তুর নিদর্শন এই স্তরগুলিতে সংরক্ষিত হয়ে থাকে।

দৈবাৎ যদি কোনও ঢিপি প্রত্নতাত্ত্বিকের নজরে পড়ে, তিনি তা খুঁড়ে বিভিন্ন যুগের মানবগোষ্ঠীর জীবনযাত্রারীতি সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করে নিতে পারেন। কোন স্তরে কোন নিদর্শন পাওয়া গেছে তা লক্ষ্য করে কোন সংস্কৃতি আগে গড়ে উঠেছিল, কোনটি পরে গড়ে উঠেছিল তা ঠিক করতে পারেন। যে নিদর্শনগুলি সবার নীচের স্তরে পাওয়া গিয়েছে সেগুলি প্রাচীনতম সংস্কৃতির পরিচয় দেয়। যেগুলি ঠিক তার উপরের স্তরে পাওয়া যাবে সেগুলি অব্যবহিত পরবর্তীকালের হবে।

আমরাও একটি অনুরূপ রীতি অবলম্বন করব। আমরা লক্ষ্য করেছি মহাভারতের রচনাকাল তিনটি স্বতন্ত্র যুগকে ব্যাপ্ত করে বিস্তৃত এবং সেই যুগগুলি বিভিন্ন চিন্তা, বিভিন্ন আদর্শ এবং বিভিন্ন আচরণ রীতি দ্বারা চিহ্নিত। সুতরাং বৈদিক যুগের লক্ষণগুলি যে রচনায় প্রতিফলিত তাকে আমরা ভারত নামে প্রচারিত গ্রন্থটির অঙ্গীভূত বলে ধরতে পারি এবং অন্য লক্ষণ

চিহ্নিত রচনাগুলি পরবর্তীকালের সংযোজন বলে ধরতে পারি। আমরা এখানে এই রীতি প্রয়োগ করবার প্রস্তাব করি। আমরা আঠারটি পর্বের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন অধ্যায়ে আলোচিত বিষয়গুলির উপর এই রীতি প্রয়োগ করে তাদের কোন অংশগুলি ধর্মশাস্ত্রের যুগের এবং কোন অংশগুলি ভক্তিবাদের যুগের লক্ষণ দ্বারা চিহ্নিত তা দেখতে পারি। সেগুলি পরবর্তীকালের সংযোজন বলে প্রমাণিত হবে। বাকি অংশ যা থাকবে তাকেই শ্রুতির যুগে মহাভারতের যে রূপ ছিল তার অঙ্গ বলে গ্রহণ করতে পারি।

২

বিভিন্ন পর্বের সংযোজিত অংশ

মহাভারতের আদি পর্বের আরম্ভই সংযোজন দিয়ে। তবে তার প্রথম দুটি (উপ) পর্ব অনুক্রমণিকা ও পর্বসংগ্রহ পর্ব নিতান্ত আবশ্যকীয় সংযোজন। বর্তমানকালে যে সব পুস্তক প্রকাশিত হয় তাদের মূল অংশের অতিরিক্ত দুটি সংযোজন প্রারম্ভে স্থাপন করা হয়ঃ ভূমিকা ও সূচীপত্র। এখানে অনুক্রমণিকা পর্ব ভূমিকার স্থান অধিকার করেছে এবং পর্বসংগ্রহ পর্ব সূচীপত্র স্বরূপ। তাদের আলোচ্য বিষয় পরীক্ষা করলে তাদের এই প্রকৃতি হৃদয়ঙ্গম হবে। অনুক্রমণিকায় মহাভারত কেমন ভাবে সংযোজনের সাহায্যে বিরাট হয়ে উঠল তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হয়েছে। মহাভারতের মুখ্য আলোচ্য বিষয় যে যুধিষ্ঠির ও দুর্যোধনের রাজ্যের অধিকার নিয়ে সংঘর্ষ তার উল্লেখ সেখানে আছে। এই সংঘর্ষ যে ন্যায়-সঙ্গত অধিকারের সঙ্গে ঈর্ষার তা এখানে পরিস্ফুট করা হয়েছে। মহাভারত যে নানা মহৎ চরিত্র গুণে সমৃদ্ধ এবং সেই কারণে উত্তর কালে সাহিত্যিকদের উপজীব্য হবে তারও উল্লেখ আছে। তাই বলা যেতে পারে এই সংযোজন ভূমিকার স্থান অধিকার করায় একান্তই আবশ্যিক।

পর্বসংগ্রহ পর্বকে আমরা বিস্তারিত সূচীপত্র বলতে পারি।

তাতে মহাভারতের আলোচ্য বিষয় কি ভাবে বিন্যস্ত তার পরিচয় দেওয়া আছে। তাতে যে আঠারটি পর্ব এবং একশতটি (উপ) পর্ব আছে, তার উল্লেখ আছে। সুতরাং তাও এই গ্রন্থের আবশ্যিক অংশ।

তার অতিরিক্ত আরও কতকগুলি সংযোজন আদিপর্বের প্রথম অংশেই আছে। যেমন আস্তীকপর্ব এবং পৌলমপর্ব। যে পরিবেশে মহাভারতের কাহিনী স্থাপিত হয়েছে তার ভিত্তি হিসাবেই আস্তীকের কাহিনী এসেছে। রামায়ণের মত মহাভারতের কাহিনী সোজাসুজি পাঠকের নিকট স্থাপিত হয়নি; তা অন্যের মুখে স্থাপিত হয়েছে। একবার ব্যাস তা বলেছেন জন্মেজয়ের সর্পযজ্ঞে। দ্বিতীয়বার সৌতি তা বলেছেন সৌনকের দ্বাদশবার্ষিক সত্র উপলক্ষ্যে নৈমিষারণ্যে। সেই প্রসঙ্গেই আস্তীকপর্ব এসে পড়ে। উপরিচরের কাহিনী ও সংযোজন। তার উদ্দেশ্য পুরুবংশের রাজা শান্তনুর পত্নী সত্যবতী যে প্রকৃতপক্ষে দাশরাজের কন্যা নয় তাই প্রমাণ করা।

প্রকৃত কাহিনী আরম্ভ হয়েছে আদিপর্বের ৬৭তম অধ্যায়ে দুষ্মন্তের কাহিনী দিয়ে। এইখানেই ভারতবংশের কাহিনীর সূত্রপাত; কারণ দুষ্মন্ত পুত্র ভরত তার স্থাপয়িতা। তারপর কাহিনী ধারাবাহিক বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং এরপর যা পাই তা প্রধানত ভারতেতিহাসের অংশ ছিল।

তারপর সভাপর্বে আসতে পারি। তার আরম্ভ হয়েছে ইন্দ্রের সভার বর্ণনা দিয়ে। ইন্দ্রের রাজধানী অমরাবতী এবং তাঁর সভার বাস্তব অস্তিত্ব শ্রুতির যুগে কল্পিত হয় নি। তখন তিনি অন্তরীক্ষস্থানের দেবতা। কাজেই তা সংযোজন তার পরের অংশগুলি মূলকাহিনীর অংশ বলে গ্রহণ করা যায়। কাজেই তাদের ভারতেতিহাসের অন্তর্ভুক্ত করা যায়।

তারপর আসে বনপর্ব। তা শান্তিপর্বের পরেই সব থেকে বিরাট পর্ব। সুখথাংকরের হিসাব অনুসারে তার অধ্যায় সংখ্যা

২৬৯ এবং শ্লোক সংখ্যা ১১,৬৬৪। তাতে একবৎসর অজ্ঞাতবাস বাদে দীর্ঘ এগার বৎসরের বনপর্বের কাহিনী আছে। তার অনেক অংশ যে পরবর্তী কালের সংযোজন তা বেশ বোঝা যায়। এতে যে সংযোজনগুলি আছে তাদের দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। প্রথম আসে একশ্রেণীর উপাখ্যান যার বর্ণিত বিষয় শ্রুতির যুগে কল্পনীয় নয়। এই প্রসঙ্গে কার্তিকের জন্মকাহিনী উল্লেখ করা যেতে পারে। তা প্রাসঙ্গিকও নয় এবং নিতান্তই পুরাণের যুগের কাহিনী। বৈদিক যুগে যে রুদ্র বা নীলকণ্ঠের উল্লেখ পাই তাঁর সহিত পার্বতীর সহিত সংযুক্তরূপে শিবের সংযোগ নাই। এটি স্পষ্টই পরবর্তী কালের সংযোজন।

অপরপক্ষে এমন কতকগুলি আখ্যায়িকা আছে যা বৈদিক যুগের পরিবেশের সহিত সঙ্গতি রক্ষা করে। সেগুলিকে শ্রুতির যুগের সংযোজন বলে ধরতে পারি। সম্ভবত ভারত নামে যখন তা প্রচারিত ছিল তখন তারা গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই তালিকায় পড়বে সাবিত্রী ও সত্যবানের কাহিনীটি এবং রামোপাখ্যান। সুখথাংকর রামোপাখ্যানের মধ্যে মূল রামায়ণ হতে বহু উদ্ধৃতি আবিষ্কার করেছেন। নল ও দময়ন্তীর কাহিনীও এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু তার পরিবেশ বৈদিক যুগের পরিবেশের সহিত সঙ্গতি রক্ষা করে না বলে তাকে পরবর্তী কালের সংযোজন বলে ধরতে হবে।

দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়ে পাণ্ডবদের জীবনের অঙ্গীভূত সেই সব কাহিনী যাদের মধ্যে বৈদিক যুগের পরিবেশ লক্ষ্য করা যায় না। যেমন কিরাতপর্ব এবং ইন্দ্রলোকাভিগমনপর্ব। এখানে শিব কৈলাসবাসী দেবতা রূপে এবং ইন্দ্র অমরাবতীবাসী দেবতাদের রাজা রূপে কল্পিত। এগুলি ভক্তিবাদের যুগের কল্পনা। সুতরাং এই শ্রেণীর কাহিনীগুলিকে পরবর্তী কালের সংযোজন রূপে গণনা করতে হবে। এই বন পর্বের শেষের দিকে এক বিরাট অংশ জুড়ে যক্ষবেশী ধর্মের যুধিষ্ঠিরকে পরীক্ষা করবার

কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। কাহিনীটি সুন্দর এবং নানা জ্ঞানগর্ভ বচনে সমৃদ্ধ। তবু তাকে ভারতেতিহাসের অন্তর্ভুক্ত বলে ধরা শক্ত হয়ে পড়ে। যদিও ধর্ম যজুর্বেদের দেবতারূপে কল্পিত হয়েছেন, সেখানে তিনি একটি বিমূর্ত ধারণারূপেই প্রকট হয়েছেন, ইন্দ্রাদির মত পৌরাণিক যুগের অমরাবতীবাসী দেবতায় রূপান্তরিত হননি। তাকে পরবর্তী কালের সংযোজন হিসাবে গণনা করাই যুক্তিযুক্ত হবে।

বিরাট পর্বটি ক্ষুদ্র। মাত্র ৬৭টি অধ্যায় এবং ২০৫০ শ্লোকে তা সম্পূর্ণ। (২) বর্ণনীয় বিষয়গুলি পরস্পর সংলগ্ন এবং মূলকাহিনীর মধ্যেই তা সীমাবদ্ধ। তাকে আমরা মহাভারতের শ্রুতির যুগে যে রূপ ছিল তার অঙ্গরূপে গ্রহণ করতে পারি।

তারপর পাই উদ্যোগপর্ব। বারো বৎসর ব্যাপী নির্বাসনে জীবনযাপনের অঙ্গীকার পালনের পর যুধিষ্ঠির যখন তাঁর রাজ্যের অংশ ফিরে পেতে চাইলেন, দুর্যোধন তা দিতে অস্বীকার করলেন তখন কৃষ্ণ এই বিবাদের আলোচনার পথে মীমাংসার যথাসাধ্য চেষ্টা করলেন। তা যখন ব্যর্থ হল তখন যুদ্ধের সাহায্যে তার মীমাংসা অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ল। আলোচনা ব্যর্থ হলে দুই পক্ষের যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি সুরু হল। তাই উদ্যোগপর্ব নাম। এ সবই মূল কাহিনীর অংশ এবং সেই কারণে বৈদিক যুগের অঙ্গ ছিল বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। তবে এই পর্বের শেষে স্থাপিত অম্বা-উপাখ্যান-পর্ব ঠিক প্রাসঙ্গিক হয় না। সম্ভবত তা পরবর্তীকালে সংযোজিত হয়েছিল।

এবার ভীষ্মপর্বে আশা যাক। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ আঠার দিন স্থায়ী হয়েছিল। কৌরব সৈন্যের সেনাপতি হিসাবে তিনি তার প্রথম দশদিন পাণ্ডব সৈন্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করেছিলেন। তার বিবরণ এই পর্বের উপজীব্য। তাই তার নাম

২। এখানে অধ্যায় সংখ্যা ও শ্লোক সংখ্যার যা হিসাব দেওয়া হবে তা ডঃ সুখথাংকরের হিসাব মতে।

ভীষ্মপর্ব। তা মূলকাহিনীর কেন্দ্রীভূত অঙ্গ। সুতরাং তাকে ভারতেতিহাসের অঙ্গীভূত বলে গণনা করা উচিত। বরং বলা যায় তা মহাভারতের প্রথম আবির্ভাবে যখন তার 'জয়' নাম ছিল তারই অঙ্গ ছিল।

কিন্তু তা সত্বেও তার মধ্যে কিছু সংযোজন ঘটেছে বলে মনে হয়। এই পর্বের আরম্ভে তার অন্তর্ভুক্ত দুটি (উপ) পর্ব পাই ঃ জম্বুদ্বীপ পর্ব ও ভূমিপর্ব। তাদের আলোচ্য বিষয় হল প্রাচীন ভারতের ভৌগলিক বিবরণ। যে পর্ব কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের বর্ণনায় নিবেদিত, তার সঙ্গে এই বিবরণের কোনও সম্বন্ধ নাই ; তা অপ্রাসঙ্গিক। সুতরাং অনায়াসে ধরে নেওয়া যায় এটি পরবর্তী-কালের সংযোজন। আমরা দেখব মহাভারতের সঙ্গে নানা তথ্য সংযুক্ত করে তাকে আনুষঙ্গিক ভাবে একটি বিশ্বকোষের রূপ দেবার প্রচেষ্টা হয়েছিল। সম্ভবত এই দুটি সংযোজনেরও তাই প্রেরণা।

তাদের অব্যবহিত পরে ভগবদ্‌গীতা (উপ) পর্ব এই ভীষ্ম-পর্বেই স্থাপিত হয়েছে। তা যে একটি অত্যন্ত মূল্যবান ধর্ম ও দর্শন বিষয়ক রচনা তা অনস্বীকার্য। ঠিক বলতে কি মহাভারতের মহত্ত্বের অন্যতম মূলকারণ হল এই অমূল্য রচনাটি তার অঙ্গীভূত। এই কারণে তা পৃথকভাবে আলোচিত হবার অধিকার রাখে। তাই পরবর্তী এক অধ্যায়ে তা পৃথকভাবে আলোচিত হবে। তবে বর্তমান প্রসঙ্গে বলতে হয় এই অংশটি ভক্তিবাদের যুগের সংযোজন নয়। শ্রুতির যুগে কৃষ্ণ ঐতিহাসিক মানুষ ছিলেন। কাজেই মহাভারতের শ্রুতির যুগের রূপের তা অঙ্গীভূত ছিল না।

সুতরাং আমাদের এই সিদ্ধান্ত হল যে ভীষ্মপর্বের অন্তর্ভুক্ত এই তিনটি (উপ) পর্ব শ্রুতির যুগের মহাভারতের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। ভীষ্মপর্বের মোট অধ্যায় সংখ্যা ১১৭। তাদের মধ্যে এই তিনটি (উপ) পর্ব ৪২টি অধ্যায় অধিকার করে আছে।

সুতরাং মহাভারতের এক তৃতীয় অংশই সংযোজন।

পরের চারটি পর্ব একসঙ্গে আলোচনা করা যেতে পারে। সেগুলি হল দ্রোণপর্ব, কর্ণপর্ব, শল্যপর্ব ও সৌপ্তিকপর্ব। এই পর্বগুলিতে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের শেষ আট দিনের ঘটনার বিবরণ দেওয়া হয়েছে। দ্রোণ, কর্ণ ও শল্যের নেতৃত্বে যে কয়দিন যুদ্ধ পরিচালিত হয়েছিল কাহিনীর সেই অংশগুলির বিবরণ তাঁদের নাম দ্বারা চিহ্নিত করে পৃথকভাবে স্থাপিত হয়েছে। সৌপ্তিক-পর্বে রাত্রে অশ্বত্থামা কর্তৃক পাণ্ডবদের শিবির আক্রমণের কাহিনী আছে। তিনি অতর্কিতে শিবিরে প্রবেশ করে ধৃষ্টদ্যুম্ন ও দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্রকে হত্যা করেছিলেন।

দ্রোণপর্ব ভীষ্মপর্ব হতে আকারে বড়, অথচ তাতে মাত্র চার দিনের যুদ্ধের বিবরণ আছে। তবে তা ঘটনাবহুল বলেই আকার বড় হয়েছে। তাতে অভিমন্যু বধ, জয়দ্রথ বধ ও ঘটোৎকচ বধের বিবরণ স্থান পেয়েছে। বাকি তিনটি পর্ব আকারে বেশ ছোট। তাদের বর্ণনীয় বিষয় কুরুক্ষেত্রের অষ্টাদশ-দিবসব্যাপী যুদ্ধের শেষ চারদিনের ঘটনা। তাদের মধ্যে অপ্রাসঙ্গিক বিষয় বিশেষ পাওয়া যায় না। সুতরাং তাদের মহাভারতের আদিরূপের অংশ বলে ধরে নেওয়া যায়।

তারপর আসে স্ত্রীপর্ব। তার অন্তর্ভুক্ত তিনটি (উপ) পর্বের বিষয় হল মৃত মানুষদের আত্মাদের জলপ্রদান, স্ত্রীবিলাপ এবং যুদ্ধে যাঁরা নিহত হয়েছেন তাঁদের শ্রাদ্ধ। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পরিণতি হয়েছিল সর্বাত্মক ধ্বংসে। সৌপ্তিক পর্বের নবম অধ্যায়ে পাই কৌরবদের পক্ষে মাত্র তিনজন জীবিত ছিলেন। কৃপ, শল্য এবং অশ্বত্থামা এবং পাণ্ডবদের পক্ষে জীবিত ছিলেন পঞ্চপাণ্ডব, কৃষ্ণ এবং সাত্যকি। তা হতে বোঝা যায় যুদ্ধের পরিণতি কতখানি ধ্বংসাত্মক হয়েছিল। সুতরাং শ্রাদ্ধ, জলদান, শোক সন্তপ্ত মহিলাদের বিলাপ—এগুলি তার আনুষঙ্গিক ঘটনা। সুতরাং আলোচ্য বিষয়গুলি প্রাসঙ্গিক। পর্বটিও আকারে

আছে। (১১) চতুর্দশ অধ্যায়ে শিব ও বিষ্ণুর মহিমা কীর্তনে ৪২৯টি শ্লোক নিবেদিত হয়েছে। সপ্তদশ অধ্যায়ে মহাদেবের সহস্র নামের উল্লেখ আছে। তারপর তিনটি অধ্যায় জুড়ে নারী জাতির নিন্দা আছে। (১২) এই প্রসঙ্গে মনুসংহিতার অনুসরণে অষ্টাবক্র মুনি বলেছেন 'নাস্তি স্ত্রীণাং স্বতন্ত্রতা'। তারপর আছে নানা তীর্থের তালিকা। (১৩) তারপর আছে চ্যবন ঋষির উপাখ্যান। (১৪) তারপর দান ধর্মের বিস্তারিত আলোচনা। (১৫) তারপর নানা বিধি সম্বন্ধে কিছু অনুশাসন আছে। অবশেষে বিষ্ণুর সহস্রনামের উল্লেখ করে পর্বটি সমাপ্ত হয়েছে।

সুতরাং অনুশাসনপর্বে পাই কিছু দার্শনিক আলোচনা, কিছু অনুশাসন প্রকৃতির বিধি, কিছু উপাখ্যান এবং কিছু ভক্তি প্রণোদিত রচনা। আলোচ্য বিষয়ের দিক হতে বিবেচনা করলে শান্তিপর্ব ও অনুশাসন পর্বের প্রকৃতি একই রূপ দাঁড়ায়। যে পরিবেশে তারা স্থাপিত হয়েছে তাও এক। তাই ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে অনুশাসন পর্বের আলোচ্য বিষয় শান্তিপর্বে স্থাপন করলে আপত্তির কোনও কারণ থাকত না। সুতরাং এই দুটি পর্বের আলোচনা এক সঙ্গে করা যেতে পারে।

এখন আমরা মূল প্রশ্নে ফিরে আসতে পারি। প্রশ্ন হল এই দুটি পর্বকে কি শ্রুতির যুগের মহাভারতের অঙ্গ হিসাবে গণনা করতে পারি? তার বিপক্ষে দুটি প্রবল যুক্তি পাওয়া যায়। প্রথমত যে পরিবেশে তারা স্থাপিত তা স্বাভাবিক পরিবেশ নয়। তা কষ্টকল্পিত। ভীষ্ম ইচ্ছামৃত্যুর শক্তি ধারণ করতেন ধরে নিলেও যে যন্ত্রণাদায়ক অবস্থায় তিনি শায়িত ছিলেন সে অবস্থায়

১১। অনুশাসন পর্ব। ১১-১২শ অধ্যায়

১২। ঐ। ১৯-২০শ অধ্যায় ৩৮ তম অধ্যায়

১৩। ঐ। ২৫ তম অধ্যায়

১৪। ঐ। ৫০-৫৫ তম অধ্যায়

১৫। ঐ। ৫৯-৮৬ তম অধ্যায়

আলোচ্য বিষয়গুলির আলোচনা সম্ভব হত না। দেহ যন্ত্রণামুক্ত না থাকলে এই শ্রেণীর গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করা সম্ভব নয়।

দ্বিতীয় যুক্তিও সমানই প্রবল। আলোচ্য বিষয়গুলির প্রকৃতি আলোচনা করলে লক্ষ্য করা যাবে সেগুলি শ্রুতির যুগে আলোচিত বিষয় নয়। কিছু দৃষ্টান্ত স্থাপন করা যেতে পারে। শিব ও বিষ্ণুর সহস্রনাম কীর্তনের উপযুক্ত পরিবেশ ভক্তিবাদের যুগ। শ্রুতির যুগে তারা ভক্তির পাত্র রূপে পরিকল্পিত হন নি। নারী নিন্দায় অনুশাসন পর্বে তিনটি অধ্যায় নিবেদিত হয়েছে। অথচ আমরা জানি শ্রুতির যুগে সমাজে নারী মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত ছিল। ঋগ্‌বেদে অনেক সূক্তের ঋষি মহিলা ছিলেন। ভৃগু কর্তৃক ব্যাখ্যাত সৃষ্টিতত্ত্ব সাংখ্য দর্শনের অনুসরণ করে। শ্রুতির যুগে সাংখ্য দর্শনের জন্ম হয় নি। সুতরাং অনায়াসে অনুমান করা যায় যে এই দুটি পর্বই শ্রুতির যুগের পরে সংযোজিত হয়েছে। কাজেই শ্রুতির যুগে যে ক্ষুদ্রতর আকারের মহাভারত ভারত নামে চিহ্নিত ছিল এই দুটি পর্ব তার অঙ্গীভূত ছিল না।

তারপর আসে অশ্বমেধ পর্ব। মূল আলোচ্য বিষয় যুধিষ্ঠিরের ইন্দ্রপ্রস্থে রাজপদে অধিষ্ঠিত হবার পর অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান। সেকালে কোনও রাজা যদি অসাধারণ ভাবে শক্তিশালী হতেন তা হলে অন্য রাজাদের নিকট তাঁর শ্রেষ্ঠতা স্বীকৃতি আদায়ের জন্য প্রাচীনকালে অশ্বমেধ যজ্ঞের ব্যবস্থা ছিল। পরবর্তীকালে এই পরিবেশে পরাক্রান্ত রাজা প্রতিদ্বন্দ্বী রাজাকে পরাস্ত করে তাঁর রাজ্যগ্রাস করে সাম্রাজ্য স্থাপন করে নিজের অহমিকার তৃপ্তি সাধন করতেন। সেকালে এ রীতি প্রচলিত ছিল না। কেবল প্রাধান্য স্বীকৃতির জন্যই এই যজ্ঞ। ঘোড়া ইচ্ছামত বিভিন্ন রাজ্যে প্রবেশ করত। যে রাজা বাধা দিতেন না তাঁর আচরণ হতে ধরে নেওয়া হত যে যিনি যজ্ঞ করছেন সেই রাজার সার্বভৌমত্ব তিনি স্বীকার করে নিলেন। যিনি ঘোড়াকে অবরুদ্ধ করতেন কেবল তাঁর সঙ্গেই যুদ্ধ হত। তিনি পরাস্ত হলে

সার্বভৌমত্ব স্বীকার করতে বাধ্য হতেন। এটি শ্রুতির যুগের একটি প্রচলিত রীতি।

সুতরাং এই অংশটি ভারতবংশের কাহিনীর সঙ্গে স্বাভাবিক ভাবে জড়িত হয়ে পড়ে। কাজেই অংশটিকে শ্রুতির যুগের মহাভারতের অঙ্গরূপে ধরে নেওয়া যেতে পারে। তবে মনে হয় তার মধ্যে একটি বিরাট অংশ সংযোজন আকারে এসেছে। এই সংযোজনের উপলক্ষ্যটি এই রকম। অশ্বমেধ যজ্ঞ সাফল্যের সহিত সম্পাদিত হয়েছে। কৃষ্ণ ঠিক করেছেন এইবার দ্বারকায় ফিরে যাবেন। তবে কিছুদিন হস্তিনাপুরে অপেক্ষা করছেন। এই সুযোগ নিয়ে অর্জুন তাকে ধর্ম ও দর্শন সম্বন্ধে কিছু উপদেশ দিতে অনুরোধ করলেন। কৃষ্ণ খুশি হয়ে সম্মতি দিলেন। এই সূত্রে শুরু হল অনুগীতাপর্ব। তার দুটি অংশ আছে। প্রথম অংশে ব্রাহ্মণী ও ব্রাহ্মণের প্রশ্ন উত্তরের মধ্য দিয়ে নানা তত্ত্বকথা স্থাপিত হয়েছে। কৃষ্ণ বলেছেন এই ব্রাহ্মণ কৃষ্ণের প্রতীক এবং ব্রাহ্মণী তার বুদ্ধির প্রতীক। (১৬) দ্বিতীয় পর্যায়ে ব্রহ্মার সহিত ঋষিদের কথোপকথনের মধ্য দিয়ে নানা তত্ত্বকথা স্থাপিত হয়েছে। এই দুটি পর্যায় নিয়ে অনুগীতা।

এখানে নানা তত্ত্বকথা আছে। এই তত্ত্বকথা অশ্বমেধ পর্বের ১৬শ হতে ৫১তম অধ্যায় পর্যন্ত বিস্তৃত। অর্থাৎ ৩৬টি অধ্যায় জুড়ে এই আলোচনা। এই পর্বের মোট অধ্যায় সংখ্যা ১৩৩। সুতরাং তার এক চতুর্থ অংশই সংযোজন রূপে এসেছে। তার নামকরণ হতে মনে হয় গীতারই অনুসরণে কিছু তত্ত্বকথা স্থাপনের উদ্দেশ্যেই এই সংযোজন। তা দেখায় কত ভিন্ন প্রকৃতির রচনাকে মহাভারতের খ্যাতি এবং প্রতিষ্ঠা পরবর্তীকালে আকর্ষণ করত।

তারপর আসে আশ্রমবাসিক পর্ব। ঘটনাটি যুধিষ্ঠিরের হস্তিনাপুরের রাজপদে অধিষ্ঠিত হবার পর। পুত্রশোকে কাতর বৃদ্ধ রাজা ধৃতরাষ্ট্র সংসার ত্যাগ করে বনে গিয়ে বাস করতে

১৬। অশ্বমেধ পর্ব। ৩৪। ১২

চাইলেন। গান্ধারী ও বিদুর তাঁর সহগামী হলেন। কুন্তীও প্রাসাদ ত্যাগ করে তাঁদের অনুগামিনী হলেন, পুত্রদের তাঁদের ত্যাগ না করবার জন্য অনুনয় মানলেন না। সেখানেই অগ্নিকাণ্ডে তাঁদের মৃত্যু ঘটেছিল। আলোচ্য বিষয় কাহিনীর ধারাবাহিকতার সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে। বার্দ্ধক্যে বাণপ্রস্থ অবলম্বন শ্রুতির যুগে প্রচলিত বর্ণাশ্রম ধর্মের অনুমোদিত। সুতরাং তাকে মহাভারতের প্রাচীনরূপের অঙ্গ বলে ধরে নেওয়া যায়।

এই পর্বে একটি দৃশ্য আছে যা তাকে ঐকান্তিকভাবে বাস্তবতা মণ্ডিত করে তুলেছে। ধৃতরাষ্ট্র তখন গান্ধারী, কুন্তী ও বিদুর সহ শতধূপ ঋষির আশ্রমে গিয়ে বাস করছিলেন। যুধিষ্ঠির সেই সময় একবার চার ভ্রাতা সহ সেখানে গিয়ে পিতৃব্য তথা মাতার সহিত দেখা করতে গিয়েছিলেন। এই কাহিনী—সবিস্তার বর্ণিত হয়েছে এই পর্বের পঞ্চবিংশ অধ্যায়ে। বর্ণনাটি যেমন বাস্তব তেমন হৃদয়গ্রাহী। একদিকে মাতার সহিত পুত্রদের মিলন, অপরদিকে আশ্রমবাসী ঋষিদের খ্যাতনামা পঞ্চপাণ্ডবের সহিত পরিচিত হবার আগ্রহ বর্ণনাটিতে সুন্দর ভাবে ফুটে উঠেছে।

সঞ্জয় তাঁদের সঙ্গে গিয়েছিলেন। শতধূপ ঋষির আশ্রমে উপস্থিত হবার পর আশ্রমবাসীরা তাঁদের সহিত পরিচিত হতে চাইলেন। তখন সঞ্জয় একে একে পঞ্চপাণ্ডবের সহিত তাঁদের পরিচয় করিয়ে দিলেন।' এই প্রসঙ্গে প্রতি পাণ্ডবের দৈহিক বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে এমন বিস্তারিত ও বাস্তব বর্ণনা আছে যে মনে হয় যেন তাঁদের চোখের সামনে দেখছি। সেখানে যুধিষ্ঠিরের পরিচয় দিতে বলা হয়েছে তাঁর 'গৌরতনু' 'পৃথুদীর্ঘ নেত্র'। অর্থাৎ তাঁর দেহ গৌরবর্ণ ছিল, এবং আয়ত বড় বড় চোখ ছিল। ভীম সম্বন্ধে বলা হয়েছে তাঁর রঙ তপ্ত কাঞ্চনের মত গৌর। আরও বলা হয়েছে তাঁর 'পৃথু আয়ত অংস' এবং 'পৃথু দীর্ঘবাহু'। অর্থাৎ তাঁর দুই স্কন্ধ বিশাল এবং বাহু দুটি দীর্ঘ এবং মোটা। অর্জুনের বর্ণনায় বলা হয়েছে 'শ্যামো যুবা, বারণ যূথাপচরঃ,

পদ্মায়ত চক্ষুঃ।' অর্থাৎ তাঁর দেহ শ্যামবর্ণ, হস্তিযূথের পতির মত তাঁর চলার ভঙ্গি এবং চক্ষু দুটি পদ্মের মত আয়ত। আর যমজ ভ্রাতৃদ্বয় সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে তারা এত সুন্দর, এত বলবান এবং এত ভদ্র যে এই তিন বিষয়ে কেহ তাঁদের সমকক্ষ ছিল না। (১৭)

তবে এই পর্বের সঙ্গেও কিছু সংযোজন ঘটেছে। এখানেই ব্যাসের মুখে কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধের একটি নূতন ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে যা বলে নানা দেবতা, গন্ধর্ব, রাক্ষস প্রভৃতির অবতারদের সঙ্গে এই যুদ্ধ। এ বিষয় পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। বোঝাই যায় এটি পরবর্তীকালের সংযোজন এবং পাণ্ডবদের বিভিন্ন দেবতার নিয়োগ পুত্র হবার যে কাহিনী আছে তার সহিত সঙ্গতি রক্ষা করে না।

বাকি থাকে মৌষল পর্ব-মহাপ্রস্থানিক পর্ব এবং স্বর্গারোহণ পর্ব। তিনটির আলোচনা এক সঙ্গে চলতে পারে। মৌষল পর্বে যদুবংশের ধ্বংস হবার কাহিনী সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে। তাকে হরিবংশের বীজ বলা যেতে পারে ; কারণ এই কাহিনীই সবিস্তারে সেখানে সমগ্র বংশের ইতিহাস সহ বর্ণিত হয়েছে। তার সঙ্গে মহাপ্রস্থানিক পর্ব অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত। পাণ্ডব সখা কৃষ্ণের পরলোক-গমনকে মূলকাহিনীর অংশ বলে বিবেচনা করা যায়। সুতরাং তা প্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ে। দ্বিতীয়ত তাঁর তিরোধান পাণ্ডবদের মহাপ্রস্থান করবার প্রেরণা জুগিয়ে থাকবে। কাজেই তাকে মহা-ভারতের প্রাচীন রূপের অংশ ধরা যায়। শ্রুতির যুগে বার্ধক্যে মানুষের বাণপ্রস্থ অবলম্বন করবার বা প্রব্রজিত হবার বিধি ছিল। সুতরাং পৌত্র পরীক্ষিতের হাতে রাজ্যভার সমর্পণ করে প্রব্রজিত হওয়া পাণ্ডবদের জীবনের স্বাভাবিক পরিণতি বলে ধরা যায়। সুতরাং তাও মহাভারতের প্রাচীন রূপের অঙ্গীভূত ছিল স্বীকার করে নেওয়া যায়।

১৭। সমোহস্তি যয়োর্ন রূপে ন বলে ন শীলে।

স্বর্গারোহণ পর্বের কথা কিন্তু স্বতন্ত্র। তাতে মহাপ্রস্থানকে স্বর্গারোহণের অভিযানে রূপান্তরিত করা হয়েছে। এই অভিযানে দ্রৌপদী সহ পাঁচ পান্ডব একসঙ্গে যাত্রা সুরু করেন এবং পথে যুধিষ্ঠির ভিন্ন অপর সকলের মৃত্যু হয়। কেবল যুধিষ্ঠির সশরীরে স্বর্গে প্রবেশ করবার অধিকার পান। এই কাহিনীর পশ্চাতে যে একটি উদ্দেশ্য নিহিত আছে তা সহজেই বোঝা যায়। এতে দেখাবার চেষ্টা হয়েছে যে নৈতিকগুণে যুধিষ্ঠির পান্ডবদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন বলেই তিনি সশরীরে স্বর্গে প্রবেশ করবার অধিকার পেয়েছিলেন এবং অন্যেরা সামান্য চরিত্রগত ত্রুটি হেতু সক্ষম হননি।

শুধু এই কারণেই বলা যেতে পারে যে এই পর্বটি পরবর্তী কালের সংযোজন। তার অতিরিক্ত একটি যুক্তিও মিলে যায় যা আরও বলবতী। আমরা জানি শ্রুতির যুগে দেবতাদের বাসভূমি রূপে হিমালয়ের অভ্যন্তরে কোনও স্বর্গ কল্পিত হয়নি। এই কল্পনা হিন্দুর চিন্তায় প্রবেশ করেছে পুরাণের যুগে। বৈদিক যুগের দেবতারা ছিলেন নানা প্রাকৃতিক শক্তি এবং তাঁদের বিচরণ-ক্ষেত্র ছিল ভূমি, অন্তরীক্ষ এবং আকাশ। এবিষয় পূর্বে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। সুতরাং স্বর্গারোহণ পর্ব পরবর্তী কালের সংযোজন।

প্রাচীনকালের শ্রুতির যুগের মহাভারতের সমাপ্তি ঘটেছিল মহা-প্রস্থানিক পর্বে, এই রকম ধরে নেওয়াই যুক্তিযুক্ত। আরও ধরে নিতে হবে মহাপ্রস্থান প্রব্রজনের সমস্থানীয়, তা স্বর্গারোহণের অভিযান নয়।

৩

মহাভারতের প্রাচীনরূপ

উপরের আলোচনায় লক্ষ্য করা যাবে যে কতকগুলি নীতি প্রয়োগ করে প্রতিপর্বের কোন অংশ প্রাচীন এবং কোন অংশ

পরবর্তী কালের সংযোজন, তা নির্ধারণ করবার চেষ্টা হয়েছে। এইভাবে গ্রহণ-বর্জনের ফলে পরিণতিতে অবস্থা কি দাঁড়ায় তা এখন দেখে নেওয়া যেতে পারে। মোটামুটি আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে কয়েকটি পর্ব পরবর্তী কালের সংযোজন এবং সেই কারণে সেগুলি মহাভারতের প্রাচীনরূপে তার সহিত যুক্ত ছিল না। এই পর্বগুলি হল শান্তিপর্ব, অনুশাসনপর্ব এবং স্বর্গারোহণপর্ব। অন্য পর্বগুলির মধ্যে অল্প-বিস্তর সংযোজিত অংশ আছে। সেই অংশগুলি যতখানি সম্ভব চিহ্নিত করা হয়েছে। সেই অংশগুলি বর্জন করে যা থাকে ধরতে হবে তাই প্রাচীন মহাভারতের অঙ্গীভূত ছিল।

এইখানে আমাদের একটি বিষয় পরিষ্কার করে নেওয়া দরকার। প্রশ্নটি হল মহাভারতের প্রাচীনরূপ বলতে আমরা কি বুঝব? এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা দরকার যে মহাভারতের প্রাচীন অংশটি বৈদিক যুগের পরিবেশে রচিত। সেই যুগে তার আদিরূপে যে নাম ছিল তা পরিবর্ধনের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে পরিবর্তিত হয়ে যায়। তার আদিরূপে নাম ছিল 'জয়'। তখন তার কাহিনী কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের প্রস্তুতি ও সমাপ্তির মধ্যে সীমিত ছিল। তখন তার শ্লোকসংখ্যা কত ছিল সে বিষয় মহাভারতের অনুক্রমণিকা পর্বে কোনও উল্লেখ নাই।

পরে তা পরিবর্দ্ধিত হয়। তার বিষয় তখন ভারতবংশের ইতিহাসের ক্ষেত্রে বিস্তারিত হয়। সেই পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে তার নাম রাখা হয় 'ভারত'। একথা অনুক্রমণিকা পর্বে উল্লিখিত হয়েছে। তখন তার শ্লোক সংখ্যা পরিবর্দ্ধিত হয়ে কত দাঁড়ায় তাও উল্লিখিত হয়েছে। বলা হয়েছে উপাখ্যান বর্জিত অবস্থায় তার শ্লোকসংখ্যা ছিল ২৪০০০। আরও বলা হয়েছে এই উপাখ্যান বর্জিত রূপের নাম ছিল ভারত। (১৮)

১৮। উপাখ্যানৈ র্বিনা তাবৎ ভারতং প্রোচ্যতে বুধৈঃ। মহাভারত ১।১।১০৩

এখন মহাভারতের প্রাচীনরূপ বলতে কি বুঝি সেই প্রশ্নের উত্তর দেবার জন্য আমরা প্রস্তুত হয়েছি। মহাভারতের প্রাচীনরূপ বলতে বুঝব 'জয়' নামে তার যে রূপ ছিল এবং 'ভারত' নামে যে রূপ ছিল উভয়কেই। কারণ, উভয়েরই কাহিনী ছিল বৈদিক যুগে সংঘটিত এক বিখ্যাত প্রাচীন রাজবংশের ইতিহাস। তার স্থাপক দুষ্মন্ত ও শকুন্তলার পুত্র ভরত। এই দুই রূপের পার্থক্য কেবল আলোচ্য বিষয়ের বিস্তৃতি নিয়ে। 'জয়' রূপে তার আলোচ্য বিষয় কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ সংক্রান্ত বিষয়ে সীমাবদ্ধ। 'ভারত' রূপে সে কাহিনী অতীতের দিকে বিস্তারিত হয়েছে। কাজেই জয়-অংশ পরবর্তীকালে রচিত ভারত-অংশের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে। অপর দিকে মনে রাখতে হবে জয়-অংশ প্রাচীনতর অংশ। সুতরাং তাকেই মহাভারতের শুরুতির যুগের রূপ বলে ধরতে হবে। অর্থাৎ 'ভারতকে' 'মহাভারতের', প্রাচীন রূপ ধরতে হবে।

এখন প্রশ্ন ওঠে মহাভারত আদিরূপে যখন 'জয়' নামে পরিচিত ছিল তখন তার শ্লোকসংখ্যা কত ছিল। এ বিষয় পি এল বৈদ্য একটি অভিমত দিয়েছেন। তিনি মহাভারত সম্বন্ধে একজন বিশেষজ্ঞ। পুণার ভান্ডারকর গবেষণা প্রতিষ্ঠান মহাভারতের যে নূতন সংকলন প্রকাশনে ব্রতী হন তার সম্পাদনা সুরু করেন ডি এস সুখথাংকর। এই কাজ সমাপ্ত হয় শ্রীবৈদ্যের তত্ত্বাবধানে। সুতরাং তাঁর মত বর্তমান ক্ষেত্রে বিশেষ মূল্যবান বলে বিবেচিত হতে পারে। তিনি এই অভিমত প্রকাশ করেছেন যে 'জয়' নামে পরিচিত মহাভারতের আদিরূপের শ্লোকসংখ্যা ছিল আট হাজার হতে দশ হাজারে সীমাবদ্ধ। (১৯)

কিন্তু এ বিষয় সঠিক কিছু বলা সম্ভব বলে মনে হয় না। মহাভারতের বর্তমান রূপে ভীষ্মপর্ব হতে স্ত্রীপর্বের মোট শ্লোক-

---

১৯। The Mahabharata—Its History and Character, P.L. Vaida, Cultural Heritage of India

সংখ্যা ২৪,০০০ এর মত আদিরূপ যদি এই পর্বগুলির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে তা হলেও তা দ্বিতীয়রূপ 'ভারতের' শ্লোক সংখ্যার প্রায় সমান হয়ে যায়। অথচ এদের মধ্যে অপ্রাসঙ্গিক অংশ একমাত্র ভীষ্মপর্ব ছাড়া অন্য পর্বগুলিতে বিশেষ লক্ষিত হয় না। তার চারটি উপপর্বের মধ্যে জম্বুদ্বীপ পর্ব, ভূমিপর্ব এবং গীতাপর্ব সংযোজিত অংশ। মোট ১৯৮টি অধ্যায়ের মধ্যে ৪২টি অধ্যায় নিয়ে এই সংযোজন। সুতরাং এক-পঞ্চমাংশ সংযোজন। সেক্ষেত্রে ভীষ্মপর্বের ৬০০০ শ্লোকের মধ্যে মাত্র ১২০০ শ্লোক বাদ পড়ে। তা হলেও মোট শ্লোকসংখ্যা দশ হাজারের অনেক বেশী হয়। তাই মনে হয় এবিষয় নিশ্চিত কোনও ধারণা করা যায় না। বড় জোর বলা যায় আদিরূপে শ্লোকসংখ্যা ২৪,০০০ এর অনেক কম ছিল।

দশম অধ্যায়

ভগবদ্‌ গীতা

১

প্রাথমিক কথা

বিরাট মহাভারতের মধ্যে অত্যন্ত নাটকীয় ভাবে গীতার স্থান করে দেওয়া হয়েছে। ভীষ্মপর্বে দেখি কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে পান্ডব ও কৌরব পক্ষের সৈন্যগণ ব্যূহ রচনা করে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে। এমন সময় অর্জুন তাঁর সখা ও সারথি কৃষ্ণকে অনুরোধ করলেন, দুই সৈন্যদলের মাঝখানে তাঁর রথ স্থাপন করা হক। রথ স্থাপিত হলে অর্জুন হৃদয়ঙ্গম করলেন যে যাঁদের সঙ্গে তিনি যুদ্ধ করতে যাচ্ছেন তাঁরা সকলেই নিকট আত্মীয় বা বন্ধু। ফলে মানসিক বেদনার প্রভাবে ক্ষত্রয়োচিত কর্তব্য সম্পাদন করতে অস্বীকার করে বলে বসলেন, আমি যুদ্ধ করব না, প্রতিপক্ষ আমাকে হত্যা করতে উদ্যত হলেও আমি অস্ত্রধারণ করব না। তখন যিনি স্বেচ্ছায় গ্রহণ করেছিলেন পার্থ সারথির ভূমিকা তখন তিনি ঘটনাচক্রে বাধ্য হলেন তাঁর গুরুর ভূমিকা গ্রহণ করতে। তখন কৃষ্ণ অর্জুনকে বিষাদ ত্যাগ করে ক্ষত্রিয়োচিত কর্তব্য সম্পাদনে প্রণোদিত করতে নানা উপদেশ দিলেন। তাঁর সেই উপদেশ বাণী নিয়েই গীতা।

এই প্রসঙ্গে কৃষ্ণ ও অর্জুনের কথোপকথনের ভিত্তিতে যে প্রজ্ঞাগর্ভ বাণীগুলি সঞ্চিত হল তাকে আশ্রয় করে ভীষ্মপর্বের মধ্যে একটি সমগ্র (উপ) পর্ব রচিত হয়েছে। তার বিস্তার ভীষ্মপর্বের পঞ্চবিংশ অধ্যায় হতে দ্বিচতুরিংশ অধ্যায় পর্যন্ত। পরিবেশ নাটকীয়; কিন্তু সম্ভাবনার দিক হতে বিচার করলে তা খুব সম্ভাব্য বলে মনে হয় না। এই আঠারটি অধ্যায় যদি মূল

মহাভারত হতে সরিয়ে দেওয়া হত, তা হলে কাহিনীর ধারাবাহিকতার আদৌ কোনও ভাবে ব্যাহত হত না।

স্পষ্টই বোঝা যায় একটি বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে গীতার আঠারটি অধ্যায় এখানে সংয়োজিত হয়েছে। সে উদ্দেশ্য হল ঐতিহাসিক পুরুষ কৃষ্ণকে বিষ্ণুর অবতাররূপে প্রতিপাদিত করা। কিন্তু অবতারবাদ ভারতে প্রবর্তিত হয়েছিল সম্ভবত খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকে। অথচ আমরা জানি মহাভারতে বর্ণিত কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল খৃষ্টপূর্ব দশম শতকে। তখন ছিল শ্রুতির যুগ। বাসুদেব কৃষ্ণের নাম ছান্দোগ্য উপনিষদে উল্লিখিত হয়েছে। সুতরাং ধরে নেওয়া যায় মহাভারতের মূল অংশ রচনার সময় কৃষ্ণ অবতার পদে উন্নীত হননি। কাজেই এই অংশ যে পরবর্তী কালের সংযোজন তা ধরে নিতে হয়।

এই প্রতিপাদ্যের সমর্থনে এমন অনেক তথ্য পাওয়া যায় যা এখানে স্থাপন করা যায়; কিন্তু তার প্রয়োজন নাই। কারণ, এ বিষয় পূর্বেই আলোচনা হয়েছে।

তবে সংযোজন রূপে পরবর্তীকালে গীতা মহাভারতের সহিত যুক্ত হয়েছে বলে যে গীতার মর্যাদার হানি হয়েছে, তা নয়। বরং তার মর্যাদা রীতিমত বর্দ্ধিত হয়েছে। বহুকাল ধরে সংযোজনের ফলেই মহাভারত মহৎকাব্যে রূপান্তরিত হয়েছে। কত সুন্দর আখ্যায়িকা তাকে অলঙ্কৃত করেছে। কত প্রজ্ঞাগর্ভ বচন তার গৌরব বর্দ্ধন করেছে। ফলে মহাভারত এক অনন্যসাধারণ গ্রন্থে রূপান্তরিত হয়েছে। বহু রত্ন তার ভান্ডারে শত শত বৎসর ধরে সঞ্চিত হয়েছে। তাদের মধ্যে গীতা হল কোহিনুর; বহু মণির মধ্যে তা উজ্জ্বলতম মণি। ঠিক বলতে তা অতুলনীয়। এমন প্রজ্ঞাবচন সমৃদ্ধ, কাব্যগুণে মন্ডিত অধ্যাত্ম সম্পদে ধনী গ্রন্থ দ্বিতীয়টি খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। সুতরাং মহাভারতের মত মহৎ কাব্যের শিরোমণির স্থানে অধিষ্ঠিত হয়ে গীতা উপযুক্ত পরিবেশেই স্থাপিত হয়েছে।

২

গীতার আলোচ্য বিষয়

কোনও রহস্যময় কারণে মহাভারতে ১৮ সংখ্যাটির প্রতি একটি তীব্র আকর্ষণ লক্ষ্য করা যায়। তাতে আঠারটি পর্ব আছে। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে দুই পক্ষ মিলিয়ে মোট আঠার অক্ষৌহিনী সৈন্য আঠার দিন ধরে আত্মঘাতী সংগ্রামে নিযুক্ত হয়েছিল। মনে হয় এই ১৮ সংখ্যাটির প্রভাব গীতার মধ্যেও সংক্রামিত হয়েছে। মহাভারতে আশ্রিত এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানিও অষ্টাদশ অধ্যায়ে বিন্যস্ত হয়েছে।

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'ধর্মতত্ত্ব' শীর্ষক গ্রন্থের ত্রয়োদশ অধ্যায়ে গীতার মূল উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি এই প্রসঙ্গে বলেছেন গীতার মূল উদ্দেশ্য হল ভক্তিতত্ত্ব ব্যাখ্যান। এই ভক্তি তত্ত্বের সঙ্গে জ্ঞান ও কর্মও জড়িত। এই তিনের সামঞ্জস্যের মধ্যেই গীতার উৎকর্ষ। এই ব্যাখ্যা ছড়িয়ে আছে দ্বিতীয় অধ্যায় হতে একাদশ অধ্যায়ে এবং তার উপসংহার মিলবে দ্বাদশ অধ্যায়ে। সুতরাং তাঁর বিবেচনায় গীতার সারাংশ দ্বাদশ অধ্যায়ে সীমিত। তার তাৎপর্য দাঁড়ায় বাকি ছয়টি অধ্যায়ের সঙ্গে মূল অংশের অঙ্গাঙ্গী সংযোগ নাই। তাঁর এই ধারণার সমর্থনে কিছু তথ্য পাওয়া যায়।

গীতার আলোচ্য বিষয়ের বিন্যাস লক্ষ্য করলে বোঝা যাবে যে বঙ্কিমচন্দ্রের এই মন্তব্য গীতার আভ্যন্তরীণ প্রমাণ দ্বারা সমর্থিত। এই প্রসঙ্গে আলোচিত বিষয়ে একটি সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণ আমাদের এই প্রতিপাদ্য কতখানি গ্রহণযোগ্য তা বোঝার সহায়তা করবে।

ইতিপূর্বে বলা হয়েছে যে গীতার আরম্ভ হয়েছে একটি নাটকীয় পরিস্থিতির মধ্যে। অর্জুনের সখা ও সারথি কৃষ্ণ যখন অর্জুনের অনুরোধে দুই পক্ষের বাহিনীর মাঝখানে তাঁর

রথ স্থাপন করলেন, তখন অর্জুন হৃদয়ঙ্গম করলেন যে যাঁদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে যাচ্ছেন তাঁরা একান্তই আপন জন। ফলে তাঁর মনে গভীর অনুকম্পার উদয় হল। তিনি বিষাদগ্রস্ত হয়ে বললের, আমি এঁদের সহিত যুদ্ধ করব না, সামান্য রাজ্য কেন ত্রৈলোক্যের আধিপত্যের জন্যও নয়; তঁারা হত্যা করলেও আমি যুদ্ধ করব না।

তখন কৃষ্ণ অর্জুনকে নানাভাবে তাঁকে এই সংকল্প পরিত্যাগ করার সপক্ষে নানা যুক্তি দেখালেন। দুর্যোধন তঁার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছেন বলেই যুদ্ধ। দ্বাদশ বৎসর নির্বাসন ভোগের পর তঁার রাজ্য প্রত্যর্পণ করবার কথা; কিন্তু তিনি বললেন যে বিনা যুদ্ধে সূচ্যগ্র পরিমাণ ভূমিও তিনি দেবেন না। এই পরিস্থিতিতে পাণ্ডবদের কর্তব্য হল ক্ষত্রিয় হিসাবে যুদ্ধ করে অধিকার আদায় করে নেওয়া। তা ধর্মযুদ্ধ এবং ক্ষত্রিয়ের অবশ্যপালনীয় কর্তব্য। অর্জুনের মনে যুদ্ধবর্জন সংকল্প পরিত্যাগের অনুকূল অবস্থা উৎপাদনের জন্য তিনি বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি হতে বিভিন্ন যুক্তি স্থাপন করলেন।

কৃষ্ণ প্রথম বললেন, আত্মা অমর; সুতরাং মৃত্যু বাস্তবে নাই। হন্তা ভাবে আমি মেরেছি, যে নিহত হয় সে ভাবে আমি মরছি। উভয়েই প্রকৃত সত্য কি তা জানে না। কেউ ত কাউকে মারে না। (১) কিন্তু সে যুক্তি বৃথা গেল।

তারপর তিনি বললেন মৃত্যু ত জীবনের অনিবার্য পরিণতি। যে জন্মায় সে ত মরবেই। কাজেই যুদ্ধের ফলে আত্মীয়ের মৃত্যু ঘটলে ক্ষতি কি? (২) কিন্তু তাতেও কোনও ফল হল না।

এবার তিনি অর্জুনের কর্তব্যবোধে আবেদন করলেন। বললেন, অর্জুন ক্ষত্রিয়, বর্তমান ক্ষেত্রে যুদ্ধ তাঁর অবশ্য পালনীয় কর্তব্য।

১। নায়ং হন্তি ন হন্যতে। গীতা। ২। ১২।

২। তস্মাদ পরিহার্যেঽর্থে ন ত্বং শোচিতুমর্হসি। গীতা ২। ২৭

হৃদয় দৌর্বল্য হেতু যুদ্ধ বর্জন করলে তিনি কর্তব্যভ্রষ্ট হবেন। (৩) কিন্তু অর্জুন সে আবেদনেও সাড়া দিলেন না।

তারপর ভিন্ন রকম আবেদন এল। কৃষ্ণ ভয় দেখালেন যুদ্ধ না করলে তিনি পাপে লিপ্ত হবেন, লোকে তাঁর নিন্দা করবে। (৪) কিন্তু তাতেও ফল হল না।

তখন নতুন করে আবেদন এল এক নতুন পথে। মানুষ বড় জটিল বিষয়। তার যেমন বুদ্ধিবৃত্তি আছে। তেমন হৃদয় বৃত্তি আছে। তার বুদ্ধিবৃত্তি যে কাজ ন্যায়সঙ্গত বিবেচনা করে করবার নির্দেশ দেয়, তার হৃদয় বৃত্তি তাতে বাধা দিয়ে বসে। দয়া, মায়া, মমতাবোধ কর্তব্য সম্পাদনে মনের পীড়া সৃষ্টি করে। এখানে অর্জুনের দিক হতে এই মমতা বোধই প্রকৃত বাধা। সুতরাং সেই বাধাকে অপসারণ করতে কামনা বর্জন করে নির্মম হয়ে কর্মফল সম্বন্ধে উদাসীন থেকে কর্তব্য সম্পাদন করতে উপদেশ দেওয়া হল। হৃদয়বৃত্তিকে নির্মূল করলে অপ্রিয় কর্তব্য সম্পাদনের দুঃখ বোধ হতে অব্যাহতি পাওয়া যায়। তার এই গুণ এই অভিনব নৈতিক তত্ত্বকে মহিমায় মণ্ডিত করেছে।

কিন্তু তাও যে অর্জুনকে তাঁর যুদ্ধ বর্জনের সংকল্প পরিত্যাগ করতে বাধ্য করেছিল তা মনে হয় না। মানুষের কর্তব্য কর্মেই কেবল অধিকার, ফলে নয় এবং নির্মম হয়ে কর্ম করতে হবে। এই তথ্যের ব্যাখ্যা শুরু হয়েছে গীতার দ্বিতীয় অধ্যায় হতে। তার সবিস্তার ব্যাখ্যা তৃতীয় অধ্যায়ে চলেছে। কিছু অতিরিক্ত সমর্থক যুক্তি ও ব্যাখ্যা পঞ্চম ও ষষ্ঠ অধ্যায়ে আছে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে দেখা যায় পার্থসারথি বেশি গুরুত্ব আরোপ করেছেন তাঁর নিজস্ব মৌলিক প্রকৃতির উপর। অর্থাৎ তিনি যে বিশ্বের নিয়ামক শক্তি এবং তিনি নিজে মানুষরূপে প্রকট হলেও তিনি বিশ্বস্রষ্টা এবং বিশ্বের নিয়ন্তা এই কথা নানা ভাবে বোঝাতে চেষ্টা করেছেন।

৩। ধর্মাদ্ধি যুদ্ধাচ্ছ্রেয়ো হন্যৎ ক্ষত্রিয়স্য ন বিদ্যতে। গীতা। ২। ৩১
৪। স্বধর্মং কীর্তিংচ হিত্বা পাপম বা পুর্মসি। গীতা। ২। ৩৩

এই পথেই শেষে তিনি অর্জুনের যুদ্ধ বর্জনের সংকল্পের পরিবর্তন ঘটাতে পেরেছিলেন।

এই প্রসঙ্গে কিছু দৃষ্টান্ত স্থাপন করা যেতে পারে। তৃতীয় অধ্যায়ে কৃষ্ণ অর্জুনকে বলছেন, তাঁর উপর কর্মফল ন্যস্ত করে মনে কোনও বাসনা পোষণ না করে নির্মম হয়ে এবং মনে কোনও আশা পোষণ না করে যুদ্ধ করতে হবে। (৫) চতুর্থ অধ্যায়ে তিনি সোজা বলছেন, তিনিই ঈশ্বর ও দুষ্কৃতকারীদের দমনের জন্য তিনি যুগে যুগে অবতার রূপে জন্মগ্রহণ করেন। (৬) ষষ্ঠ অধ্যায়ে যে বিশেষ যোগের কথা বলা হয়েছে তার স্বার্থকতা হল তার সাহায্যে কৃষ্ণের প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যাবে। বলা হয়েছে এই যোগ প্রক্রিয়ার সাহায্যে যে যোগী উপলব্ধি করেন যে কৃষ্ণই সকল জীবকে পরিব্যাপ্ত করে তাদের একত্ব-মণ্ডিত্ব করেন, তিনিই কৃষ্ণকে যথার্থ উপলব্ধি করেছেন। (৭) সপ্তম অধ্যায় যোগযুক্ত নয়নে কৃষ্ণ কিরূপ দেখান তার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে সেই নয়নে যোগী দেখবেন কৃষ্ণই বিশ্বের প্রভাব এবং বিনয়ে আশ্রয়। (৮) সবই সূত্রে মণি যেমন গ্রথিত থাকে তেমন তাঁর মধ্যে আশ্রিত। (৯) কৃষ্ণ জলের রস, চন্দ্রের প্রভা, বেদের প্রণব, পৃথিবীর গন্ধ, অগ্নির তেজ ইত্যাদি।

এখানে অতিরিক্ত ভাবে বলাহয়েছে যে কৃষ্ণের যিনি ভক্ত তিনিই শ্রেষ্ঠ ভক্ত। (১০) এই প্রসঙ্গে ভক্তের বিভিন্ন প্রকার সম্বন্ধে একটি সুন্দর বিশ্লেষণ পাওয়া যায়। ভক্তদের চারটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে ঃ আর্ত, অর্থার্থী, জিজ্ঞাসু ও জ্ঞানীভক্ত। আর্ত ও অর্থার্থী

৬। পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্‌ ধর্মসংস্থাপনার্থায়
সম্ভবামি যুগে যুগে ॥ গীতা। ৪। ৮

৭। সর্বভূত স্থিতং যো মাং ভজত্যেকত্বমাস্থিত ঃ।
সর্বথা বর্তমানোহপি স যোগী ময়ি বর্ততে ॥ গীতা। ৬। ৩১

৮। অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা। গীতা ৭। ৬

৯। ময়ি সর্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণাইব ॥ গীতা। ৭। ৭

১০। তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত এক ভক্তির্বিশিষ্যতে। গীতা। ৭। ১৭

নিকৃষ্ট শ্রেণীর ভক্ত। তারা কেবল ব্যবহারিক প্রয়োজনে ঈশ্বরকে স্মরণ করেন। বিপদ হতে ত্রাণের জন্য যে ঈশ্বরকে স্মরণ করে সে আর্ত। যে ভক্ত সুখেই আছে কিন্তু বিশেষ আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য ঈশ্বরের কৃপা প্রার্থনা করে সে অর্থার্থী। যার কোনও ব্যবহারিক প্রয়োজন নেই, কেবল ঈশ্বরের প্রকৃতি সম্বন্ধে জ্ঞান পিপাসা চরিতার্থ করতে চায় সে জিজ্ঞাসু ভক্ত। বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক এই শ্রেণীতে পড়বে। আর শ্রেষ্ঠ ভক্ত হল যে কৃষ্ণকে একনিষ্ঠ ভাবে অহৈতুক ভক্তি করে। (১১)

এইভাবে ধীরে ধীরে আত্মপ্রকৃতির উন্মোচনের ফলে কৃষ্ণের অবতারত্ব সম্বন্ধে অর্জুনের কৌতূহলের উদ্রেক হল। এখন তিনি নিবিষ্ট শ্রোতা। কৃষ্ণ বক্তা এবং ব্যাখ্যাতা। এই ভাবে আমরা নবম অধ্যায়ে এসে পড়লাম। এখানেও কৃষ্ণ নিজের পরিচয় দিচ্ছেন। তিনি বলছেন, তিনি নানা জীবকে পোষণ করছেন কিন্তু তাদের মধ্যে অবস্থিত নন। (১২) তিনি দুঃখ করে বলেছেন তার স্বরূপ না জেনে তিনি মানবদেহ ধারণ করে আছেন বলে লোকে তাঁকে অবজ্ঞা করে। তিনি যে মহেশ্বর তা তারা বোঝে না। প্রাসঙ্গিক শ্লোকটি এখানে উল্লেখের দাবী রাখেঃ

অবজানন্তি মাং মূঢ়া। জনাঃ সুকৃতিনোহর্জুন।

পরং ভাবম জানন্তো মম ভূত মহেশ্বরম্। (১৩) অতএব তিনি অর্জুনকে উপদেশ দিচ্ছেন তাঁকে সর্বথা অবলম্বন করতে। তিনি বলছেন, তুমি আমাকে মন অর্পণ কর, আমার ভক্ত হও, আমার উপাসনা কর, আমাকে নমস্কার কর। (১৪) এইখানেই নবম অধ্যায়ের শেষ।

১১। চতুর্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোহর্জুন।
আর্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ।। গীতা ৭।১৬

১২। ভূতভৃন্ন চ ভূতস্থো মমাত্মা ভূতভাবনঃ। গীতা। ৯।৫

১৩। গীতা। ৯।১১

১৪। মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু। গীতা। ৯।৩৪

দশম অধ্যায়ে কৃষ্ণের নিজের মহিমার আরও পরিচয় দেওয়া হয়েছে। অর্জুন কৌতূহলী হয়ে কৃষ্ণের বিভূতির কথা জানতে চেয়েছেন। সেই সূত্রেই এই আত্মমহিমা প্রকাশ। তিনি বলছেন বিশ্বের বিভিন্ন প্রকার বস্তুর মধ্যে যেটি শ্রেষ্ঠ সেটিই তাঁর বিভূতি প্রকাশ করে। আদিত্যদের মধ্যে তিনি বিষ্ণু, জ্যোতিষ্কদের মধ্যে সূর্য,বেদগুলির মধ্যে সামবেদ, দেবতাদের মধ্যে ইন্দ্র, ইন্দ্রিয়গুলির মধ্যে মন ইত্যাদি।

এইভাবে আত্মপ্রকৃতির ক্রমশ উন্মোচনের ফলে একাদশ অধ্যায়ে দেখি অর্জুন বিশ্বাস করেছেন কৃষ্ণ প্রকৃতপক্ষে তাঁর সখা নন, তিনি স্বয়ং শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী বিষ্ণু এবং মানুষী তনুতে প্রকট বিষ্ণুর অবতার। সুতরাং অর্জুন তাঁর বিশ্বরূপ দর্শন করতে চাইলেন। চর্মচক্ষে সেরূপ দেখা যায় না ; তাই কৃষ্ণ তাঁকে দিব্য-চক্ষু দিলেন। তখন অর্জুন কৃষ্ণের যে রূপ দেখলেন তা যেমন সুন্দর তেমনি ভয়ঙ্কর। তিনি একাধারে স্রষ্টা ও সংহর্তা। এই ভাবে অর্জুনের মন চূড়ান্ত নির্দেশের জন্য প্রস্তুত হল।

মূল প্রশ্ন, যে যুদ্ধে আত্মীয় স্বজনকে হত্যা করতে হয় সে যুদ্ধ অর্জুন করবেন কিনা। তিনি ঠিক করেছিলেন যে যুদ্ধ করবেন না। কৃষ্ণের কর্তব্য এই ধর্মযুদ্ধে তাঁকে নিযুক্ত করা। অন্যভাবে তাঁর চেষ্টা সফল হয় নি। এবার তিনি যে যুক্তি প্রয়োগ করলেন তা অব্যর্থ হল। অর্জুনকে তিনি বললেন, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে যারা অধর্মের সমর্থক তাদের স্বয়ং সংহার করতে আবির্ভূত হয়েছেন। অর্জুন যুদ্ধে তাঁর কর্তব্য পালন না করলেও তাঁর আত্মীয়দের মৃত্যু অবধারিত। (১৫) অতএব তিনি অর্জুনকে নির্দেশ দিলেন ঃ হৃদয় বৈকল্য ত্যাগ করে যুদ্ধ কর ; যশলাভ কর।

১৫। কালোঽস্মি লোকক্ষয়কৃৎ প্রবৃদ্ধো
লোকান্ সমাহর্তুমিহ প্রবৃত্তঃ।
ঋতেঽপি ত্বাং ন ভবিষ্যন্তি সর্বে
যেঽবস্থিতাঃ প্রত্যনীকেষু যোধাঃ ॥ গীতা ১১।৩২

আমি ত এদের পূর্বেই নিহত করে রেখেছি ; তুমি নিমিত্ত মাত্র হও। (১৬)

এইখানে এই ভাবেই গীতার সমাপ্তি হয়ে যাওয়া উচিত ছিল। অর্জুন ধর্মযুদ্ধ করবেন কিনা এই প্রশ্ন নিয়ে গীতার আরম্ভ। আলোচনার ফলে তিনি সন্দেহাতীতভাবে জানলেন যে কৃষ্ণ তার সখামাত্র নয়, তিনি সর্বলোকেশ্বর এবং যাদের বিরুদ্ধে অর্জুন অস্ত্রধারণ করতে সংকোচ বোধ করছেন তাঁদের মৃত্যু অবধারিত। স্বয়ং ভগবানের নির্দেশ হল যুদ্ধ কর। তারপর আর নূতন প্রশ্নের অবকাশ থাকে কোথায়। তখনই অর্জুনের পূর্ব-সংকল্প ত্যাগ করে যুদ্ধ করবার প্রতিশ্রুতি দেওয়া উচিত ছিল ; কিন্তু আমরা দেখি সেই প্রতিশ্রুতি এল আরও সাতটি অধ্যায়ের শেষে যেখানে অর্জুন বলছেন ঃ

নষ্টো মোহঃ স্মৃতির্লব্ধা ত্বৎপ্রসাদান্ ময়াচ্যুত।
স্থিতোহস্মি গতসন্দেহঃ করিষ্যে বচনং তব ॥ (১৭)

অর্থাৎ, আমার মোহভঙ্গ হয়েছে, স্মৃতি ফিরে এসেছে আপনার প্রসাদে। আমার মন স্থির হয়েছে, সন্দেহ দূর হয়েছে। আপনার নির্দেশ আমি পালন করব।

একাদশ অধ্যায়ের পরে যে অধ্যায়গুলি পাই সেগুলি তাই মনে হয় গীতার প্রথম অংশের আলোচ্য বিষয়ের সহিত সঙ্গতি রক্ষা করে না। এই অধ্যায়গুলির আলোচ্য বিষয়ের সহিত পরিচিত হলে তা বেশ ভাল বোঝা যায়।

দ্বাদশ অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয় হল কোন শ্রেণীর ভক্ত শ্রেষ্ঠ। বিষয়টি সপ্তম অধ্যায়ে আগেই আলোচিত হয়েছে। সুতরাং নূতন করে তার আলোচনার প্রয়োজন ছিল না। বঙ্কিমচন্দ্রের অনুসরণে বোধ হয় বলা যায় গীতার মূল প্রতিপাদ্য দ্বাদশ নয় একাদশ

১৬। ময়ৈবৈতে নিহতা পূর্বমেব।
নিমিত্ত মাত্রং ভব সব্যসাচিন্ ॥ গীতা। ১১। ৩৩

১৭। গীতা। ১৮।

অধ্যায়েই প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। তার পরের অধ্যায়গুলির আলোচ্য বিষয় অনেক ক্ষেত্রে যে গুরুত্বপূর্ণ তা স্বীকার্য ; কিন্তু মূল প্রতিপাদ্যের সহিত সেগুলি যেন আলগা ভাবে সংযুক্ত করা হয়েছে।

ত্রয়োদশ অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয় গুরুত্বপূর্ণ। তাতে সমগ্র বিশ্বের একটি ব্যাখ্যা আছে। সেই ব্যাখ্যায় উপনিষদের ব্রহ্মবাদের সঙ্গে সাংখ্য দর্শনের প্রতিপাদিত পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের একটি সমন্বয় সাধনের চেষ্টা হয়েছে। বিষয় গৌরব থাকলেও তা বর্তমান আলোচনায় প্রাসঙ্গিক হবে না। পঞ্চদশ অধ্যায়ে এই প্রসঙ্গই পুনরায় আলোচিত হয়েছে।

চতুর্দশ অধ্যায়ে সত্ত্ব, রজঃ ও তম গুণের ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। সপ্তদশ ও অষ্টাদশ অধ্যায়ে তার আলোচনাই দীর্ঘায়িত হয়েছে। সেখানে জ্ঞান, আহার, যজ্ঞ, তপ, কাল, ত্যাগ কর্ম, কর্তা, বুদ্ধি, ধৃতি, ও সুখের সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ গুণের ভিত্তিতে তিনটি শ্রেণী বিশ্লেষণ করা হয়েছে। তারও মূল আলোচ্য বিষয়ের সহিত কোনও যুক্তিসম্মত সংযোগ লক্ষ্য করা যায় না। ষোড়শ অধ্যায়ে দৈবী সম্পদ ও আসুরী সম্পদের তালিকা দেওয়া হয়েছে। তাও খুব প্রাসঙ্গিক নয়।

এই সব দেখে মনে হয় যে দ্বাদশ অধ্যায় হতে অষ্টাদশ অধ্যায় সম্ভবত পরে সংযোজিত হয়েছিল। অর্থাৎ গীতারও সংযোজন ঘটেছিল। অষ্টাদশ অধ্যায়ের ৭৩ সংখ্যক শ্লোকটি যার শেষে আছে 'করিষ্যে বচনংতব' যদি একাদশ অধ্যায়ের শেষে বসত তা হলে এই সাতটি অতিরিক্ত অধ্যায়ের অনুপস্থিতি লক্ষিত হত না। সেখানেই অর্জুনের এই মন্তব্যটি আরও যুক্তিসম্মত হত। অষ্টাদশ অধ্যায়ের শেষে যে বাকি পাঁচটি শ্লোক আছে সেগুলিও অনায়াসে একাদশ অধ্যায়ের শেষে বসতে পারত। কারণ, তাদের আশ্রিত কথাগুলি সমাপ্তিসূচক কথা। সুতরাং বোঝা যায় যেন এই অতিরিক্ত অধ্যায়গুলি গীতার মধ্যে যেন আলগাভাবে স্থাপিত হয়েছে।

তাদের সঙ্গে প্রথম অংশের অঙ্গাঙ্গী সংযোগ ঘটেনি। একটি সুবিন্যস্ত অট্টালিকার সঙ্গে পরে একটি নূতন মহল সংযুক্ত হলে যে অবস্থা ঘটে এখানে যেন তাই ঘটেছে।

তবে এই শেষের অংশটি যে একেবারেই মূল্যহীন, তা বললে ভুল করা হবে। এই অংশের মধ্যে গীতার একটি সমন্বয়ী দৃষ্টি-ভঙ্গি লক্ষ্য করা যায়। এখানে উপনিষদের ব্রহ্মবাদের সহিত যেমন সাংখ্যাদর্শনের পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের সামঞ্জস্য স্থাপনের চেষ্টা হয়েছে, তেমন উপনিষদের ব্রহ্মবাদের সহিত পরবর্তীকালের ভক্তিবাদ এবং অবতারবাদেরও একটি সামঞ্জস্য স্হাপনের চেষ্টা করা হয়েছে। এইভাবে এই সাতটি অধ্যায়কে আশ্রয় করে গীতার মধ্যে একটি সমন্বয়ের দর্শন গড়ে উঠেছে। সেই দিক হতে এই অংশের একটি মূল্যবান তাৎপর্য আছে। সুতরাং আল্গাভাবে সংযুক্ত হলেও এই সংযোজন গীতার মর্যাদাহানি না করে পরিবর্দ্ধিত করেছে।

উপরে গীতায় কি কি বিষয় আলোচিত হয়েছে সামগ্রিকভাবে তার একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হয়েছে। তার ভিত্তিতে গীতায় কোন কোন অধ্যাত্মতত্ত্ব আলোচিত হয়েছে তার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ এখানে স্হাপন করা যেতে পারে।

এ বিষয় বিশিষ্ট দার্শনিক মধুসূদন সরস্বতী রচিত গ্রন্হ 'গূঢ়ার্থদীপিকা' নামে চিহ্নিত গীতারভাষ্যের আলোচনা প্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ে। তিনি অতি বিচক্ষণ মনীষী ছিলেন। তিনি বলেছেন, গীতায় তিনটি অধ্যাত্মতত্ত্ব আলোচিত হয়েছে। তার প্রথম ছয়টি অধ্যায়ে নিষ্কাম কর্মসাধনার আলোচনা আছে; সপ্তম হতে দ্বাদশ অধ্যায় ভক্তিতত্ত্বের আলোচনায় নিবেদিত; এবং শেষের ছয়টি অধ্যায়ে জ্ঞানতত্ত্বের কথা আলোচিত হয়েছে।

মনে হয় তার এই বিশ্লেষণ মোটামুটি মেনে নেওয়া যায়। গীতার প্রথম অধ্যায় কেবল গীতার পরিবেশটি রচনা করেছে এবং যে প্রশ্ন সমাধানের জন্য গীতা বিশেষ করে রচিত হয়েছে তা উত্থাপিত হয়েছে। অর্থাৎ প্রশ্ন উঠেছে, কর্তব্য কর্ম সম্পাদন করতে

গেলে অনেক ক্ষেত্রে অপ্রিয় কাজ করতে হয়; ফলে মন বিষাদগ্রস্ত হয়। এই সমস্যার সমাধান কি? আরও ছোট করে বলা যায়, কর্তব্য কর্ম সম্পাদনে হৃদয়বৃত্তির স্থান আছে কিনা। এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়েছে প্রধানত দ্বিতীয় হতে সপ্তম অধ্যায় জুড়ে। সুতরাং তা নিষ্কাম কর্মসাধনা তত্ত্বের আলোচনায় নিবেদিত। অর্থাৎ আমাদের প্রশ্নের উত্তরে এখানে বলা হয়েছে যে কর্তব্য সম্পাদনে হৃদয়বৃত্তির প্রভাব বর্জনীয়, কর্মফলে উদাসীন থাকতে হবে। ষষ্ঠ হতে একাদশ অধ্যায় কৃষ্ণের আত্মপরিচয় দানে নিবেদিত। লক্ষ্য করা যাবে ষষ্ঠ ও সপ্তম অধ্যায়ে একই সঙ্গে কর্মফল সন্ন্যাসতত্ত্বের ব্যাখ্যা এবং কৃষ্ণের অবতাররূপ স্থাপনের কাজে নিবেদিত। আত্মপরিচয় দানের পরিসমাপ্তি বিশ্বরূপ দর্শনে।

দ্বাদশ হতে অষ্টাদশ অধ্যায় জুড়ে যে আলোচনা আছে তাকে জ্ঞানতত্ত্ব বিষয়ক আলোচনা বলা যায়। কারণ, তাতে সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রয়োগের আলোচনা আছে এবং অতিরিক্ত ভাবে সমন্বয়ের পথে বিভিন্ন শ্রেণীর ভারতীয় দর্শনের মধ্যে একটি সমন্বয় স্থাপনের চেষ্টা তার মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। দ্বাদশ অধ্যায়ে প্রশ্ন উঠেছে অব্যক্ত অক্ষর সম্বন্ধে আলোচনা এবং কৃষ্ণভক্তি সম্বন্ধে আলোচনার মধ্যে কোনটির গুরুত্ব বেশী। উত্তরে কৃষ্ণ বলেছেন উভয় বিষয়ই কৃষ্ণের প্রিয়, তবে বলা হয়েছে যাঁরা তাঁকে ভক্তি করেন তাঁরা শ্রেষ্ঠযোগী আর যাঁরা অক্ষরকে আলোচনা করেন তাঁরা কৃষ্ণকেই পান। (১৮) 'রায় কোন পক্ষে গেল বলা শক্ত, তবে তা যে ভক্তিবাদের দিকে হেলেছে তা বোঝা যায়। সুতরাং দ্বাদশ অধ্যায়ে জ্ঞানমার্গ ও ভক্তিমার্গ উভয়ের আলোচনাই আছে। কাজেই মধুসূদন সরস্বতীর মন্তব্য আমরা গ্রহণ করতে পারি যে দ্বাদশ হতে অষ্টাদশ অধ্যায় পর্যন্ত জ্ঞানতত্ত্বের বিষয় আলোচনা আছে।

১৮। এই প্রসঙ্গে গীতা দ্বাদশ অধ্যায় ২—৪ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

এখন গীতায় কোন কোন তত্ত্বের বিষয় আলোচনা আছে সে বিষয় আমরা একটা ধারণা করে নিতে পারি। উপরের বিশ্লেষণ হতে বোঝা যায় গীতায় তিনটি মূল তত্ত্বের বিষয় আলোচনা আছেঃ (১) ইচ্ছা প্রণোদিত কর্ম কি দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারা পরিচালিত হবে; (২) কৃষ্ণের প্রকৃত স্বরূপ কি; (৩) এবং ভারতীয় দর্শনে যে মৌলিক তত্ত্বগুলি স্থাপিত হয়েছে তাদের মধ্যে কোন পথে সমন্বয় স্থাপন করা যায়। এইবার এই আলোচনাগুলি সম্বন্ধে একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া যেতে পারে।

ইচ্ছাপ্রণোদিত কর্মের সঙ্গে হৃদয়বৃত্তির যোগ থাকলে মনে সুখও আসে দুঃখও আসে। সমস্যা হল দুঃখকে পরিহার করা যায় কি করে। কর্তব্য কর্ম করতে অনেক সময় যাকে ভালবাসি তাকে পীড়া দিয়ে বসি। এবং নিজে বেদনা পাই। বেদনা কি এড়ানো যায় না? এই প্রশ্নের সমাধানেই গীতায় নিষ্কাম কর্মসাধনা তত্ত্ব স্থাপিত হয়েছে। তা বলে হৃদয়বৃত্তির সঙ্গে কর্মের সম্বন্ধ ছেদ করলে তা সম্ভব হয়। কর্মের যা ফল হবে সে সম্বন্ধে উদাসীন থাকলে তা সম্ভব হয়। সন্ন্যাসী দুঃখ এড়াবার জন্য কর্মকেই ত্যাগ করেন। কিন্তু তাতে ত সংসার চলে না, লোক সংগ্রহার্থে, সমাজের কল্যাণের জন্য কর্ম করতেই হয়। তাই গীতায় বলা হয়েছে কর্মসন্ন্যাস নয়, কর্মফল আশা না রেখে কাজ করলে কর্তব্য কর্ম সম্পাদন হতে যে দুঃখ আসে তা পরিহার করা যায়। সুতরাং কর্মসন্ন্যাস হতে কর্মফল সন্ন্যাস উচ্চতর আদর্শ।

দ্বিতীয় আলোচ্য বিষয় হল আপাত দৃষ্টিতে তিনি পার্থের সখা এবং সারথি তাঁর প্রকৃত পরিচয় কি? গীতায় ধীরে ধীরে নিজের মুখে কৃষ্ণই তাঁর আত্মপরিচয় দিয়েছেন। তিনি যে স্বয়ং বিষ্ণুর অবতার সেই তত্ত্ব এখানে স্থাপিত হয়েছে। সুতরাং প্রসঙ্গক্রমে এখানে ভক্তিবাদ এবং আনুষঙ্গিকভাবে অবতারবাদ স্থাপিত হয়েছে। আমরা এই আলোচ্য বিষয়টিকে সংক্ষেপে অবতারবাদ তত্ত্ব বলব।

তৃতীয়ত দেখব গীতায় একটি সমন্বয়ধর্মী দার্শনিক তত্ত্ব

স্হাপিত হয়েছে। বিশ্ব রহস্যের ব্যাখ্যায় ভারতীয় দর্শনে বিভিন্ন কালে বিভিন্ন তত্ত্ব স্হাপিত হয়েছে। তাদের মধ্যে অসঙ্গতি এসে পড়ে। গীতায় একটি ন্তন তত্ত্ব স্হাপন করে তাদের মধ্যে সমন্বয় সাধনের চেষ্টা হয়েছে।

বিশ্বের প্রকৃতির ব্যাখ্যায় ভারতীয় দর্শনে তিনটি মৌলিক তত্ত্ব স্হাপিত হয়েছে। প্রথমে পাই প্রাচীন উপনিষদে বিকশিত ব্রহ্মবাদ। তা বলে বিশ্ব একটি নৈর্ব্যক্তিক মহাশক্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এবং তা বিশ্বের মধ্যে প্রচ্ছন্ন থেকে বিশ্বকে নিয়ন্ত্রণ করে। তাই তাকে 'আত্মা অন্তর্যামী' বলা হয়েছে ; অন্তরে থেকেই তিনি যমিত বা নিয়ন্ত্রিত করেন। দ্বিতীয় তত্ত্ব পাই সাংখ্যাদর্শনে প্রতিপাদিত প্রকৃতি প্রুষতত্ত্ব। তাও খ্ব প্রাচীন তত্ত্ব। তাবলে বিশ্ব দ্ই ম্ল সত্তার সংযোগে বিশ্ব গড়ে ওঠে ; একটি প্রুষ এবং অপরটি প্রকৃতি। প্রুষ হতে বিচ্ছিন্ন অবস্হায় প্রকৃতি অব্যাকৃত থাকে। তাই তার নিজস্ব র্প। প্রুষের সংস্পর্শে আসলে তা জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়র্পী বিশ্বে পরিবর্তিত হয়। শেষে পাই ভক্তিবাদ। তা ভারতীয় চিন্তায় পরে এসেছে। তা বলে বিশ্ব এক সর্বশক্তিমান ব্যক্তির্পী সত্তার স্ষ্টি। তিনি বিশ্ব হতে প্থক থেকে বিশ্বকে স্ষ্টি করেন। তিনি প্রয়োজন হলে মান্ষর্পে জন্মগ্রহণ করেন। তাকে তাঁর অবতারর্প বলে। কৃষ্ণ সেই অবতার। গীতায় এই তিনটি দার্শনিক তত্ত্বের সহাবস্হিতি সম্ভব করবার জন্য একটি ন্তন সমন্বয়ধর্মী তত্ত্ব স্হাপন করা হয়েছে।

এদের অতিরিক্তভাবে সমগ্র গীতা জ্বড়ে আরও একটি তত্ত্ব প্রসঙ্গত আলোচিত হয়েছে। তাকে আমরা গীতার ম্বক্তিতত্ত্ব বলতে পারি। আমাদের দেশে জন্মবন্ধন হতে ম্বক্তিকেই নিঃশ্রেয়স বা অপবর্গ বা প্রুষার্থ বলা হয়ে থাকে। হিন্দ্দর্শন গ্বলিতে মোটাম্বটি বলা হয়েছে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করে ম্বক্তি পাওয়া যায়। বৌদ্ধ ও জৈন দর্শনে বলা হয়েছে নীতিসম্মত কর্ম করে ম্বক্তি পাওয়া যায়।

গীতায় একটি নূতন তত্ত্ব স্থাপিত হয়েছে। তা বলে ঈশ্বরকে ভক্তি করে, বাসনামুক্ত মন নিয়ে কর্তব্য কর্ম সম্পাদন করলে ঈশ্বরের অনুগ্রহ লাভ হয়। ফলে তিনি পুরস্কার স্বরূপ তত্ত্বজ্ঞান দেন। তার ফলে জন্মবন্ধন হতে মুক্তিলাভ করা যায়। সুতরাং গীতার মুক্তিতত্ত্ব বলে ভক্তি, নিষ্কাম কর্ম ও জ্ঞানে মুক্তি মিলবে। কাজেই একটি বিশেষ মুক্তিতত্ত্ব গীতার আলোচ্য বিষয়।

৩

নিষ্কাম কর্মসাধনা তত্ত্ব

মানুষের প্রকৃতি এমন যে এক মুহূর্তও সে কর্ম না করে থাকতে পারে না। এখানে কর্মকে ব্যাপক অর্থে ধরতে হবে। তা মানসিক, বাচিক, দৈহিক সকল প্রকার কর্মকেই বোঝায়। স্বপ্ন-বিহীন নিদ্রার সময় ব্যতীত মানুষ অবিরত কর্ম করে। তাই গীতায় বলা হয়েছে যে মানুষ কর্ম না করে একটি মাত্র ক্ষণও থাকতে পারে না। (১৯) সাধারণত মানুষ স্বার্থবোধ প্রণোদিত হয়ে কাজ করে। ফলে নানা ভাবে দুঃখের আঘাত আসে। যে উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করা হয় তার সিদ্ধি না হলে দুঃখ হয়। অপরপক্ষে সকলেই স্বার্থসিদ্ধির জন্য কাজ করলে পরস্পরের স্বার্থের সংঘাত ঘটে। তার ফলে নানা প্রতিকূল অবস্থার সৃষ্টি হয়। এবং মনে শান্তি থাকে না। এই অস্বস্তিকর পরিস্থিতি হতে পরিত্রাণের জন্য একটি উপায় অনুসন্ধানের প্রয়োজন আছে।

এই প্রসঙ্গে গীতায় বেদের কর্মকাণ্ডে যে বৈষয়িক উন্নতি সাধনের জন্য যজ্ঞ অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা আছে তার সমালোচনা করা হয়েছে। বেদের কর্মকাণ্ডে যজ্ঞের যে ব্যবস্থা আছে, দেখা যাবে তা ব্যবহারিক প্রয়োজন বোধের দ্বারা অনুপ্রাণিত। যে সূক্তগুলি যজ্ঞে আবৃত্তি করা হয় বা সুরসংযোগে গাওয়া হয় তাতে আশ্রিত

১৯। ন ক্ষণমপি কশ্চিদ্ হি জাতু তিষ্ঠত্যকর্মকৃৎ। গীতা। ৩। ৫।

যে প্রার্থনা আছে তা স্বার্থবোধ প্রণোদিত। শত্রুকে জয় করব, সম্পদলাভ করব বা বিঘ্ন অপসারিত হবে—এই ধরনের ইচ্ছা তাতে প্রকট। গীতার ভাষায় বলা যায় আর্ত ও অর্থার্থী মনোভাব দ্বারা তা অনুপ্রাণিত। পূর্বমীমাংসা দর্শন বলেছে যজ্ঞ অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য হল পুরুষার্থ লাভ। এখানে সেই পুরুষার্থ হল স্বর্গ-প্রাপ্তি। অর্থাৎ ব্যক্তিগত সুখভোগই সেখানে জীবনের লক্ষ্য বলে পরিগণিত হয়েছে।

গীতায় এই দৃষ্টিভঙ্গিরই নিন্দা করা হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে পাই কৃষ্ণ বলছেন, বেদে অনেক চিত্তাকর্ষক কথা বলা হয়েছে, নানা যজ্ঞকর্মের উপদেশ দেওয়া হয়েছে; কিন্তু তা একেবারেই ব্যবহারিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত। তাতে ভোগ ও ঐশ্বর্য হল প্রেরণা এবং স্বর্গপ্রাপ্তি পুরুষার্থ, কিন্তু সবই স্বার্থবোধ প্রণোদিত কামনাকে চরিতার্থ করে; তা নিম্নস্তরের আদর্শ। তাকে যে বুদ্ধি প্রেরণা দেয় তাকে তিনি 'ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি' বলেছেন। তিনি বলেছেন, কর্মযোগ সাধনায় এই নিকৃষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি স্থান পাবার যোগ্য নয়। প্রাসঙ্গিক মন্তব্যটি এই ঃ

ভোগৈশ্বর্য প্রসক্তানাং তয়া চ হৃত চেতসাম্।
ব্যবসায়াত্মিকাবুদ্ধিঃ সমাধৌ ন বিধীয়তে॥ (২০)

অর্থাৎ, (যজ্ঞ কর্ম যে) ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি দ্বারা প্রণোদিত, তা মানুষকে ভোগ এবং ঐশ্বর্যে আসক্ত করে এবং চেতনাকে মোহগ্রস্ত করে। তা কর্মযোগ সাধনায় প্রযোজ্য নয়।

কৃষ্ণ তাই বলছেন, কর্ম হতে উদ্ভূত দুঃখ বর্জন করতে হলে এই হীন দৃষ্টিভঙ্গির ঊর্ধ্বে উঠতে হবে, মনে সমতাজ্ঞান আনতে হবে। তার অর্থ হল কর্মে সিদ্ধি ও অসিদ্ধি দুইকেই সমান জ্ঞান করতে হবে। এই সমতাজ্ঞানকেই তিনি যোগ বলেছেন। (২১) এই অবস্থা লাভ করা যায় স্থিতপ্রজ্ঞ হলে। সকল স্বার্থ প্রণোদিত কামনা ত্যাগ করে, জীবনযাপন রীতিকে সরল করে

২১। সমত্বং যোগ উচ্যতে। গীতা। ২। ৪৮

যতখানি সম্ভব যা মিলবে তাতে সন্তুষ্ট থাকতে মনকে শিক্ষা দিতে হবে।

এই পরিবেশেই স্থাপিত হয়েছে গীতার সেই চূড়ান্ত বাণী যা অপ্রিয় কর্তব্য সম্পাদনে যে দুঃখ হয় তা হতে নিষ্কৃতির পথ নির্দেশ করে। কর্ম বর্জন করে নয়, কর্তব্য কর্ম বাসনামুক্ত হয়ে সম্পাদন করলে নিষ্কৃতি পাওয়া যাবে। আদর্শ কর্মযোগীর কাজ হল কেবল কর্তব্য কর্ম সম্পাদন করা; তার ফল কি হবে সে সম্বন্ধে কামনা ও চিন্তার কোনও প্রয়োজন নাই। প্রাসঙ্গিক শ্লোকটি এই:

কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।
মা কর্মফল হেতুর্ভূর্ মা তে সঙ্গোঽস্ত্ব কর্মণি ॥ (২২)

অর্থাৎ তোমার কেবল কর্তব্য কর্ম সম্পাদনে অধিকার, ফলে কোনও অধিকার নাই। কর্মফলের আশায় কাজ করবে না, কর্মহীন অবস্থায়ও থাকবে না।

সুতরাং কর্তব্য কর্ম সম্পাদন করতে যে দুঃখ ভোগ হয়, তাকে পরিহার করতে হলে কর্মফল সম্বন্ধে নিরপেক্ষ হতে হবে। অনাসক্ত হয়ে কর্তব্যবোধে কর্ম করতে হবে। আরও বলা হয়েছে শুধু কর্মফলের আশা বর্জন নয় নির্মম হয়ে কাজ করতে হবে, হৃদয়বৃত্তির আবেদনকে সর্বথা প্রত্যাখ্যান করতে হবে। এই প্রসঙ্গে কৃষ্ণ বলেছেন 'নিরাশী' ও 'নির্মম' হতে হবে। (২৩) তাঁর ভাষ্যে রামানুজ বলেছেন 'নিরাশীর' অর্থ হল নিষ্কাম হওয়া। আমার ধারণায় তার অর্থ হল মনে কর্মের ফল সম্বন্ধে কোনও আশা পোষণ না করে কাজ করা। 'নির্মমের' অর্থ শঙ্কর করেছেন মমত্ববোধ শূন্য হওয়া। মধুসূদন সরস্বতী তার অর্থ করেছেন দেহ ও পুত্রাদি সম্বন্ধে মমত্বশূন্য হওয়া। আমার ধারণায় এই মমত্ববোধের অভাব আরও ব্যাপক অর্থে প্রয়োগ করা হয়েছে।

২২। গীতা। ২। ৪৭
২৩। নিরাশী নির্মমো। ভূত্বা যুধ্যস্ব বিগতজ্বরঃ গীতা ৩। ৩০

অর্থাৎ শুধু নিজের দেহের উপর মমত্ব বা আত্মীয়ের প্রতি মমত্ব নয় সাধারণ মানুষের প্রতি মমত্বও তা সূচিত করে। অর্থাৎ মমত্ব প্রীতি ও করুণাবোধও সূচিত করে। সুতরাং নির্দেশ হল করুণা-বোধ বর্জ্জিত হয়ে কাজ করতে হবে; কর্তব্যকর্ম সম্পাদনে কারও ক্ষতি করতে হলে মমতাবোধহীন হয়ে তা করতে হবে। কর্তব্য সম্পাদনের সঙ্গে হৃদয়বৃত্তির কোনও সংযোগ থাকবে না।

সুতরাং কৃষ্ণের চূড়ান্ত উপদেশ হল কর্তব্য কর্ম সম্পূর্ণভাবে অনাসক্ত হয়ে করতে হবে, তার যা ফল হবে সে সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন থাকতে হবে। অপরপক্ষে কর্মত্যাগও উচিত হবে না। নীতির ক্ষেত্রে এই হল গীতার চূড়ান্ত উপদেশ।

কিন্তু চতুর্থ অধ্যায়ে কৃষ্ণের একটি মন্তব্যকে ঘিরে কিছু জটিলতা সৃষ্টি হয়েছে। কৃষ্ণ বলছেন, যজ্ঞের অগ্নি যেমন কাঠ ভস্মসাৎ করে দেয়, তেমন জ্ঞানমার্গে সাধনা সকল কর্মকে অপ্রয়োজনীয় করে দেয়। (২৪) শুধু তাই নয়, পরের শ্লোকেই বলা হচ্ছে জ্ঞানের মত পবিত্র বিশ্বে কিছুই নাই; 'নহি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে।' অর্জুন তাই পঞ্চম অধ্যায়ে সঙ্গত কারণেই প্রশ্ন তুলেছিলেন যে প্রকারান্তরে কৃষ্ণ দুটি পথের নির্দেশ দিচ্ছেন ঃ একটি জ্ঞানমার্গ অবলম্বন করে কর্মসন্ন্যাস, একটি কর্ম করে কর্মফল সন্ন্যাস। তাই এদের মধ্যে কোনটি শ্রেয় তিনি জানতে চাইলেন।

কৃষ্ণ এর উত্তরে বললেন, জ্ঞানমার্গে যা লাভ করা যায় নিষ্কাম কর্মমার্গের সাধনায়ও তাই লাভ করা যায়। (২৫)

২৪। যথৈধাংসি সমিদ্ধোহগ্নির্ভস্মসাৎ কুরুতেহর্জুন।
জ্ঞানাগ্নি ঃ সর্বকর্মাণি ভস্মাসাৎ কুরুতে তথা ॥
গীতা। ৪। ৩৭

২৫। যৎ সাংখ্যৈঃ প্রাপ্যতে স্থানং
তদ্ যোগৈরপি প্রাপ্যতে ॥ গীতা। ৫। ৫
এখানে সাংখ্য অর্থে জ্ঞানমার্গ সূচিত হয়েছে
এবং যোগ অর্থে কর্মমার্গ সূচিত হয়েছে।

উভয় মার্গেরই সুবিধাও আছে অসুবিধাও আছে। কর্ম বর্জন করে সন্ন্যাস দুঃখের পথ। (২৬) অপরপক্ষে কর্মফল সন্ন্যাসের পথ অবলম্বন করলে দ্রুত পুরুষার্থ লাভ হয়। তাই তার চূড়ান্ত অভিমত হল কর্মত্যাগ করে জ্ঞানমার্গের সাধনা হতে নিষ্কাম কর্মসাধনা শ্রেয়তর পথ। (২৭) সুতরাং তাঁর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হল কর্মফল বর্জন করে যে কর্তব্য সম্পাদন করে সেই প্রকৃত যোগী, সেই প্রকৃত সন্ন্যাসী। শ্রৌতকর্ম ত্যাগ করে বা কর্মত্যাগ করে সে নয়।

সুতরাং গীতায় নিষ্কাম কর্মযোগের যে ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে তার কয়েকটি বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায়। তা বলে কর্তব্য কর্ম করে যেতে হবে ; কিন্তু তার ফল কি হবে সে বিষয় উদাসীন থাকতে হবে। কর্ম অপ্রিয় হলেও করে যেতে হবে, মমতা বোধ বা করুণা বোধ কর্তব্যকর্ম সম্পাদনে বাধা না হয়। অর্থাৎ কর্তব্য সম্পাদনে হৃদয়বৃত্তির কোনও ভূমিকা থাকবে না।

গীতায় প্রতিপাদিত এই তত্ত্বের সঙ্গে জার্মান দার্শনিক কান্ট কর্তৃক স্থাপিত নৈতিক আদর্শের বেশ সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। কান্ট বলেন, মানুষের বৈশিষ্ট্য হল সে বুদ্ধিবৃত্তির সাহায্যে সে নিজের কর্তব্য নির্দ্ধারণ করে নিতে পারে। তাই তার নৈতিক আদর্শ হওয়া উচিত বুদ্ধিবৃত্তির আলোকে কর্তব্য নির্দ্ধারন করা ; সুখের বাসনায় কাজ না করা। নীতির নির্দেশ হল এটা তোমার করা উচিত।(২৮) এটা তোমার করতেই হবে। (২৯) কাজেই কোনও উদ্দেশ্যের সঙ্গে নৈতিক কর্মের যোগ থাকতে পারে না। হৃদয়বৃত্তির এখানে প্রয়োগের এখানে অবকাশ নাই। সুখদুঃখ বোধের ঊর্দ্ধে উঠে কর্তব্য করতে হবে। কর্মের পরিণতি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন থাকতে হবে।

উপনিষদে যে নৈতিক আদর্শ স্থাপিত হয়েছে তা খানিকটা

২৬। সন্ন্যাসস্তু মহাবাহো দুঃখমাপ্তুমযোগতঃ।
যোগযুক্তো মুনিব্রহ্ম নচিরেণা ধিগচ্ছতি ॥ গীতা। ৫। ৫

২৭। সন্ন্যাসঃ কর্মযোগশ্চ নিঃশ্রেয়স করাবুভৌ।
তয়োস্তু কর্মসন্ন্যাসাৎ কর্মযোগো বিশিষ্যতে ।। গীতা। ৫। ২

গীতা ও কাণ্টের অনুরূপ, আবার খানিকটা নয়। উপনিষদ ব্যাপক দৃষ্টিভঙ্গি হতে সমস্যার সমাধান করতে চেষ্টা করেছে। তাও গীতার মত কর্মসন্ন্যাস বর্জন করেছে, কর্ম করতে উপদেশ দিয়েছে। সামগ্রিক কল্যাণই উপনিষদের লক্ষ্য। তাই যা প্রেয় বা আপাত দৃষ্টিতে সুখকর তাকে বর্জন করতে উপদেশ দিয়েছে। তা শ্রেয় বা সামগ্রিক কল্যাণকে আদর্শ বলে গ্রহণ করেছে। শ্রেয়ের দৃষ্টিভঙ্গি ব্যাপক দৃষ্টিভঙ্গি। তাও মানুষকে সংকুচিত স্বার্থ বোধের উপরে উঠতে বলেছে। তবে তা হৃদয়বৃত্তিকে নীতি হতে বর্জন করে নি, হৃদয়বৃত্তিকেও কর্তব্য সম্পাদনে একটি ভূমিকা দিয়েছে। হৃদয়বৃত্তির যা উন্নততর বিকাশ সেই সেই সর্বজনীন মমতা বোধকে নীতির জগতে সম্মানের স্থানে স্থাপন করেছে।

উপনিষদ হৃদয়বৃত্তিকে কেন বর্জন করেনি সে কথা এখানে পরিষ্কার করে নেওয়া যেতে পারে। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে জ্ঞানের সঙ্গে নীতির একটি গভীর সংযোগ আছে। একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করলে তা বোঝা সহজ হবে। মায়ের সন্তানের প্রতি স্নেহ স্বতঃই প্রবাহিত হয়। কিন্তু তাঁর সন্তানসেবা সার্থক হয় না যদিনা তিনি জ্ঞানের দ্বারা পরিচালিত না হন। বিদুষী মাতা যে ভাবে সন্তান পালন করেন তাতে সন্তানের কল্যাণ সুষ্ঠুভাবে সাধিত হয়। তার কারণ এখানে মমতাবোধের সঙ্গে জ্ঞানের সংযোগ ঘটেছে। অপর দিকে হৃদয়বৃত্তির সহিত সংযোগ বিহীন সুবুদ্ধি প্রণোদিত কর্ম তেমন সার্থক হয় না। শুধু কর্তব্যবোধে যে কর্ম সম্পাদিত হয় তা যান্ত্রিকভাবে সম্পাদিত হয়। যার কল্যাণ কর্মে নিযুক্ত আছি তাকে যদি ভালবাসি আরও ভালভাবে ও সহজ ভাবে তা সম্পাদন করতে পারি। তখন কর্তব্য সম্পাদনে ক্লেশ বোধ হয় না, তা আনন্দ দেয়। হাসপাতালের নার্স যে ভাবে শিশুর সেবা করবে, শিক্ষিত মাতা তার থেকে ভাল ভাবে করবে ; কারণ, সেখানে নার্সের বিশেষ জ্ঞানের সঙ্গে মায়ের স্নেহ সংযুক্ত হয়েছে।

সুতরাং নীতির ক্ষেত্রে বুদ্ধিবৃত্তিচালিত কর্তব্যবোধের সহিত

প্রীতির যোগ হওয়া বাঞ্ছনীয়। বুদ্ধি পথ নির্দেশ করিবে, কিন্তু স্নেহ বা প্রীতি বা শ্রদ্ধা প্রণোদিত ইচ্ছা তার সঙ্গে যুক্ত হলে তার উৎকর্ষ বৃদ্ধি পাবে। এখানে কর্মশক্তির সঙ্গে হৃদয়বৃত্তির সংযোগ ঘটে বলে কর্মশক্তি পরিপূর্ণভাবে সার্থক হয়। নীতির ক্ষেত্রে হৃদয়বৃত্তির ব্যবহার এই যুক্তিতেই উপনিষদে সমর্থিত হয়েছে। তাই উপনিষদ হৃদয় বৃত্তির দাবীকে স্বীকার করে নিয়ে তাকে বিশিষ্ট ভূমিকা দিয়েছে। উপনিষদ বলে মানুষ আত্মীয়-অনাত্মীয় নির্বিশেষে মানুষকে ভালবাসুক, ব্রহ্মের সর্বব্যাপিত্ব উপলব্ধি করে সকলে পরস্পরের সহিত আত্মীয়তা অনুভব করুক। ফলে কর্তব্য সাধন আরও সার্থক হবে, কর্তব্যের সঙ্গে আনন্দের যোগ হবে।

গীতা হৃদয়বৃত্তিকে বর্জন করতে চেয়েছে একটি বিশেষ কারণে। প্রীতিবোধ বা মমতাবোধ থাকলে অপ্রিয় কর্তব্য সম্পাদনে মনে পীড়া হয়, যেমন অর্জুনের হয়েছিল। ফলে কিছু লাভ হয়েছে, কিন্তু তার জন্য মূল্য দিতে হয়েছে অনেক।

৪

ভক্তিবাদ আশ্রিত অবতার বাদ

মানুষের ধর্মবোধ গড়ে ওঠে কতকগুলি আকুতির প্রভাবে। যে অন্যায় করে তাকে দণ্ড দেবার প্রয়োজনবোধ মানুষের মধ্যে প্রবল-ভাবে ক্রিয়া করে। তাই ন্যায়দণ্ডধারণ করেন এমন শক্তির প্রয়োজন মানুষ অনুভব করে। দ্বিতীয়ত, জীবনে অন্যায় আচরণ করলে বিবেকের দংশন হেতু পাপবোধও একটি পীড়াদারক মানসিক অবস্থা। শাস্তির আশঙ্কা এবং অনুশোচনা উভয়ই পীড়াদায়ক। তা হতে পরিত্রাণের জন্য এমন একটি শক্তির আশ্রয়ের প্রয়োজন যিনি পাপ মার্জনা করবার ক্ষমতা রাখেন। তৃতীয়ত সাধারণ মানুষ স্বার্থপর হয়। সে নিজেকে নিরাপদ রাখতে চায়, নিজের বৈষয়িক উন্নতি চায়। কিন্তু তার ক্ষমতা সীমিত। তাই সে এমন একটি শক্তির আশ্রয় চায় যিনি উভয় ক্ষেত্রেই তাকে সাহায্য

করতে পারেন। এই সব আকূতিগুলির তৃপ্তির জন্যই মানুষের সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের আশ্রয়ের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। এখানেই ধর্মবোধের বীজকে পাওয়া যাবে।

আমরা দেখি পৃথিবীর সব থেকে প্রাচীন ধর্মগ্রন্থের প্রেরণা হল এই সব আকূতি। সেখানে প্রশ্ন উঠেছে ভয় হতে পরিত্রাণ, বাসনার তৃপ্তি, অনুশোচনা হতে মুক্তি প্রভৃতি আকাঙ্ক্ষা হতে নিবৃত্তির জন্য কোন শক্তির শরণ গ্রহণ করব? ঋষি প্রশ্ন তুলেছেন 'কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম'? ঋগ্বেদের সহস্রাধিক সূক্তে সেই শক্তির অন্বেষণের ইতিহাসই লিপিবদ্ধ হয়েছে। এই প্রশ্নের সমাধানে অগ্রগতির পথে কয়েকটি স্তর পাওয়া যায়।

অনুসন্ধানের প্রথম পর্বে প্রকৃতির বক্ষে আশ্রিত বিভিন্ন শক্তিকে দেবতার পদে স্থাপিত করা হয়েছে। ফলে বহু দেবতা কল্পিত হয়েছেন। পরবর্তী অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে মনে হয়েছে, বিশ্ব ত বহু বিশিষ্ট ক্রিয়াশক্তির পরস্পর সঙ্গতিহীন ক্রিয়াক্ষেত্র নয়। তখন তাঁদের মধ্যে সংহতি বিধায়ক হিসাবে এক অতি দেবতার সন্মান শুরু হয়েছে এবং শেষে বরুণ সেই পদে স্থাপিত হয়েছেন। পরের স্তরের চিন্তায় বিশ্বদেবতার পরিকল্পনা গড়ে উঠেছে। সকল দেবতাকে একত্র করে তাঁদের যজ্ঞে আহ্বান করে তর্পণ করা হয়েছে। সর্বশেষে ঋষি আবিষ্কার করেছেন যে দেবতা ত বহু নয়, দেবতা একটি, আমরা একই দেবতাকে ভিন্ন নাম দিয়ে ডাকি। তিনি বলেছেন, সেই পরমশক্তি 'এক হলেও তাঁকে বহু বলে বর্ণনা করা হয়, একে অগ্নি যম, মাতরিশ্বা নাম দেওয়া হয়।' (২৮)

ঋগ্বেদের দশম মন্ডলে এই চিন্তা আরও বিকাশ লাভ করেছে। সেখানে দেখি বিশ্বের মৌলিক সত্তার প্রকৃতি সম্বন্ধে বিভিন্ন চিন্তাধারা গড়ে উঠেছে। একটি চিন্তা ঈশ্বরকে বিশ্বময় ব্যাপ্ত রূপে কল্পনা করেছে। তা সর্বেশ্বরবাদ অভিমুখী। তাকে

২৮। একং সদ, বিপ্রা বসুধা বদন্তি।
অগ্নিং যমং মাতরিস্বান মাহুঃ। ঋগ্‌বেদ। ১।১৬৪।৪৬

বীজাকারে আত্মাসূক্তে (১০। ১২৫) ও পুরুষসূক্তে (১০। ৯০) পাওয়া যায়। আত্মাসূক্তে বলা হয়েছে, আত্মা নানা প্রাণীর মধ্যে বিস্তারিত হয়েছেন। পুরুষ সূক্তে বলা হয়েছে একই বিরাট পুরুষের বিভিন্ন অংশ দিয়ে বিশ্ব সৃষ্টি হয়েছে। এখানেই প্রাচীন উপনিষদে বিকশিত ব্রহ্মবাদের বীজটি পাওয়া যায়। সুতরাং এই চিন্তাটি শ্রুতির মধ্যেই শ্রুতির যুগে বিকাশ লাভ করেছিল।

দ্বিতীয় চিন্তাটি একেশ্বরবাদের পথে প্রবাহিত হয়েছিল। এখানে ঈশ্বরকে বিশ্বের স্রষ্টা ও নিয়ামক শক্তি রূপে কল্পনা করা হয়েছে। আরও বলা হয়েছে তিনি বিশ্ব হতে পৃথকভাবে অবস্থান করেন এবং ব্যক্তিত্ব বিশিষ্ট। প্রজাপতি সূক্তে। (১০। ১২১), এই গুণগুলি তাঁর উপর আরোপ করা হয়েছে। প্রশ্ন করা হয়েছেকোন দেবতাকে হবি দ্বারা তৃপ্ত করব, 'কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম'। উত্তরে প্রস্তাবিত দেবতার গুণগুলির উল্লেখ করা হয়েছে। বলা হয়েছে, তিনি সর্বভূতের অদ্বিতীয় ঈশ্বর, তিনি পৃথিবী জল ও আকাশের স্রষ্টা ; তিনি দ্বিপদ ও চতুষ্পদের প্রভু; তিনি সকল বস্তুকে নিয়ন্ত্রণ করেন।

বিশ্বকর্মা সূক্তেও (১০।৮২) এই দেবতাটির অনুরূপ গুণকীর্তন করা হয়েছে। বলা হয়েছে বিশ্বকর্মা দ্যাবাপৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, তিনি বিধাতা তিনি আমাদের জন্মদাতা পিতা। আরও বলা হয়েছে তিনি সপ্তর্ষির ঊর্ধ্বে যে স্থান সেখানে একাকী বাস করেন।

এইভাবে বীজাকারে ঋগ্‌বেদে একেশ্বরবাদী চিন্তার আবির্ভাব হয়েছিল। কিন্তু ভারতীয় দর্শনের আশ্রয়ে অঙ্কুরিত হয়ে বিকাশ লাভ করতে তার দীর্ঘকাল অপেক্ষা করতে হয়েছিল। শ্রুতির যুগের শেষে প্রাচীন উপনিষদগুলির আশ্রয়ে যে তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় তাকে ব্রহ্মবাদ বলা হত। তা বলে যে শক্তি বিশ্বকে আশ্রয় দিয়েছেন এবং নিয়ন্ত্রণ করছেন তিনি এক নৈর্ব্যক্তিক শক্তি এবং বিশ্ব হতে তাঁর পৃথক প্রকাশ নেই, তিনি বিশ্বের মধ্যেই প্রচ্ছন্ন-

ভাবে বিরাজিত। এই তত্ত্বকে দর্শনের ভাষায় সর্বেশ্বরবাদ বলা হয়। এখানে ঈশ্বরকে ভক্তি জানাবার অবকাশ নাই। ভক্তির জন্য চাই ব্যক্তিত্ব বিশিষ্ট ঈশ্বর, যিনি সৃষ্টি হতে পৃথক থাকবেন। একটি দ্বৈতভাব না থাকলে ভক্তির অনুকূল পরিবেশ রচিত হয় না।

এই তত্ত্ব পরবর্তীকালে যখন হিন্দু ষড়দর্শন বিকাশলাভ করে তখনও ভালরূপে গড়ে ওঠবার সুযোগ পায় নি। এই যুগে পরজন্ম হতে মুক্তির জন্য জ্ঞানমার্গকে অবলম্বন করা হয়েছিল। দার্শনিক জ্ঞানই মুক্তির উপায় বলে ঘোষিত হয়েছিল। তাই দেখি এই ছয়টি দর্শনের মধ্যে যোগ ও ন্যায় দর্শন ব্যতীত অন্য দর্শনগুলিতে একেশ্বরবাদ পরিকল্পিত ঈশ্বরের স্বীকৃতি নাই। যেটুকু অন্য দুটি দর্শনে আছে, তা দেখায় একেশ্বর বাদতত্ত্ব দুর্বল ভাবে অত্মপ্রকাশের চেষ্টা করছে মাত্র। যোগদর্শনের ব্যক্তিত্ব বিশিষ্ট ঈশ্বর সংখ্যাদর্শনের পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের একটি অতিরিক্ত তত্ত্ব মাত্র। ন্যায়দর্শনের ঈশ্বর কেবল প্রমাণের একটি বিষয় মাত্র। উভয় ক্ষেত্রেই ঈশ্বর পরিপূর্ণ মহিমায় প্রতিষ্ঠিত হতে পারেন নি।

তার পরবর্তী যুগেই ধীরে ধীরে একেশ্বরবাদ আমাদের দেশে বিকাশ লাভ করে। এই বিকাশের পথে প্রথম পদক্ষেপ হল ত্রিমূর্ত্তির পরিকল্পনা। বিশ্ব সম্বন্ধে ঈশ্বরের তিনটি মূল ভূমিকা স্বীকৃত হয়ঃ সৃষ্টি, স্থিতি এবং প্রলয়। এই তিনটি ভূমিকার জন্য হিন্দুর চিন্তায় তিন পৃথক ব্যক্তিত্ব বিশিষ্ট শক্তির পরিকল্পনা করা হয়েছিল। ঈশ্বরের এই তিন পৃথক ভূমিকার ভিত্তিতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং মহেশ্বর এই তিন পৃথক দেবতার আবির্ভাব হয়। এই তিন জনকে একত্রিত করে ত্রিমূর্তির পরিকল্পনা। এই ত্রিমূর্তির বীজ প্রাচীন উপনিষদের মধ্যেই পাওয়া যায়। ছান্দোগ্য উপনিষদে একটি বচন আছে যা বলে, 'বিশ্বের সবকিছুই ব্রহ্ম; তাতেই তাদের উৎপত্তি বিকাশ এবং বিলয়।' (২৯) এখানেই ত্রিমূর্তি পরিকল্পনার বীজকে পাওয়া যাবে।

২৯। সর্বং খাল্বিদংব্রহ্ম তজ্জলানীতি। ছান্দোগ্য। ৩। ১৪। ১

বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখব যে বৈদিক দেবতাদের রূপ পরিবর্তন করে তাঁদের ত্রিমূর্তির অন্যতমের ভূমিকায় অধিষ্ঠিত করা হয়েছে। প্রথমে ব্রহ্মার কথা ধরা যাক। বেদে ব্রহ্মা নামে কোনও দেবতা নাই। ব্রহ্মণস্পতি নামে এক বৈদিক দেবতা আছেন। বেদের সংহিতা অংশে এই ব্রহ্ম শব্দের অর্থ হল মন্ত্র। সুতরাং ব্রহ্মণস্পতি হলেন বৈদিক মন্ত্রের দেবতা। মনে হয় সেই ব্রহ্মণস্পতিই ভক্তির যুগে ব্রহ্মায় রূপান্তরিত হয়েছেন। তাঁর যে মূর্তি পরিকল্পিত হয়েছে তাতে এই প্রস্তাবিত উৎপত্তি কাহিনীর সমর্থন মিলবে। ব্রহ্মাকে চতুর্মুখ বলে কল্পনা করা হয়। আমরা জানি আমাদের চারটি বেদ। ব্রহ্মার চারটি মুখ সম্ভবত চারটি মুখের প্রতীক। তিনি যখন ব্যক্তিত্ব বিশিষ্ট দেবতায় রূপান্তরিত হলেন তখন তাঁর পূর্বের ভূমিকার স্মৃতি বহন করবার জন্য তাঁকে চারটি মুখে ভূষিত করা হল। তাঁর আর এক নাম চতুরানন।

সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ভূমিকার রূপান্তর ঘটল। তিনি হলেন স্রষ্টারূপী ঈশ্বর। এই ভূমিকা স্মৃতির যুগে তাঁর উপর অর্পিত হয়েছিল। মনুস্মৃতির প্রথম অধ্যায়ে তাঁর বিষয় সবিস্তার উল্লেখ আছে। মহাভারতে ব্রহ্মার নানা উপলক্ষ্যে নানা ভূমিকায় প্রয়োজন হয়েছে।

এবার বিষ্ণুর কথা আলোচনা করা যাক। মনে হয় ঋগ্‌বেদের সূর্য, সবিতা ও বিষ্ণু একই দেবতা; কিন্তু ভিন্ন নামে উল্লিখিত। সূর্যের চোখ-ঝলসান রূপের সহিত মানুষ আবহমান কাল পরিচিত। তার মত মহাশক্তির আধাররূপে প্রকট বস্তু মানুষের কাছে আর দ্বিতীয় নাই। প্রকৃতির রাজ্যে সব থেকে বিরাট শক্তির আধার হিসাবে বেদে তার উপর দেবত্ব আরোপ করা হয়েছে। বলা হয়েছে সূর্য সাতটি কিরণরূপ অশ্বদ্বারা বাহিত হয়ে আকাশ পরিক্রমা করেন। (৩০) বলা হয়েছে তিনি সকল স্থাবর ও জঙ্গম প্রাণীর আত্মাস্বরূপ। (৩১)

৩০। সপ্ত ত্বা হরিতো রথে বহন্তি দেব সূর্য। ঋগ্‌বেদ। ১।৫০।৮

সূর্যকে উদ্দেশ করেই বিখ্যাত গায়ত্রী মন্ত্র রচিত হয়েছে। (৩২) তাঁর ভর্গ বা কিরণের জন্য তিনি বিখ্যাত। তাঁকে ঋগ্‌বেদের দশম মন্ডলে সূর্যের প্রতিশব্দরূপে ব্যবহার করা হয়েছে। সুতরাং ধরে নিতে পারি সূর্যও সবিতা অভিন্ন।

এখন বিষ্ণুর কথা আলোচনা করা যাক। তাঁর কীর্তি হল তিনি তিন পদক্ষেপে সমগ্র আকাশ পরিক্রমা। (৩৪) সায়ণ বলেন এই পদক্ষেপের স্থান হল পৃথিবী, অন্তরীক্ষ ও আকাশ। প্রথম পদক্ষেপ উদয়কালে, দ্বিতীয় পদক্ষেপ ঊর্ধ্বাকাশে মধ্যাহ্নে এবং তৃতীয় পদক্ষেপ ঘটে সায়াহ্নের সময় দিবসের অবসানে। বৈদিক সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত নির্ঘণ্টতে পাই সূর্য বিষ্ণুর প্রতিশব্দ। সুতরাং সন্দেহ নাই যে তাঁরা অভিন্ন। বিষ্ণুর তিনটি পদক্ষেপ সূর্যের দৈনিক আকাশ পরিক্রমার পথে তিনটি স্থানে অবস্থিতি সূচিত করে। ব্রাহ্মণদের সন্ধ্যাবিধিতেও তার সমর্থন পাই। সন্ধ্যাবিধিতে গায়ত্রী মন্ত্র জপই প্রধান আনুষ্ঠানিক ক্রিয়া। এখানে গায়ত্রীর তিনটি স্বতন্ত্র রূপ কল্পনা করা হয়েছে। প্রাতঃকালে গায়ত্রী কুমারী বেশে হস্তে ঋগ্‌বেদ ধারণ করেন; মধ্যাহ্নের সন্ধ্যায় তিনি যুবতী বেশে সামবেদ ধারণ করেন; দিবা অবসানের সন্ধ্যায় তিনি প্রৌঢ়বেশে যজুর্বেদ হস্তে ধারণ করেন। সুতরাং আমরা এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে সূর্য, সবিতা ও বিষ্ণু একই দেবতা।

তারপর আসেন মহেশ্বর। যেহেতু ত্রিমূর্তি পরিকল্পনায় তাঁকে ধ্বংস বা প্রলয়ের অধিপতি রূপে কল্পনা করা হয়েছে, তাঁকে বেদের দেবতা রুদ্রের পরিবর্তিত রূপ বলে ধরে নেওয়া যায়। প্রকৃতপক্ষে রুদ্র হলেন ঝড়ের দেবতা, ঊনপঞ্চাশৎ বায়ু

৩১। সূর্য আত্মা জগতস্থুষশ্চ। ঋগ্‌বেদ। ১। ১১। ৫। ১

৩২। ঋগ্‌বেদ। ৫। ৬২। ১০১

৩৩। ঋগ্‌বেদ। ১০। ১৫৮

৩৪। বিষ্ণুর্বিচক্রমে ত্রেধা নিদধে পদম্‌। ঋগ্‌বেদ। ১। ২২। ১৭

তাঁর সন্তান। নীলকণ্ঠে নীল মেঘ ধারণ করেন। যজুর্বেদের একসূক্তে তাকে 'নীলকণ্ঠ' ও 'শিতিকণ্ঠ' বলে বর্ণনা করা হয়েছে। (৩৫) এ বিষয় পূর্বের এক অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে। সুতরাং রুদ্রের সঙ্গে শিবের একত্ব প্রমাণিত হয়ে যায়। অবশ্য পুরাণের যুগে তাঁকে কিছু অতিরিক্ত ভূমিকা দেওয়া হয়েছে। তাঁকে পশুপতি বলা হয়েছে; কারণ, তিনি মানুষের আত্মাকে জন্মপাশ হতে মুক্ত করেন।

আমরা দেখি পরবর্তী কালে ব্রহ্মা অবহেলিত হয়ে একরকম পরিত্যক্ত হয়েছেন। শিবের জনপ্রিয়তা বেড়েছে। তাঁকে পূর্ণাঙ্গ ঈশ্বরের রূপ দিয়ে পূজা করা হয়েছে। তাঁর অন্তর্নিহিত শক্তিকে পৃথকরূপে কল্পনা করে এক জনপ্রিয় নারী দেবতার সৃষ্টি হয়েছে। তিনি আদ্যাশক্তি, শর্বাণী, বিষ্ণুমায়া প্রভৃতি নামে অভিহিত। কিন্তু পরবর্তী কালে সব থেকে বেশী সমাদর পেয়েছেন বিষ্ণু। তিনি আর ত্রিমূর্তির একজন নন। তিনি সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের আসনে স্থাপিত হয়েছেন শুধু তাই নয়, সংসারে অনাচার প্রবল হলে, দুষ্কৃতকারীদের বিনাশের জন্য এবং ধর্মস্থাপনের জন্য মানুষী মাতার সন্তান হয়ে তিনি দেহ ধারণ করে অবতীর্ণ হন বলা হয়েছে। এই পরিবেশেই মহাভারতে গীতা অংশের সংযোজন হয়েছে।

তাই দেখা যাবে গীতার মূল উদ্দেশ্য হল কৃষ্ণকে বিষ্ণুর অবতাররূপে স্থাপন করা। এই তত্ত্বটি স্থাপিত হয়েছে স্বয়ং কৃষ্ণের মুখনিঃসৃত বাণী দিয়ে। গীতার ষষ্ঠ অধ্যায় হতে একাদশ অধ্যায়ের এই হল প্রতিপাদ্য। এই প্রসঙ্গে একেশ্বরবাদ ভিত্তিক অবতারবাদের যে তত্ত্ব ভারতীয় চিন্তায় গড়ে উঠেছে তার একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় এখানে স্থাপন করা যেতে পারে।

আমরা দেখব গীতায় কৃষ্ণ এবং ভগবান অভিন্ন রূপে কল্পিত হয়েছেন; কারণ, তিনি বিষ্ণুর অবতার বলে ঘোষিত। পরবর্তী

৩৫। শুক্লযজুর্বেদ। ১৬। ২৮

কালে ভাগবত পুরাণে বলা হয়েছে তিনি স্বয়ং ভগবান। আরও বলা হয়েছে ভগবানের আরও অবতার আছেন; কিন্তু তাঁরা ভগবানে বিরাট শক্তির অংশ নিয়ে অবতীর্ণ। আর কৃষ্ণ অখন্ড ঈশ্বরের প্রতিরূপ। তাই অন্য অবতারদের থেকে তাঁকে পৃথক করবার জন্য তাঁকে অবতারী বলা হয়েছে। (৩৬)

আমরা দেখব গীতায় ঈশ্বরের যেরূপ চিত্রিত হয়েছে তা একেশ্বরবাদ প্রচারিত রূপ। একেশ্বরবাদ বলে ঈশ্বর ব্যক্তিত্ব-বিশিষ্ট, তিনি স্রষ্টা কিন্তু সৃষ্টি হতে পৃথক ঠিক এই কথাই গীতার নবম অধ্যায়ে বলা হয়েছে। কৃষ্ণ বলছেন, আমি অমূর্ত থেকেও এই সমগ্র বিশ্বকে সৃষ্টি করেছি; সকল জীব আমার মধ্যে অবস্থিত, কিন্তু আমি তাদের মধ্যে অবস্থিত নই। (৩৭) তিনি আরও বলছেন যে জীবেদের তিনি ভরণ করেন; কিন্তু তিনি তাদের মধ্যে অবস্থিত নন। (৩৮)

আরও দেখা যাবে গীতায় উপনিষদ পরিকল্পিত সর্বেশ্বর-বাদের স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে; কিন্তু একেশ্বরবাদ পরিকল্পিত ভক্তিভাজন ব্যক্তিরূপী ঈশ্বরকে উচ্চতর আসনে স্থাপন করা হয়েছে। বিষয়টি সপ্তম অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে। এই প্রসঙ্গে ভক্তদের চারটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে। এই শ্রেণীভাগ দুটি নীতি দ্বারা প্রভাবিত: ভক্তের মতিগতি এবং তার দৃষ্টিভঙ্গি। মানুষের মন বড় বিচিত্র। সে নানাভাবে ঈশ্বরের প্রতি আকৃষ্ট হয়। কেহ কৌতূহল বৃত্তি চরিতার্থ করতে আকৃষ্ট হয়। কেহ বা শুধু ভক্তির অনুরোধে আকৃষ্ট হয় কেহ ব্যবহারিক প্রয়োজনে আকৃষ্ট হয়। গীতায় এদের।

৩৬। অন্যে চাংশকলাঃ সর্বে কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ম্।
এই প্রসঙ্গে শ্রীমদ ভাগবত প্রথম স্কন্দ। তৃতীয় অধ্যায় দ্রষ্টব্য

৩৭। ময়া ততমিদং সর্বং জগদব্যক্তমূর্তিনা।
মৎস্থানি সর্বভূতানি ন চাহং তেষ্ববস্থিতঃ॥ গীতা। ৯। ৪

৩৮। ভূতভৃন্ন ভূতস্থো। গীতা। ৯। ৫

সকলকেই ভক্ত বলেস্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে এবং তাদের মতিগতিও দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে চারটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে।

এই চারটি শ্রেণী হল আর্ত, অর্থার্থী, জিজ্ঞাসু ও জ্ঞানীভক্ত। (৩৯) যিনি বিপদে পড়ে ঈশ্বরকে স্মরণ করেন তিনি আর্তশ্রেণীর ভক্ত। যিনি কোনও বাসনা পূরণের জন্য ঈশ্বরের শরণার্থী হন তিনি অর্থার্থী। যিনি কৌতূহলের প্রেরণায় বিশ্বের মূলসত্তার প্রকৃতির পরিচয় পেতে আগ্রহী তিনি জিজ্ঞাসু। আর যিনি অহৈতুক ভক্তিহেতুই ঈশ্বরকে ভক্তি করেন তিনি জ্ঞানী-ভক্ত। পরের শ্লোকেই স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে জ্ঞানী-ভক্ত হলেন তিনি যিনি অহৈতুক একনিষ্ঠভাবে ঈশ্বরকে ভক্তি করেন। চারশ্রেণীর মানুষকেই ভক্ত বলে স্বীকৃতি দেওয়া হলেও উৎকর্ষের দিক হতে জ্ঞানী ভক্তকেই শ্রেষ্ঠ আসনে অধিষ্ঠিত করা হয়েছে। এখানে বলা হয়েছে যিনি একনিষ্ঠভাবে কৃষ্ণকে ভক্তি করেন তিনিই শ্রেষ্ঠ এবং কৃষ্ণ যেমন এই শ্রেণীর ভক্তের প্রিয়, তিনিও তেমন কৃষ্ণের 'অত্যন্ত প্রিয়। (৪০)

এই উক্তির সমর্থন দ্বাদশ অধ্যায়ে পাওয়া যাবে। সেখানে বলা হয়েছে, যে ভক্ত পরমশ্রদ্ধার সহিত কৃষ্ণের উপর মন নিবিষ্ঠ করে নিত্য তাঁর উপাসনা করেন তিনিই শ্রেষ্ঠ। (৪১)

তবে গীতায় এও স্বীকৃত হয়েছে যে যারা অন্য রীতি অবলম্বন করেন তাদেরও কৃষ্ণ গ্রহণ করেন। তবে বেদের কর্মকান্ডের

৩৯। চতুর্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জুন।
আর্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ।
গীতা। ৭।১৬

৪০। তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তি বিশিষ্যতে।
প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোঽত্যর্থ মহং স চ মম প্রিয়ঃ।
গীতা। ৭। ১৭

৪১। ময্যাবেশ্য মনো যে মাং নিত্যযুক্তা উপাসতে।
শ্রদ্ধয়া তারয়ো পেতাস্তে মে যুক্ততমা মতাঃ।।
গীতা। ১২। ২

অনুবর্তী হয়ে যাঁরা আর্ত ও অর্থার্থীর মনোভাব নিয়ে উপাসনা করেন তাঁদের কিছু নিন্দা করা হয়েছে। কারণ, তাঁরা ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি প্রণোদিত হয়ে, অর্থাৎ ব্যবহারিক প্রয়োজনের অনুরোধে দেবতাকে উপাসনা করেন। তবু গীতায় বলা হয়েছে তাঁদের উপসনাও ব্যর্থ হয় না। বলা হয়েছে, তার ফলে যে পুণ্য সঞ্চয় হয় তার গুণে তাঁরা সুরলোকে যান। (৪২) অর্থাৎ পূর্ব মীমাংসায় স্থাপিত তত্ত্ব এখানে স্বীকৃত হয়েছে।

অন্যভাবে উপাসনা রীতি গীতায় স্বীকৃত। এর নানা দৃষ্টান্ত এই প্রসঙ্গে স্হাপন করা হয়েছে। কেহ জ্ঞানমার্গে উপাসনা করেন, কেহ অদ্বিতীয় ঈশ্বররূপে কৃষ্ণকে উপাসনা করেন, কেহ বিভিন্ন দেবতারূপে কল্পনা করেন, কেহ বা সর্বতোমুখ বিশ্বে পরিব্যাপ্ত সত্তারূপে কল্পনা করেন। (৪২) সুতরাং জ্ঞানমার্গ রীতি স্বীকৃত এবং বহুদেবতা রূপে উপাসনাও স্বীকৃত।

এইভাবে গীতায় উপাসনারীতি সম্বন্ধে একটি উদার মনোভাব গড়ে উঠেছে। রুচিভেদে, মতিগতিভেদে মানুষ বিভিন্ন রীতিতে ঈশ্বরের নিকট ভক্তি নিবেদন করে। তাদের সকলকেই গীতায় স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। কৃষ্ণ বলছেন যে যেমন ভাবে আসে, তেমন ভাবেই তাকে আমি গ্রহণ করি এবং সকলেরই লক্ষ্য প্রকৃত পক্ষে আমি। (৪৪)

তা হলেও এটা স্পষ্ট বোঝা যায় গীতার পক্ষপাত একেশ্বরবাদ ভিত্তিক অবতারবাদে। গীতাকারের বরমাল্য এই তত্ত্বের গলায়ই অর্পিত হয়েছে। আমরা ধর্মতত্ত্বের এই আলোচনায় প্রসঙ্গত বিশ্বতত্ত্বে এসে পড়তে বাধ্য হচ্ছি। কারণ, ঈশ্বরতত্ত্বের

৪২। তে পুণ্যমাসাদ্য সুরেন্দ্রলোকমশ্নন্তি
দিব্যান্ দিবি দেবভোগ্যান্। গীতা। ৯। ২০

৪৩। জ্ঞানযোগেন চাপ্যন্যে যজন্তে মামুপাসতে।
একত্বেন পৃথকত্বেন বহুধা বিশ্বতোমুখম্॥ গীতা। ৯। ১৫

৪৪। যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।
মম বর্ত্মানুবর্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ॥ গীতা। ৪। ১১

সঙ্গে বিশ্বতত্ত্ব ঘনিষ্টভাবে জড়িত। বিশ্বতত্ত্ব বিশ্বের প্রকৃতি গঠন প্রভৃতি বিষয় নিয়ে আলোচনা করে। ঈশ্বরতত্ত্ব বিশ্বের স্রষ্টা এবং নিয়ন্ত্রক শক্তির প্রকৃতি আলোচনা করে। সুতরাং বিভিন্ন ঈশ্বরতত্ত্বের যুক্তিযুক্ততা সম্বন্ধে আলোচনা প্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ে এবং সেই সূত্রে বিশ্বতত্ত্বের আলোচনাও এসে পড়ে।

বহু-ঈশ্বরবাদ যুক্তি দ্বারা সমর্থিত হয় না। কারণ, বিশ্ব একই শক্তিদ্বারা নিয়ন্ত্রিত। ভক্তিতত্ত্বের দ্বারাও সমর্থিত হয় না, কারণ একনিষ্ঠ ভক্তি তাঁর জন্যই মনে উদিত হয় যিনি সর্ব-শক্তিমান বিশ্বনিয়ন্তা। সুতরাং তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী থাকতে পারে না। এদিকে বিশুদ্ধ যুক্তির পথে গেলে আমরা পাই সর্বেশ্বর বাদকে, অর্থাৎ সিদ্ধান্ত দাঁড়ায় এই যে বিশ্বকে যে শক্তি নিয়ন্ত্রণ করেন তিনি এক প্রচ্ছন্ন, নৈর্ব্যক্তিক সর্বব্যাপী সত্তা। তিনি বিশ্বের অভ্যন্তরে থেকেই বিশ্বকে নিয়ন্ত্রণ করেন। প্রাচীন উপনিষদের ব্রহ্মবাদ তার সুন্দর উদাহরণ। উপনিষদে ব্রহ্মকে 'আত্মা অন্তর্যামী' বলা হয়েছে। তিনি অন্তর্যামী এই কারণে যে তিনি মানুষের অন্তরে থেকে তাকে নিয়ন্ত্রণ করেন।

কিন্তু এই তত্ত্ব ভক্তিবাদের অনুকূল নয়। কারণ, এই শক্তি নৈর্ব্যক্তিক সত্তারূপে ক্রিয়া করেন। মানুষের হৃদয়বৃত্তি বলে এমন দেবতা চাই যিনি ব্যক্তিত্ববিশিষ্ট হবেন। তা না হলে তাঁর কাছে ভক্তি নিবেদন করা যাবে কি করে? যিনি ভক্তিভাজন এবং যিনি ভক্ত উভয়েই ব্যাক্তিরূপী হওয়া প্রয়োজন। অপর পক্ষে ব্যক্তিত্ব বিশিষ্ট হতে হলেই ভক্ত হতে তাঁকে পৃথক করতে হয়। এই কারণেই হৃদয়বৃত্তির দাবী পূরণের জন্য একেশ্বরবাদের জন্ম হয়। তা বলে ঈশ্বর বিশ্বকে সৃষ্টি ও নিয়ন্ত্রণ করেন, কিন্তু তিনি তা হতে পৃথক ব্যক্তিত্ববিশিষ্ট সত্তা। খৃষ্টধর্ম তার সুন্দর দৃষ্টান্ত। সুতরাং সহজেই বোঝা যায় যে অহৈতুক ভক্তির বিকাশের জন্য

৪৫। পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্,
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥ গীতা। ৪। ৮

গীতায় একেশ্বরবাদকে বিশেষ সম্মান দেখাবার প্রয়োজন ছিল।

গীতা কিন্তু এখানেই থামে নি। তার উদ্দেশ্য মানুষরূপী ঐতিহাসিক পুরুষ কৃষ্ণকে ব্যক্তিরূপী ঈশ্বরের অবতার রূপে প্রতিষ্ঠিত করা। যে ভক্তির আদর্শ গীতায় স্থাপিত হয়েছে, তাতে ভক্তির পাত্ররূপে ঈশ্বর নয়, তাঁর অবতাররূপী কৃষ্ণকে স্থাপন করা হয়েছে। কৃষ্ণের মুখ দিয়েই তাই বলা হয়েছে যে তিনি প্রকৃত পক্ষে ঈশ্বর হলেও সাধুদের পরিত্রাণের জন্য এবং দুষ্টদের দমনের জন্য যুগে যুগে মানবদেহ ধারণ করে সংসারে অবতীর্ণ হন।

গীতার এই উদ্দেশ্য অভাবনীয়ভাবে সফল হয়েছিল। পরবর্তী কালে শ্রীমদ্ ভাগবতে কৃষ্ণকে বহু অবতারের মধ্যে বিশিষ্ট অবতার বলে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছিল। ভাগবতে তাঁকে বলা হয়েছে 'স্বয়ং ভগবান'। অর্থাৎ অন্য অবতার যাঁরা এসেছিলেন তাঁরা আংশিকভাবে ঈশ্বরের শক্তি ধারণ করতেন; কিন্তু কৃষ্ণ ঈশ্বরের সমগ্র শক্তি ধারণ করতেন।

পরবর্তীকালে দেখি এই ধারণার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ঈশ্বরকেই শ্রীকৃষ্ণ বলা হয়েছে। তার প্রমাণ মিলবে বৈষ্ণব ভক্তিবাদী দর্শনগুলিতে। এই দর্শনগুলি ভক্তিবেদান্ত নামে পরিচিত। রামানুজ স্থাপিত বিশিষ্টা দ্বৈতবাদ, নিম্বার্ক স্থাপিত দ্বৈতাদ্বৈত-বাদ, চৈতন্য প্রবর্তিত এবং বলদেব বিদ্যাভূষণ ব্যাখ্যাত অচিন্ত্য ভেদাভেদবাদে ঈশ্বরকে শ্রীকৃষ্ণ বলেই অভিহিত করা হয়েছে। ঈশ্বরের নামের এই রূপান্তর গীতা যে উদ্দেশ্যে রচিত হয়েছিল তার পরিপূর্ণ সাফল্যের সাক্ষ্য বহন করে।

৫

গীতার প্রতিপাদিত সমন্বয়ের দর্শন

গীতা কিন্তু কেবল বিশ্বাসের ভিত্তিতে অবতারতত্ত্বকে প্রতিষ্ঠিত করতে চায় নি; তাকে একটি যুক্তিসম্মত দার্শনিক তত্ত্ব হিসাবে স্থাপন করবার চেষ্টা করেছে। সম্ভবত সেই কারণেই

দ্বাদশ অধ্যায়ের অতিরিক্ত অধ্যায়গুলির সংযোজন করা হয়েছিল। এই খানেই ধর্মগ্রন্থ হিসাবে গীতার বৈশিষ্ট্য। তাই তা অতিরিক্ত ভাবে একখানি মূল্যবান দার্শনিক গ্রন্থ। এই দর্শন সমন্বয়ের দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা প্রভাবান্বিত। আমরা দেখব, এই দর্শনে সাংখ্যের প্রকৃতি-পুরুষ তত্ত্ব এবং তিনটি গুণের প্রভাবে ভোক্তৃ-ভোগ্য সম্বন্ধযুক্ত দৃশ্যমান বিশ্বরূপে তাদের প্রকাশ এই দর্শনের উপাদান রূপে গৃহীত হয়েছে। অতিরিক্তভাবে অবতাররূপী শ্রীকৃষ্ণ তথা ব্যক্তিরূপী ঈশ্বরও এই দর্শনে একটি ভূমিকা পেয়েছেন। এমন কি উপনিষদের ব্রহ্ম বা পরমাত্মাও এই দর্শনে একটি সম্মানের আসন পেয়েছেন। সুতরাং সমন্বয় ও সহাবস্থিতির পথে চিন্তার ফলে এই দর্শন গড়ে উঠেছে।

এই দর্শনটি গড়ে উঠেছে দুটি পর্যায়ে। প্রথমত দেখব, বিশ্বের ব্যাখ্যায় সাংখ্যদর্শনের প্রতিপাদ্য মোটামুটি গ্রহণ করা হয়েছে। এক সর্বব্যাপী মূলসত্তার আশ্রয়ে যেন প্রকৃতি ও পুরুষের যুক্ত প্রভাবে এই বিশ্ব গড়ে উঠেছে। দ্বিতীয় পর্যায়ে দেখব বিভিন্ন শ্রেণীর সত্তার প্রকৃতি বিশ্লেষণ করে দেখান হয়েছে যে এই বিশ্বের মধ্যে যেমন নানা জীব আছে তেমন দেহাশ্রয়ী বহু পুরুষ (সাংখ্যের অর্থে) আছে। অতিরিক্তভাবে তাদের ব্যাপ্ত করে এক সর্বব্যাপী সত্তা (উপনিষদ পরিকল্পিত ব্রহ্ম) আছেন এবং অবতাররূপী শ্রীকৃষ্ণও আছেন। আমরা এখন এই দর্শনটির বিস্তারিত ব্যাখ্যার জন্য প্রস্তুত হয়েছি।

বিশ্বতত্ত্বের ব্যাখ্যা আমরা পাই ত্রয়োদশ অধ্যায়ে। এখানে বিশ্বকে ক্ষেত্ররূপে কল্পনা করা হয়েছে; তার উৎপাদক কারণ হিসাবে পুরুষ ও প্রকৃতির উল্লেখ করা হয়েছে। বিশ্ব হল ক্ষেত্র। ব্রহ্মকে তাই ক্ষেত্রী বলা হয়েছে। দুটি শ্লোকে এই বিশ্লেষণের বিস্তারিত বিবরণ পাই। সোজাসুজি সে দুটি উদ্ধৃত করলে আমাদের আলোচনার সুবিধা হবে ঃ

৪৬। গীতা। ১৩।

মহাভূতান্যহংকারো বুদ্ধির ব্যক্তমেব চ।
ইন্দ্রিয়াণি দশৈকঞ্চ পঞ্চচেন্দ্রিয় গোচরা ঃ॥
ইচ্ছা দ্বেষঃ সুখং দুঃখং সংঘাতশ্চেতনা ধৃতি ঃ।
এতৎ ক্ষেত্রং সমাসেন সবিকারমুদাহৃতম্ ॥

অর্থাৎ, পঞ্চ মহাভূত, অহংকার, বুদ্ধি, অব্যক্ত, একাদশ ইন্দ্রিয় পঞ্চ ইন্দ্রিয় গোচর বিষয়, ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ, দুঃখ, জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের সংঘাতে চেতনা, ধৃতি এবং তাদের বিকার—এই সব জড়িয়ে পাই ক্ষেত্রকে।

উপরে প্রথম শ্লোকে প্রদত্ত তালিকায় দেখা যাবে পরোক্ষভাবে প্রকৃতির উল্লেখ করা হয়েছে। কারণ, সাংখ্যাদর্শন অনুসারে প্রকৃতি পুরুষ হতে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় অব্যক্ত বা অব্যাকৃত অবস্থায় থাকে। পরে পুরুষের সংস্পর্শে আসলে তাঁর মধ্যে একটি বিবর্তনের প্রক্রিয়া শুরু হয় এবং ফলে অহংকার ও বুদ্ধির উদয় হয়। অর্থাৎ অহংবোধ ও বুদ্ধিবিশিষ্ট ভাতৃরূপী সত্তার আবির্ভাব হয়। অপর দিকে জ্ঞেয়রূপী পঞ্চ তন্মান অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পদার্থ উদ্ভূত হয়। তাদের ভোগ করবার এবং জানবার জন্য জ্ঞাতৃরূপী সত্তার পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় ও পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের উৎপত্তি হয় এবং মন ষষ্ঠ জ্ঞানেন্দ্রিয় রূপে তাদের পরিচালিত করে। আমরা সাধারণত বলি এগুলি ত ব্যক্তিসত্তার (পুরুষের) অঙ্গীভূত; কিন্তু সাংখ্যদর্শন মতে এগুলি প্রকৃতিরই অন্তর্ভুক্ত, পুরুষ ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হয়ে ভাবে এগুলি তারই অঙ্গীভূত।

দ্বিতীয় শ্লোকে উল্লিখিত হয়েছে ঃ ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ, দুঃখ, জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের সংঘাত, চেতনা ও ধৃতি। এগুলি ব্যক্তি-আত্মার অনুভূতিবৃত্তি এবং বুদ্ধিবৃত্তিকে অবলম্বন করে যে ক্রিয়া বা গুণগুলি প্রকট হয় তাদের সূচিত করে। সুতরাং এগুলি আমার ধারণায় সাংখ্যদর্শনের অন্যতম মূল তত্ত্ব পুরুষকে সূচিত করে। সাংখ্যদর্শনের ধারণায় পুরুষ সংখ্যায় বহু এবং দেহাশ্রয়ী। অবশ্য পুরুষের বহুত্ব নিয়ে বিতর্ক আছে, কিন্তু প্রাচীন কারিকায় তা

স্বীকৃত। সাংখ্যকারিকায় আছে, 'পুরুষ বহুত্বং স্বীকৃতম্'। ইংরাজি দর্শনের পরিভাষায় আমরা গল্প এই ক্রিয়া এবং গুণগুলি জ্ঞাতারূপী সত্তা বা মানবাত্মা*কে সূচিত করে। এগুলি ব্যক্তি মানুষের হয় অনুভূতি, বা চেতনা সূচিত করে।

সুতরাং উপরের তালিকায় আমরা সাংখ্যদর্শনের এই তত্ত্ব গুলি পাই : পঞ্চমহাভূত, মনসহ একাদশ ইন্দ্রিয়, পঞ্চ তন্মাত্র, পুরুষ, অব্যক্ত অর্থাৎ অব্যাকৃত প্রকৃতি, অহংকার ও বুদ্ধি। সুতরাং সাংখ্যের পঁচিশটি তত্ত্বই এখানে পেয়ে যাচ্ছি। সাংখ্যে বিকাশধর্মী প্রকৃতিকে মহৎ বলে। তাই বহুধা বিভক্ত হবার পূর্বে বুদ্ধি ও অহংকারে রূপান্তরিত হয়। সুতরাং সাংখ্যদর্শনের সব কটি তত্ত্বই এখানে স্থাপিত হয়েছে। দ্বিতীয় শ্লোকে যা স্থাপিত হয়েছে তা পুরুষের নানা গুণ ও অনুভূতি। সাংখ্যদর্শন বলে এগুলির প্রকাশ প্রকৃতির মধ্যেই ঘটে থাকে, তবে পুরুষ সেগুলি নিজের মধ্যে ঘটছে বলে অনুভব করে। এই তথ্যের ভিত্তিতে এগুলি পুরুষের মধ্যেই ঘটছে ধরতে হবে। এই সব নিয়ে ক্ষেত্র সংগঠিত।

সাংখ্যের এতগুলি তত্ত্বের মধ্যে পুরুষ ও প্রকৃতিই মূলতত্ত্ব। অন্য তত্ত্বগুলি সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ গুণের প্রভাবে প্রকৃতির মধ্যেই উদ্ভূত হয়। তারা বিনাশধর্মী। প্রকৃতি ও পুরুষ স্থায়ী তত্ত্ব। এ কথাও গীতায় পরিষ্কার ভাবে বলা হয়েছে। বলা হয়েছে প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়কেই অনাদি বলে জানতে হবে। বাকি তত্ত্বগুলি হল প্রকৃতির তিনটি গুণ ও তাদের বিকার ; তারা প্রকৃতির মধ্যেই উদ্ভূত হয়। (৪৭) এইভাবে সাংখ্যদর্শনে স্থাপিত বিশ্বের ব্যাখ্যাকে এখানে গ্রহণ করা হয়েছে।

বিশ্বতত্ত্বের ব্যাখ্যায় সাংখ্যদর্শনে যা পাই তাকে দর্শনে বহুবাদ বলবে ; কারণ, বহু উপাদানকে নিয়ে সাংখ্য বিশ্বের ব্যাখ্যা

---

* Subject

৪৭। প্রকৃতিং পুরুষঞ্চৈব বিদ্ধ্যনাদী উভাবপি।
বিকারাংশ্চ গুণাংশ্চৈব বিদ্ধি প্রকৃতি সম্ভবান্ ॥ গীতা ১৩। ২০

করেছে। গীতা কিন্তু সোজাসুজি তা গ্রহণ করে নি; তার উপর উপনিষদের ব্রহ্মবাদ আরোপ করে তাকে একবাদে * পরিণত করেছে। উপনিষদের পরিকল্পনায় ব্রহ্ম সর্বব্যাপী; সকলকে ব্যাপ্ত করে, সকলের মধ্যে তিনি প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থান করেন। 'ঈশাবাস্যমিদং সর্বম্', 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'—এই হল তার মর্মকথা। সে তত্ত্বকে গীতা গ্রহণ করে তার সহিত সাংখ্যদর্শনের একটি সামঞ্জস্য স্থাপন করেছে।

তা সাংখ্যের অনুসরণে স্বীকার করে পুরুষের সংস্পর্শে এসে প্রকৃতি নিজের উপর নানা পরিবর্তন আরোপ করে এই বহু দ্বারা বিখণ্ডিত বিচিত্র বিশ্ব গড়ে তোলে। কিন্তু তাই শেষ কথা নয়। বিশ্বের খণ্ডিত ভাবকে অতিক্রম করে যদি খণ্ডগুলিকে একটি বিরাট সত্তার অঙ্গ হিসাবে গ্রহণ করে তাদের একত্ব উপলব্ধি করা যায়, তাহলে গীতার মতে ব্রহ্মকে পাওয়া যায়। (৪৮)

অতিরিক্তভাবে বলা হয়েছে ব্রহ্ম বিশ্বের ঐক্য বিধায়ক এবং প্রকাশক শক্তি। সূর্য যেমন সমগ্র সৌর মণ্ডল প্রকাশ করে, তেমন তিনি সমগ্র বিশ্ব প্রকাশ করেন। (৪৯) এখানে যেন উপনিষদের বাণীরই প্রতিধ্বনি পাই ঃ 'তস্য ভামা সর্বমিদং বিভাতি'। (৫০) আবার তিনি সব কিছু ধারণ করেন বলেই 'ক্ষেত্রী'। সুতরাং সাংখ্য-দর্শনের ব্যাখ্যায় যাকে পাই তা হল 'ক্ষেত্র' এবং যিনি তাকে ধারণ করেন তিনি হলেন ক্ষেত্রী। এই নূতন কথাটি গীতার সংযোজন।

গীতায় পরিকল্পিত ব্রহ্মের প্রকৃতি সম্বন্ধেও ত্রয়োদশ অধ্যায়ের প্রথমে কিছু আলোচনা আছে। সেখানে ব্রহ্মের যে পরিচয় দেওয়া হয়েছে তাতেও উপনিষদের বচনেরই প্রতিধ্বনি পাই। বলা হয়েছে,

---

* পাশ্চাত্য দর্শনের Mouism.

৪৮। যদাভূত পৃথগ্ ভাবমেক স্থমনুপশ্যতি।
তত এব চ বিস্তারং ব্রহ্ম সম্পদ্যতে তদা ॥ গীতা। ১৬। ৩১

৪৯। যথা প্রকাশয়ত্যেকঃ কৃৎস্বমিদং রবিঃ।
ক্ষেত্রং ক্ষেত্রী তথা কৃৎস্বং প্রকাশয়তি ভারত ॥ গীতা। ১৩। ৩৪

৫০। কঠ। ২। ৫। ১৫

ব্রহ্মের সব দিকে হস্ত এবং পদ প্রসারিত, সব দিকে নয়ন, মুখ ও পদ পরিচালিত, বিশ্বের সর্বত্র তাঁর শ্রবণশক্তি ক্রিয়াশীল এবং তিনি সকল বস্তু ব্যাপ্ত করে অবস্থিত। (৫১) এখানেও উপনিষদের বাণীরই প্রতিধ্বনি পাই।

আরও বলা হয়েছে ব্রহ্ম সৎও বটে অসৎও বটে। তিনি অনাদি, তিনি অব্যয়, তাই সৎ। আবার বিনাশধর্মী দৃশ্যমান জগৎও তাঁর আশ্রয়ে প্রকাশিত, তাই সেই ভাবে তিনি অসৎ।

আগেই বলা হয়েছে যে গীতায় একেশ্বরবাদের ভিত্তিতে অবতারবাদকে অবলম্বন করে শ্রীকৃষ্ণকে স্বয়ং ভগবানরূপে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। আপাত দৃষ্টিতে সর্বেশ্বরবাদের সহিত একেশ্বরবাদের একটি বিরোধ এসে পড়ে। সর্বেশ্বরবাদের পরিকল্পনায় সমগ্র বিশ্বকে জড়িয়ে এক প্রচ্ছন্ন নৈর্ব্যক্তিক সত্তা বিশ্বকে ঐক্য মণ্ডিত করেছে। একেশ্বরবাদের প্রকৃতি কিন্তু কিছু স্বতন্ত্র। তার ব্যাখ্যা অনুসারে ঈশ্বর বিশ্বকে সৃষ্টি করেন এবং নিয়ন্ত্রণ করেন, কিন্তু তিনি বিশ্ব হতে পৃথক এবং ব্যক্তিত্ববিশিষ্ট সত্তা। তাই তাঁকে ভক্তির পাত্র হিসাবে গ্রহণ করা যায়।

গীতায় এই বিরোধের সমন্বয় সাধন করা হয়েছে একেশ্বরবাদের ঈশ্বরের (যিনি কৃষ্ণ হতে অভিন্ন) উপর একটি বিশেষ ভূমিকা দিয়ে। তিনি ভক্তের পূজা গ্রহণ করেন আশ্রয় দেন এবং পুরস্কৃত করেন। এই প্রতিপাদ্যটি দুইভাবে আমাদের নিকট স্থাপন করা হয়েছে। তাদের একটি পাই অধিযজ্ঞ তত্ত্বের মধ্যে এবং অপরটি পাই পুরুষোত্তম তত্ত্বের মধ্যে।

প্রথমে অধিযজ্ঞতত্ত্বটির আলোচনা করা যাক। এখানে বিশ্বের ব্যাখ্যায় তিনটি উপাদান বিশ্লেষণ করা হয়েছেঃ অধিভূত, অধি-

---

৫১। সর্বতঃ পাণিপাদং তৎ সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্।
সর্বতঃ শ্রুতি ম ল্লোকে সর্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি। গীতা। ১৩। ১৪
এই শ্লোকের সঙ্গে শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের এই বচনটি তুলনীয়ঃ
বিশ্বতশ্চক্ষুরুত বিশ্বতো মুখো বিশ্বতো বাহু রুত
বিশ্বতস্পাৎ ॥ শ্বেতাশ্বতর। ৩। ৩

দৈবত এবং অধিযজ্ঞ। অধিভূত হল বিশ্বের সেই অংশ যা ক্ষয়শীল, যা প্রবহমান, যাকে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা আমরা দেখি এবং জানি। তাই তাকে 'ক্ষর' বলা হয়েছে। অধিদেবতা হল বিশ্বের যেটি অক্ষর অংশ, যা অব্যয়, বিনাশশীল নয়। অর্থাৎ তাকে ব্রহ্মের সমার্থবোধক বলতে পারি। আর অধিযজ্ঞ হলেন ঈশ্বরের অবতাররূপী শ্রীকৃষ্ণ; কারণ, তিনি যজ্ঞের অধিকারী। প্রাসঙ্গিক শ্লোকটি এই ঃ

অধিভূতং ক্ষরোভাবঃ পুরুষস্বাধি দৈবতম্।
অধিযজ্ঞোঽহমেবান দেহে দেহ ভৃতাং বরঃ॥ (৫২)

অর্থাৎ, অধিভূত হল বিশ্বের ক্ষর অংশ, অধিভূত হলেন (অক্ষর) পুরুষ এবং আমি দেহধারীদের মধ্যে উত্তম হয়ে অধিযজ্ঞ। কৃষ্ণ যজ্ঞের অধিষ্ঠাতৃ-দেবতা। তিনি যজ্ঞকর্মের সুফল বিতরণ করেন।

গীতার চিন্তায় শ্রীকৃষ্ণরূপী ঈশ্বরের কর্মক্ষেত্র কেবল ভক্তির পাত্র হিসাবে পূজা গ্রহণ এবং তার পুরস্কার বিতরণে সীমাবদ্ধ থাকে নি। কোথাও কোথাও একেশ্বরবাদের ঈশ্বরের যে ভূমিকা পরিকল্পিত হয়েছে তাও তাঁর উপর আরোপ করা হয়েছে। যেমন তিনি বিশ্ব বা সৃষ্টি হতে বিচ্ছিন্ন থেকেও তা নিয়ন্ত্রণ করেন। নবম অধ্যায়ে কৃষ্ণ বলেছেন, তিনিই বিশ্বকে সৃষ্টি করেছেন, সকল জীব তাঁরই আশ্রয়ে আছে, অথচ তিনি তাদের মধ্যে অবস্থিত নন। আরও বলা হয়েছে তিনি জীবকে পোষণ করেন, কিন্তু জীবের মধ্যে অবস্থিত নন, জীবের বাহিরে থেকে তিনি তাকে সৃষ্টি করেন। (৫২)

গীতার অন্যতম মূল উদ্দেশ্য যে সর্বেশ্বরবাদের সঙ্গে একেশ্বরবাদের সমন্বয় স্থাপন, তা দ্বিতীয় তত্ত্বটি হতে আরও

৫১। গীতা। ৮। ৪

৫২। ন চ মৎস্থানি ভূতানি পশ্য মে যোগ মৈশ্বরম্।
ভূতভৃন্ন ভূতস্থো মমাত্মা ভূতভাবনঃ॥ গীতা। ৯। ৫

প্রকট হবে। সুতরাং এখন পুরুষোত্তম তত্ত্বের আলোচনা আরম্ভ করা যেতে পারে।

পুরুষোত্তম তত্ত্বে বিশ্বের বিভিন্ন অংশকে চারটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। প্রথমত বিশ্বের সকল চেতনা বিশিষ্ট সত্তাকে পুরুষরূপে কল্পনা করা হয়েছে। এ পুরুষ সাংখ্যদর্শনের পরিকল্পিত পুরুষ নয়। একটি বিশেষ পারিভাষিক অর্থে তা ব্যবহার করা হয়েছে। বিশ্বে যত চৈতন্যধর্মী সত্তা আছে তাদের সাধারণ ভাবে সূচিত করতে এই শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। গীতায় চারশ্রেণীর পুরুষের উল্লেখ করা হয়েছেঃ ক্ষরপুরুষ, অক্ষরপুরুষ, উত্তমপুরুষ এবং পুরুষোত্তম। প্রথম দুটির ব্যাখ্যা একটি শ্লোকেই পাইঃ

দ্বাবিমৌ পুরুষৌলোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এব চ।
ক্ষরঃ সর্বাণি ভূতানি কূটস্থোঽক্ষর উচ্যতে॥ (৫৩)

অর্থাৎ, বিশ্বে দুরকম পুরুষ আছেঃ ক্ষর এবং অক্ষর। ক্ষর হল সকল প্রাণী, আর যিনি অক্ষর তিনি কূটস্থ। এখানে বোঝা যায় ক্ষরপুরুষ অর্থে অবর শ্রেণীর জীব সহ সকল চেতনপ্রাণী। কিন্তু অক্ষরপুরুষ কে তাই নিয়ে বিতর্ক আছে। বিভিন্ন ভাষ্যকার বিভিন্ন ব্যাখ্যা করেছেন। শংকর বলেছেন, কূটস্থ অর্থে বুঝতে হবে 'মায়াদি প্রকারে স্থিত।' রামানুজ বলেছেন তা 'স্বীয়রূপে অবস্থিত মুক্তাত্মাকে' সূচিত করে। শ্রীধর স্বামী বলেছেন, তা কেবল 'ভোক্তারূপী পুরুষ।'

আমার মনে হয় এখানে সরল অভিধা অর্থ গ্রহণ করে এবং গীতার দার্শনিক প্রকৃতির সঙ্গে সঙ্গীত রক্ষা করে তার ব্যাখ্যা করা উচিত। অমর বলে 'কূটস্থের' অর্থ হল 'যিনি নিত্যকাল স্থায়ী এবং রূপ পরিবর্তন করেন না।' (৫৪) আমার মনে হয় এই অক্ষরপুরুষ হল সাংখ্যদর্শন পরিকল্পিত পুরুষ, অর্থাৎ মানুষের আত্মা। তা অনাদি স্থায়ী সত্তা এবং তার রূপ পরিবর্তিত হয় না।

৫৩। গীতা। ১৫। ১৬

৫৪। একরূপতয়া যঃ কালব্যাপী স ইত্যমরঃ

তারপর আসেন উত্তমপুরুষ। তাঁর ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে এই বলে ঃ উত্তমপুরুষ হলেন স্বতন্ত্র, তাঁকে পরমাত্মা বলা হয়। তিনি অব্যয় ঈশ্বর, তিন লোককে ব্যাপ্ত করে তিনি তাদের ধারণ করেন। (৫৫) এই ব্যাখ্যা হতেই অর্থ স্পষ্ট হয়ে যায়। তিনি সকল লোককে ব্যাপ্ত করে আছেন এবং সবকিছু ধারণ করে আছেন। কাজেই তিনি উপনিষদ পরিকল্পিত ব্রহ্মের সমার্থবোধক। তাঁর অপর নাম আত্মা, জীবাত্মা হতে পৃথক করবার জন্য তাঁকে পরমাত্মা বলা হয়। এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে বলে মনে হয় না।

চতুর্থ পুরুষ হলেন পুরুষোত্তম। তাঁর ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে এই বলে ঃ যেহেতু আমি ক্ষর পুরুষের উপরে এবং অক্ষরপুরুষ হতে উত্তম, আমি সংসারে ও বেদে পুরুষোত্তম বলে প্রচারিত। (৫৬)

বেদে পুরুষোত্তমের উল্লেখ আছে বলে মনে হয় না, তবে শ্রীকৃষ্ণ যে পুরুষোত্তম বলে খ্যাত তা আমাদের জানা আছে। তিনি ক্ষরকে অতিক্রম করেন, তিনি অক্ষরপুরুষ অর্থাৎ সাধারণ মানুষ হতে উৎকৃষ্ট। কাজেই তিনি পুরুষোত্তম। এইভাবে এখানে উপনিষদের সর্বেশ্বরবাদ ভিত্তিক ব্রহ্ম এবং একেশ্বরবাদ ভিত্তিক অবতারবাদ এক সঙ্গে স্থান পেয়েছেন।

এখানে গীতার মূল প্রতিপাদ্য যে ঐতিহাসিক পুরুষ শ্রীকৃষ্ণকে বিষ্ণুর অবতাররূপে স্থাপন করা এই প্রতিপাদ্যের সপক্ষে কিছু যুক্তি স্থাপন করা যেতে পারে। এই উদ্দেশ্য বিশেষ ভাবে প্রকট হয়েছে দশম ও একাদশ অধ্যায়ে। উপরে দেখা গেছে তিনটি অক্ষর পুরুষের স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে ঃ মানুষের আত্মা বা ব্যক্তিমানুষ (যা হল সাংখ্যদর্শনের পুরুষ); দ্বিতীয়, সর্বব্যাপী প্রচ্ছন্নরূপে

৫৫। উত্তমঃ পুরুষস্ত্বন্যঃ পরমাত্মেতি উদাহৃত ঃ।
যো লোকত্রয়মাবিশ্য বিভর্ত্ত্যব্যয় ঈশ্বর ঃ। গীতা। ১৫। ১৭

৫৬। যস্মাৎ ক্ষরমতীতোহ হমক্ষরাদপি চোত্তম ঃ।
ততোহস্মি লোকে বেদেচ প্রথিতঃ পুরুষোত্তম ঃ।। গীতা। ১৫।১৮

বর্তমান ব্রহ্ম যাঁকে উত্তমপুরুষ বলা হয়েছে ; এবং পুরুষোত্তম রূপে শ্রীকৃষ্ণ। সুতরাং এখানে ঈশ্বর সম্বন্ধে তিনটি মূলতত্ত্ব এসে পড়ে। অক্ষর ব্রহ্ম প্রকৃতির নিয়ন্তা ঈশ্বর (এখানে চতুর্ভুজ বিষ্ণুরূপে কল্পিত) এবং শেষে বিষ্ণুর অবতার রূপী পুরুষোত্তম বেশী মানব দেহধারী শ্রীকৃষ্ণ। এই অবতাররূপের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করতে দেখান হয়েছে কৃষ্ণ একাধারে এই তিনটি তত্ত্বও বটেন। বিশ্বের অন্তর্নিহিত ধারকতত্ত্ব হিসাবে তিনি ব্রহ্ম, চতুর্ভুজ বিষ্ণুরূপে তিনি বিশ্বের নিয়ন্তা এবং ব্যক্তিত্ববিশিষ্ট ঈশ্বর এবং মানবদেহধারী শ্রীকৃষ্ণরূপে তিনি পুরুষোত্তম। এবার গীতার বচন উদ্ধৃত করে উপরের প্রতিপাদ্যের সমর্থক বাণী স্থাপন করা হবে।

দশম অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণের বিভূতির ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। তাতে দেখান হয়েছে বিশ্বে যা কিছু বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে চূড়ান্ত প্রকাশ তার মধ্যেই শ্রীকৃষ্ণ বিরাজিত ; সকল শক্তির মধ্যে তিনি প্রচ্ছন্ন ভাবে অধিষ্ঠিত। এইভাবে তাঁর সর্বব্যাপিত্ব সূচিত হয়েছে। তার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায় এই অধ্যায়ের আরম্ভে। সেখানে অর্জুন তাঁকে নিজ বিভূতির বিষয় বলতে অনুরোধ করে যা বলেছেন তা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি বলেছেন ঃ

পরং ব্রহ্ম পরং ধাম পবিত্রং পরমং ভবান্।
পুরুষং শাশ্বতং দিব্যমাদিদেবং বিভুম্॥
আথ্যস্তাম্ ঋষয়ঃ সর্বে দেবর্ষি নারদস্তথা। (৫৭)

অর্থাৎ ঋষিগণ এবং দেবর্ষি নারদ আপনাকে পরম ব্রহ্ম, পরম ধাম, পবিত্র এবং পরম পুরুষ বিষ্ণু ও দিব্য আদিদেব রূপে বর্ণনা করেছেন।

কৃষ্ণ যে তিনটি তত্ত্বেই প্রকট তার একাদশ অধ্যায়ে উল্লেখ আছে। কৃষ্ণ অর্জুনকে যখন তাঁর বিশ্বরূপ দেখান তখন অর্জুন দুটি তত্ত্ব একসঙ্গে আবিষ্কার করলেন। প্রথম তত্ত্ব তাঁর সর্ব-

---

৫৭। গীতা ১০। ১২-১৩ শ্লোক দ্রষ্টব্য

ব্যাপী বিশ্বরূপ অর্থাৎ ব্রহ্মরূপ। (৫৮) সেখানে তিনি সর্বতঃ বিস্তৃত, অনন্ত; তাঁর আদি মধ্য ও অন্ত খুঁজে পাওয়া যায় না। একই সঙ্গে অর্জুন তাঁর মধ্যে আবিষ্কার করলেন তাঁর চক্র গদাধারী কিরীটী রূপ; অর্থাৎ ঈশ্বররূপী বিষ্ণুকে আবিষ্কার করলেন। (৫৯) সেখানে তাঁর তেজোরাশি সর্বতঃ দীপ্তিমান, সেখানে তাঁর প্রভা অনলাকদ্যুতি।

এই অধ্যায়ের শেষে অর্জুনের অনুরোধে কৃষ্ণ নিজের চতুর্ভুজ রূপ আবার পৃথকভাবে দেখালেন। (৬০) তারপর তিনি আবার পার্থসারথি রূপ গ্রহণ করলেন। সুতরাং যিনি মানবদেহধারী কৃষ্ণ তিনিই অবতাররূপী পুরুষোত্তম, তিনিই পুরাণের পরিকল্পিত বিষ্ণুরূপী ঈশ্বর এবং সর্বব্যাপী বিশ্বের ধারকরূপে তিনিই বিশ্বরূপ ব্রহ্ম। এইভাবে গীতায় কৃষ্ণকে উচ্চতম সম্মানে ভূষিত করা হয়েছে।

৫

গীতার মুক্তিতত্ত্ব

আমাদের দেশে জন্মবন্ধন হতে মুক্তিকে পুরুষার্থ, নিঃশ্রেয়স্, অপবর্গ প্রভৃতি নামে চিহ্নিত করা হয়েছে। তাকে মুক্তিতত্ত্বও বলতে পারি; কারণ, তার লক্ষ্য হল জন্মবন্ধনকে ছিন্ন করা। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে ব্যক্তিসত্তা বা জীবাত্মার বিলোপ ঘটে। বিভিন্ন ভারতীয় দর্শনে সাধারণত জন্মান্তর বন্ধন হতে মুক্তির পর যে অবস্থা কল্পনা করা হয় তাতে জীবাত্মার মুক্তির উত্তর অস্তিত্ব সাধারণত স্বীকৃত হয়ে থাকে। তার দুটি ক্ষেত্রে মাত্র ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা যায়। প্রাচীন উপনিষদে মুক্তির প্রশ্ন বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করেনি; কারণ, তখন জন্মান্তর আছে কিনা এ বিষয় কোনো বিশ্বাস গড়ে ওঠে নি। জন্মান্তর সম্বন্ধে নানা জল্পনা কল্পনা আছে মাত্র। তবু দেখা যায় একটি তত্ত্ব

৫৮। গীতা। ১১। ১৬ ৫৯। গীতা। ১১। ১৭
৬০। গীতা। ১১। ৪৫

স্থাপিত হয়েছে যে হৃদয়ের কামনাগুলি যদি পরিত্যাগ করা যায় তা হলে ব্রহ্মপ্রাপ্তি ঘটে। অর্থাৎ ব্রহ্মের মধ্যে ব্যক্তিসত্তা লয় হয়ে যায়। এই প্রতিপাদ্য সমর্থন করে এমন একটি বাণী বৃহদারণ্যকে ও কঠ উপনিষদে পাওয়া যায়। (৬১) দ্বিতীয় ব্যতিক্রম হল গৌতম বুদ্ধের দর্শন। তিনি বলেন জন্মবন্ধন খণ্ডিত হলে মানুষের নির্বাণ হয়।

অন্য দর্শনগুলিতে জন্মবন্ধন খন্ডন হবার পরও মুক্তি-উত্তর অস্তিত্ব স্বীকার করা হয়। তবে বিভিন্ন দর্শনে মুক্ত অবস্থার প্রকৃতি সম্বন্ধে বিভিন্ন ধারণা স্থাপন করা হয়েছে। সাংখ্য-যোগ দর্শনের মতে প্রকৃতির সহিত পুরুষের যোগ ছিন্ন হলে পুরুষ স্বরূপে ফিরে যায়। ন্যায়-বৈশেষিক দর্শন অনুসারে জীবাত্মা নিত্য; কাজেই মুক্ত অবস্থায় তার অস্তিত্ব অক্ষুণ্ণ থাকে। তখন তার 'দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি ঘটে।' অদ্বৈত বেদান্তের মতে মুক্তির পর জীবাত্মার ব্রহ্মে লয় প্রাপ্তি ঘটে না, আত্মা বিধেয় অবস্থা ভোগ করে। জৈন দর্শন অনুসারে মুক্তির পরে জীবাত্মা 'কৈবল্য রূপ' পায়। পৌরাণিক হিন্দুধর্মের ধারণা অনুসারে জন্মবন্ধন খন্ডন হবার পর জীবাত্মার ঈশ্বরের সহিত সালোক্য বা সামীপ্য ঘটে।

গীতায় এই মনোভাবের ব্যতিক্রম লক্ষিত হয়। তা বলে জন্ম বন্ধন হতে মুক্তি ঘটলে জীবাত্মা ব্রহ্মে লয় প্রাপ্ত হয়। সুতরাং এখানে তা প্রাচীন উপনিষদের মত অনুসরণ করে। এই ধরনের মত গড়ে ওঠা সম্ভব হয়েছিল তার সমর্থিত বাসনাহীন সাধনার দৃষ্টিভঙ্গির প্রভাবে। ধর্ম সাধনায় তা আর্ত ও অর্থার্থীর দৃষ্টি ভঙ্গি পরিহার করে সকল কামনা বর্জন করতে উপদেশ দিয়েছে

৬১। যদা সর্বে প্রমুচ্যন্তে কামা যে হস্য হৃদি স্থিতা ॥
অথ মর্তোহ মৃতো ভবত্যত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে ॥
বৃহদারণ্যক ৪।৪।৭ কঠ ২।৬।১৪

বলেই পরিণতিতে ব্রহ্মে বিলয় প্রাপ্তিকেই পুরুষার্থ বলে গ্রহণ করতে দ্বিধাবোধ করেনি। এই লক্ষলাভের মার্গও সেখানে বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং তাকে গীতার মুক্তিতত্ত্ব বলতে পারি।

এই মুক্তিমার্গ স্বার্থ প্রণোদিত কামনাভোগের জীবন বর্জন করে, কর্মফলে উদাসীন থেকে কর্তব্যকর্ম সম্পাদন দিয়ে শুরু। কর্মসন্ন্যাস নয়, কর্মফল সন্ন্যাসই হল এই সাধনমার্গের প্রথম ধাপ। দ্বিতীয় পদক্ষেপ হল শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অহৈতুক একনিষ্ঠ ভক্তি। কর্মফল শ্রীকৃষ্ণকেই অর্পণ করবার উপদেশ দেওয়া হয়েছে। এই ব্যাবস্থা নিষ্কাম কর্মসাধনার সহায়ক। তৃতীয় অবস্থায় ভক্তিদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি আকর্ষণ করতে পারলে বলা হয়েছে তিনি ভক্তের মনে জ্ঞান সঞ্চার করেন। এই তত্ত্বজ্ঞান লাভ হলে চতুর্থ অবস্থায় মুক্তি লাভ হয় এবং মৃত্যুর পর জন্মবন্ধন হতে মুক্ত হয়ে জীবাত্মা ব্রহ্মে বিলীন হয়। এই হল গীতার প্রতিপাদিত মুক্তির মার্গ এবং প্রকৃতি।

এইবার আমাদের এই প্রতিপাদ্য গীতা হতে উদ্ধৃত সমর্থক বাণী উদ্ধৃত করে প্রতিষ্ঠিত করতে চেষ্টা করব। প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে কর্মত্যাগ নয় কর্মফল ত্যাগ করতে বলা হয়েছে। কর্মফল সন্ন্যাস যে উৎকৃষ্টতর সে বিষয় গীতায় সুস্পষ্ট উক্তি আছে। বলা হয়েছে, এই দুয়ের মধ্যে কর্মসন্ন্যাস হতে কর্মযোগ, অর্থাৎ কর্মফল সন্ন্যাসের উৎকর্ষ বেশী। (৬২)

কর্তব্য কর্মের ফল শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ করলে নিষ্কাম কর্মযোগ সাধনা সহজসাধ্য হয়। আবার ঈশ্বরগত প্রাণ হলে কামনা ত্যাগ করাও সহজ হয়। তাই শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে উপদেশ দিয়েছেন তাঁর উপর সকল কর্মফল অর্পণ করে কর্মফলে উদাসীন থেকে কর্ম করতে। (৬৩)

৬২। তয়োস্তু কর্মসন্ন্যাসাৎ কর্মযোগো বিশিষ্যতে। গীতা। ৫। ২

৬৩। ময়ি সর্বাণি কর্মাণি সন্ন্যস্যাধ্যাত্ম চেতসা।
নিরাশী র্নির্মমো ভূত্ব যুধ্যস্ব বিগতজ্বরঃ॥ গীতা ৬। ৩০

শ্রীকৃষ্ণকে একনিষ্ঠ ভক্তি এবং কর্মফল সন্ন্যাস দ্বারা সন্তুষ্ট করলে, তিনি অনুকম্পা হেতু ভক্তের অজ্ঞান তিমির দূর করে দেন এবং তত্ত্বজ্ঞান সঞ্চার করেন। প্রাসঙ্গিক শ্লোকটি বলেঃ "তাদের প্রতি অনুকম্পা বশত অজ্ঞান হেতু তাদের মনে যে অন্ধকার সঞ্চিত হয়েছে তাকে দূর করি, তাদের অন্তরস্থ জ্ঞানদীপ তখন ভাস্বর হয়ে ওঠে।" (৬৪)

সুতরাং ভক্তির পথেই ঈশ্বরের কৃপায় তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয়—এই হল গীতার প্রতিপাদ্য। তত্ত্বজ্ঞান লাভ হলে ভক্ত বুঝতে পারে শ্রীকৃষ্ণের প্রকৃতি কিরূপ। তিনি যে একাধারে ব্রহ্ম, বিষ্ণুরূপী ঈশ্বর এবং অবতাররূপী শ্রীকৃষ্ণ তা ভক্তের হৃদয়ঙ্গম হয়। ফলে মুক্তিলাভ করে ভক্ত তাঁর মধ্যেই প্রবেশ লাভ করে। প্রাসঙ্গিক শ্লোকটির অনুবাদ এই দাঁড়ায়ঃ "ভক্তি দ্বারা আমাকে জানে, বস্তুত আমি কে এবং আমার মহত্ত্ব কতখানি তা বোঝে। তারপর আমার মূলপ্রকৃতির পরিচয় লাভ করে আমার মধ্যে প্রবেশ করে।" (৬৫)

শ্রীকৃষ্ণে প্রবেশ করার অর্থ যে ব্রহ্মে লয়প্রাপ্তি তা গীতার অন্যস্থানে স্পষ্ট বলা হয়েছে। প্রাসঙ্গিক শ্লোকটির অনুবাদ এইঃ "আমাকে যে একনিষ্ঠ ভাবে ভক্তিযোগে সেবা করে সে তিনটি গুণের উর্দ্ধে উঠে ব্রহ্মের পদপ্রাপ্ত হয়। (৬৬) এতেও যদি মনে নিশ্চিত হওয়া শক্ত হয় যা গীতার মুক্তি হল ব্রহ্মে লীন হওয়া, তা হলে আরও একটি শ্লোকের উল্লেখ করা যেতে পারে। এখানে বলা

৬৪। তেষামেবানুকম্পার্থমহমজ্ঞানজং তমঃ।
নাশয়াম্যাত্মভাবস্থো জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা।। গীতা। ১০। ১১

৬৫। ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।
ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্।। গীতা।১৮।৫৫

৬৬। মাং চ যোহব্যাভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে।
স গুণেনে্ সমতী তৈভ্যান্ ব্রহ্মভূয়য়ে কল্পতে।। গীতা। ১৪।২৬

হয়েছে নিষ্কাম কর্মসাধনার ফলে যে শান্তি হয় তাকে 'ব্রাহ্মী স্থিতি' বলা যেতে পারে। তা গৌতম বুদ্ধ পরিকল্পিত 'ব্রহ্ম-বিহারের' সহিত তুলনীয়। "যিনি এই অবস্থায় উত্তীর্ণ তাঁর সম্বন্ধে বলা হয়েছে : হে পার্থ, এই ব্রাহ্মী স্থিতি এই সাধকের মন অধিকার করলে আর তা হতে ভ্রষ্ট হয় না ; সেই সাধক এখানে অবস্থান করে মৃত্যুকালে ব্রহ্ম নির্বাণ লাভ করেন।" (৬৭)

এও বলা যেতে পারে যে পরিণতিতে নিষ্কাম কর্মযোগ এবং ভক্তিযোগের সাহায্যে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করলে দুরকম ফলপ্রাপ্তির কথা বলা হয়েছে। অষ্টাদশ অধ্যায়ের ৫০ সংখ্যক শ্লোকে বলা হয়েছে সাধক কৃষ্ণের মধ্যে প্রবেশ করেন, আবার চতুর্দশ অধ্যায়ের ২৬ সংখ্যক শ্লোকে বলা হয়েছে তিনি ব্রহ্মত্বপ্রাপ্ত হন। কিন্তু এই অসঙ্গতির একটা সমাধান আছে। কৃষ্ণ বলছেন তিনি তিন তত্ত্বে আছেন : ব্রহ্মতত্ত্ব, ঈশ্বরতত্ত্ব এবং অবতারতত্ত্বরূপে পুরুষোত্তম তত্ত্বে। প্রশ্ন হল, এদের কোন তত্ত্বে সাধক বিলীন হন। যুক্তি দ্বারা বোঝা যায় যে অবতার তত্ত্বে নয় ; কারণ তা ঐতিহাসিক রূপ। ঈশ্বরতত্ত্বে নয় ; কারণ ঈশ্বর ভক্ত হতে পৃথক। কাজেই তা ব্রহ্মতত্ত্ব হতে বাধ্য। এই কথাই শেষের উদ্ধৃত শ্লোকে স্পষ্ট ভাবে বলা হয়েছে। এখানে স্পষ্টই বলা হয়েছে, ভক্ত 'ব্রহ্ম নির্বাণ-মৃচ্ছতি', অর্থাৎ ব্রহ্মে নির্বাণ প্রাপ্ত হয়। 'ঋ' ধাতুর অর্থ হল যাওয়া, পেঁছান।

মানুষ নিজেকে সব থেকে বেশী ভালবাসে। তাই মৃত্যুর পরে সে একেবারে বিলীন হয়ে যায় ভাবতে পারে না। সেই কারণে বেশীর ভাগ দর্শনেই মুক্ত অবস্থাতেও জীবাত্মার অস্তিত্ব থাকে কল্পনা করা হয়। গীতায় তা হয়নি ; কারণ, তা একটি অতি উচ্চ আদর্শ দ্বারা অনুপ্রাণিত। স্বার্থবোধ ও অহমিকাবোধকে নির্মূল করতে তা বিশেষভাবে উপদেশ দিয়েছে। কামনা নিয়ে

৬৭। এষা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ পার্থ নৈনাং প্রাপ্য বিমুহ্যতি।
স্থিত্বা স্যামন্তকালেহপি ব্রহ্ম নির্বাণ মৃচ্ছতি ॥ গীতা। ২। ৭২

উপাসনা করাকে তা ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিপ্রণোদিত বলে নিন্দা করেছে। এই প্রসঙ্গে বিখ্যাত মনীষী এলবার্ট আইনস্টাইনের একটি উক্তি উদ্ধৃত করা যেতে পারে। তিনি বলেছেন ঃ "যারা দুর্বল চিত্ত তারাই হয় ভয়ে, না হয় তুচ্ছ অহমিকাবোধ হেতু মরণোত্তর অস্তিত্বে বিশ্বাস করে।" (৬৮) বিশ্বের শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক গীতার সমর্থন করেন।

৬৮। Feeble souls harbour such thoughts (survival after death) through fear or ridiculous egotism.

New York Times, Obituary 19.4. 1955 issue

একাদশ অধ্যায়

মহাভারতের মর্মকথা

১

ধর্ম ও মন্যুর সংঘাত : যুধিষ্ঠির বনাম দুর্যোধন

মহাভারতের আদিপর্বের অনুক্রমণিকায় দুটি মূল্যবান মন্তব্য পাওয়া যায়। তাই দিয়ে এই অধ্যায়ের আলোচনা আরম্ভ হতে পারে। প্রথম মন্তব্যে বলা হয়েছে 'দুর্যোধন হলেন মন্যুময় মহাবৃক্ষ' এবং 'যুধিষ্ঠির ধর্মময় মহাবৃক্ষ'। অর্থাৎ মহাভারতের মূল কাহিনী হল মন্যু বা ঈর্ষার সঙ্গে ধর্ম বা ন্যায়সঙ্গত অধিকারের সংঘর্ষ। দ্বিতীয় মন্তব্য হল, তাতে অনেক মহৎ বিষয় আলোচিত হয়ে তা ভারি হয়ে উঠেছে বলে তার নাম মহাভারত হয়েছে। 'মহত্ত্বাদ্ ভারত্বাচ্চ মহাভারতমুচ্যতে।' এই দুটি মন্তব্য কতখানি সমর্থনযোগ্য তা আমরা বিচার করে দেখতে পারি।

প্রথম প্রশ্ন হল দুর্যোধন সত্যই ঈর্ষার প্রতীক কিনা এবং যুধিষ্ঠির ন্যায়ধর্মের প্রতীক কিনা। তাঁদের বিষয় ভাল করে বুঝতে হলে যে পরিবেশে মহাভারতের এই দুই মূলচরিত্র স্থাপিত হয়েছিলেন তার সহিত কিছু পরিচয় হওয়া প্রয়োজন। ভাগ্যের এমন বিড়ম্বনা যে দুর্যোধন এমন পরিস্থিতিতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন যাতে যুধিষ্ঠিরের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ হওয়া তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক। বিচিত্রবীর্যের ক্ষেত্রজ পুত্ররূপে কুরুবংশে দুই সন্তান জন্মালেন। ধৃতরাষ্ট্র জ্যেষ্ঠ ; কিন্তু জন্মান্ধ বলে রাজ্য পেলেন না, অনুজ পাণ্ডু রাজপদে অধিষ্ঠিত হলেন। ভাগ্য আরও বাধা সৃষ্টি করল। দুর্যোধনের আগেই যুধিষ্ঠির জন্মগ্রহণ করলেন। ফলে ভবিষ্যতে রাজপদের উত্তরাধিকারী হিসাবে তাঁর পথে বাধা সৃষ্টি হল। তারপর পাণ্ডু হঠাৎ অকালে মারা গেলেন। উভয় ভ্রাতার সন্তানগন নিতান্তই শিশু হওয়ায় ধৃতরাষ্ট্র রাজ্যভার গ্রহণ করলেন।

দেখা যায় দুর্যোধনের পাণ্ডবগণের প্রতি বিদ্বেষ ভাব শৈশব হতেই সক্রিয় ছিল। পিতার মৃত্যুর পর পাণ্ডবগণ যখন হস্তিনাপুরে কৌরবদের সহিত একসঙ্গে বাস করত তখন সকলে মিলে একবার গঙ্গার তীরে প্রমাণকোটি নামে জলক্রীড়ার উদ্দেশ্যে নির্মিত স্থানে জলক্রীড়া করতে গিয়েছিল। সেখানে দুর্যোধন ভোজন বিলাসী ভীমকে বিষ মিশ্রিত খাবার খাইয়ে নিস্তেজ করে দিয়ে লতা দিয়ে হাত-পা বেঁধে জলে ভাসিয়ে দিয়েছিলেন। স্পষ্টই বোঝা যায় ভীমকে তিনি হত্যা করতে চেয়েছিলেন। ভাগ্যক্রমে নাগরাজ বাসুকীর সুশ্রুষায় তিনি সুস্থ হয়ে ফিরে এলেন। (১)

তারপর দ্রোণের তত্ত্বাবধানে একশত পাঁচ ভাই একসঙ্গে অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা করলেন। অস্ত্রবিদ্যা আয়ত্ত হবার পর শিষ্যদের পারদর্শিতা দেখাবার উদ্দেশ্যে দ্রোণাচার্য একটি প্রদর্শনী যুদ্ধক্রীড়ার ব্যবস্থা করেন। সেখানে অর্জুনের ধনুর্বিদ্যায় অসাধারণ অধিকার দেখে সকলে মুগ্ধ হল। এমন সময় নাটকীয় ভাবে কর্ণ সেই প্রেক্ষাক্ষেত্রে প্রবেশ করে অর্জুনকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করলেন। তখন কৃপাচার্য এসে বাধা দিলেন। তিনি বললেন, অখ্যাত কুলের মানুষের সঙ্গে রাজবংশের ছেলে যুদ্ধ করে না। আগে কর্ণ তাঁর পরিচয় দিন। (২) কর্ণ তখন লজ্জা পেলেন, পরিচয় দেবার মত তাঁর কিছু ছিল না। দুর্যোধন তখন এক মহা সুযোগ পেয়ে গেলেন কর্ণের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপনের। তিনি সঙ্গে সঙ্গে অঙ্গ দেশের রাজপদে তাঁকে অভিষিক্ত করে অর্জুনের সমকক্ষ এক যোদ্ধার সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন করে নিলেন। (৩)

তারপর দেখি ধৃতরাষ্ট্র কর্তব্য বুদ্ধি প্রণোদিত হয়ে যুধিষ্ঠিরকে যুবরাজ পদে অধিষ্ঠিত করলেন। যুধিষ্ঠিরের এই সৌভাগ্য দুর্যোধনের সহ্য হল না। তিনি বিরোচনের সাহায্যে এক

১। আদিপর্ব। ২৭। ১২৬

২। আদিপর্ব। ৩৩। ১৩৩

৩। আদিপর্ব। ৩৬-৩৭ অধ্যায় দ্রষ্টব্য

চক্রান্ত করলেন। উদ্দেশ্য, পাণ্ডবদের মাতা কুন্তীসহ হত্যা করা। বারণাবতে একটি সুদৃশ্য গৃহ নির্মাণ করা হল; কিন্তু তার উপাদান জতু, যা সহজেই জ্বলে। ঠিক হল সেখানে পাণ্ডবদের বাস করতে পাঠাতে হবে এবং তাতে আগুন লাগিয়ে পাণ্ডবদের পুড়িয়ে মারতে হবে। কিন্তু পাণ্ডবরা ত এমনি যেতে চাইবে না। তাই তিনি পিতা ধৃতরাষ্ট্রকে অনুরোধ করলেন পাণ্ডবদের মাতা সহ বারণাবতে গিয়ে নূতন নির্মিত গৃহে বাস করতে নির্দেশ দিতে। (৪)

তাই হল, কিন্তু জতুর গন্ধ পেয়ে দুর্যোধনের তাঁদের সেখানে বাস করতে পাঠাবার উদ্দেশ্য কি তা পাণ্ডবরা ধরে ফেললেন। তাঁরা দেখলেন, দুর্যোধনের বৈরিতা এত তীব্র যে তাঁদের জীবনই বিপন্ন হতে চলেছে। তাই যুধিষ্ঠির ঠিক করলেন সুড়ঙ্গ কেটে বনে পালিয়ে গিয়ে তাঁরা আত্মগোপন করবেন। এই উদ্দেশ্যে তাঁরা জতুগৃহে রাত্রে আকস্মিকভাবে আগুন লাগিয়ে বিরোচন এবং পাঁচ পুত্র সহ এক মাতাকে মদ্যপান হেতু অচৈতন্য অবস্থায় ফেলে রেখে পালিয়ে গেলেন। (৫) অগ্নিদগ্ধ হয়ে তাদের মৃত্যু ঘটলে লোকে ভাবল পাণ্ডবরা অগ্নিদগ্ধ হয়ে মাতা সহ মারা গেছেন। দুর্যোধন নিশ্চিন্ত হলেন। ওদিকে পাণ্ডবদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হল। তাঁরা আত্মগোপনকে আরও নিশ্চিত করবার উদ্দেশ্যে ব্রাহ্মণের বেশে অজ্ঞাতবাস শুরু করলেন।

তারপর আকস্মিকভাবে ভাগ্যের আনুকূল্যে পাণ্ডবদের অবস্থার পরিবর্তন ঘটল। পাঞ্চাল দেশের রাজা দ্রুপদ তাঁর কন্যা দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর সভার আয়োজন করলেন। ব্যবস্থা হল, যে পাণিপ্রার্থী একটি দুঃসাধ্য লক্ষ্য ভেদ করবেন তাঁকেই দ্রৌপদী বরণ করবেন। সেই সভায় কৌতূহলের আকর্ষণে ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে পঞ্চপাণ্ডব উপস্থিত ছিলেন। কোনও ক্ষত্রিয় লক্ষ্যভেদ করতে পারলেন না।

৪। আদিপর্ব। ২৩। ১৪২

৫। আদিকাণ্ড। ৪। ১৪৮

তখন কর্ণ এগিয়ে এলেন ; কিন্তু দ্রৌপদী তাঁকে অপমান করে ফিরিয়ে দিলেন। তিনি বললেন, আমি সূতপুত্রকে বরণ করব না। (৬) শেষে ব্রাহ্মণবেশী অর্জুন লক্ষ্য ভেদ করে দ্রৌপদীকে লাভ করলেন। মাতা কুন্তীর একটি ভ্রান্তি হেতু পাঁচ ভ্রাতা দ্রৌপদীর পাণিগ্রহণের প্রস্তাব গ্রহণ করতে বাধ্য হলেন। দীর্ঘ আলাপ-আলোচনার পর দ্রুপদ সেই প্রস্তাবে সম্মতি দিলেন। দ্রৌপদী পঞ্চপতি লাভ করলেন।

এই নূতন ঘটনা পাণ্ডবদের জন্য অনুকূল পরিবেশ রচনা করল। তাঁরা এখন আর সহায়সম্বলহীন রইলেন না। এক পরাক্রমশালী রাজার ঘনিষ্ঠ আত্মীয় হয়ে বসলেন। ধৃতরাষ্ট্র তখন বংশের উভয় শাখার কল্যাণের জন্য একটি সন্তোষজনক ব্যবস্থা করলেন। তিনি রাজ্যের খাণ্ডবপ্রস্থ অংশ যুধিষ্ঠিরকে দিয়ে তাঁকে তার রাজপদে অধিষ্ঠিত করলেন। নূতন রাজ্যের রাজধানী স্থাপিত হল ইন্দ্রপ্রস্থে। স্থায়ী শান্তির জন্য তাই ছিল উপযুক্ত ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থাটি পিতামহ ভীষ্মের অনুরোধে গৃহীত হয়েছিল।

এদিকে খাণ্ডবপ্রস্থের রাজপদে যুধিষ্ঠির অধিষ্ঠিত হয়ে অতি অল্প সময়ের মধ্যে প্রচুর খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করলেন। তার-পর নারদের উপদেশে তাঁরা রাজসূয় যজ্ঞের ব্যবস্থা করলেন। ময়দানবের তত্ত্বাবধানে যে নূতন প্রাসাদ নির্মিত হল তা স্ফটিক দিয়ে বাঁধান। তার চোখ-ঝলসান রূপ। রাজসূয়যজ্ঞের সভায় সকল রাজা আমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন, বহু বিশিষ্ট মানুষ অতিথি হয়ে এলেন। দুর্যোধনও ঘনিষ্ঠ আত্মীয় হিসাবে একজন বিশিষ্ট অতিথি। তিনি সভায় যাবার পথে স্ফটিকের সঙ্গে জলাধারের প্রভেদ বুঝতে না পেরে হাস্যকর আচরণ করে বসে ক্ষুব্ধ হলেন। পাণ্ডবদের খ্যাতি প্রতিপত্তি ও ঐশ্বর্য তাঁর অসহনীয় হয়ে উঠল।

৬। নাহং বরয়ামি সূতম্‌। ১। ১৮৭। ২৩

৭। সভাপর্ব। ৪৭। ৩৪

ঈর্ষার দহনে ক্লিষ্ট হয়ে তিনি স্পষ্টই বললেন, "পাণ্ডবদের রাজ্য গৌরব, বিরাট সম্পদ এবং এমন সমারোহে অনুষ্ঠিত রাজসূয় যজ্ঞ দেখে কার না গাত্রদাহ হবে?" (৭) কাজেই পাণ্ডবদের সর্বনাশ করতে তিনি নূতন চক্রান্ত করলেন।

মাতুল শকুনির সঙ্গে পরামর্শ করে ঠিক হল যুধিষ্ঠিরকে অক্ষক্রীড়ায় আমন্ত্রণ করা হবে; দুর্যোধনের পক্ষে শকুনি খেলবেন এবং যুধিষ্ঠিরকে হারিয়ে পণ হিসাবে তাঁর সর্বস্ব হরণ করবেন। মাতুল অক্ষক্রীড়ায় এমন দক্ষ যে তাঁর জয় সুনিশ্চিত। যদিও অক্ষক্রীড়ায় নিমন্ত্রিত হলে তা গ্রহণ করবার একটি রীতি সেকালের সমাজে প্রচলিত ছিল, তবু দুর্যোধনের ভয় ছিল যুধিষ্ঠির নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করতে পারেন। সেই সম্ভাবনাকে নির্মূল করবার জন্য দুর্যোধন পুত্রবৎসল পিতাকে দিয়ে বিদুর মারফত নিমন্ত্রণটি পাঠালেন। যুধিষ্ঠির বললেন, "দ্যূতক্রীড়ায় কলহ অনিবার্য, তাই আমার তা ভাল লাগে না। (৮) তবে যেহেতু আমন্ত্রণ পেয়েছি আমি তা গ্রহণ করব; আমার তাই ব্রত।" (৯)

সুতরাং দ্যূতক্রীড়া অনুষ্ঠিত হল। যুধিষ্ঠির হারলেন। পণ ছিল হারলে চার ভাই সহ তিনি দুর্যোধনের দাসত্ব স্বীকার করবেন এমন কি দ্রৌপদীও তাঁর দাসী হবেন। ভীম দ্রৌপদীকে পণের বিষয় করার জন্য যুধিষ্ঠিরকে ভৎর্সনা করলেন। কোনও ফল হল না। যুধিষ্ঠির পরাজিত হবার পর বিজয়ে উল্লসিত হয়ে দুঃশাসন দ্রৌপদীকে অন্তঃপুর হতে সভায় বলপূর্বক টেনে এনে লাঞ্ছিত করলেন। সবাই নীরব দর্শক হয়ে রইলেন, এমন কি পিতামহ ভীষ্মও প্রতিকারে অক্ষমতা জ্ঞাপন করলেন। প্রতিবাদ করলেন কেবলমাত্র দুর্যোধনের অন্যতম ভ্রাতা বিকর্ণ। তিনি বললেন, যেহেতু দ্রৌপদী পাণ্ডদের সাধারণী ভার্যা যুধিষ্ঠিরের

৮। কো বৈ দ্যূতং রোচতে বুধ্যমানঃ। ২।৫৮।১০

৯। আহূতোহহং ন নিবর্তে কদাচিৎ তদাহিতং শাশ্বতং বৈ ব্রতং মে। ২।৫৮।১৬

একা তাঁকে পণ করবার অধিকার নাই। (১০) শেষে এতখানি অনাচার ধৃতরাষ্ট্রের ভাল লাগল না। তিনি দ্রৌপদী সহ পাঁচ ভ্রাতার মুক্তি দিলেন।

দুর্যোধন দমবার পাত্র নন। তিনি একই কৌশল প্রয়োগ করে আবার পান্ডবদের অপসারণ করতে চাইলেন। এবার বিদুর, অশ্বত্থামা, ভূরিশ্রবা, ভীষ্ম এবং বিকর্ণ দ্বিতীয়বার দ্যূতক্রীড়ার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করতে ধৃতরাষ্ট্রকে অনুরোধ করলেন। কিন্তু পুত্রবৎসল পিতা সে অনুরোধ রাখলেন না, তিনি সম্মতি দিলেন। (১১) এবার ঠিক হল পান্ডবরা হারলে তাঁরা দ্বাদশ বৎসর নির্বাসন হবে; তার মধ্যে এগার বৎসর বনবাসে যাপন করতে হবে এবং শেষের এক বৎসর অজ্ঞাতবাস করতে হবে। যুধিষ্ঠির আবার হারলেন। কাজেই প্রতিশ্রুতি অনুসারে চার ভ্রাতা ও দ্রৌপদী সহ বনবাসী হলেন। যুধিষ্ঠিরের রাজ্য দুর্যোধন অধিকার করলেন।

পান্ডবদের বনে নির্বাসিত করেও যেন দুর্যোধনের ঈর্ষার দাহ নির্বাপিত হয় না। পান্ডবদের বনবাস জীবন কেমন কষ্টে কাটছে তা স্বচক্ষে দেখে উপভোগ করবার জন্য সদলে বনে শিকার করতে গেলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁর বিপদ ঘটল। এক গন্ধর্বের সহিত বিবাদের ফলে পরাজিত হয়ে তাঁর হাতে তিনি বন্দী হলেন। শেষে যুধিষ্ঠিরের সহায়তায় পান্ডবদের সাহয্যে মুক্ত হলেন। পান্ডবরা তখন দ্বৈতবনে বাস করছিলেন।

শেষে দ্বাদশ বর্ষ নির্বাসনের প্রতিশ্রুতি পালন করে ফিরে এসে যুধিষ্ঠির নিজের রাজ্য দাবী করলেন। দুর্যোধন সম্মত হলেন না। কৃষ্ণ মধ্যস্থতা করলেন, কিন্তু অবমানিত হয়ে ফিরে এলেন। ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারী দুর্যোধনকে তিরস্কার

১০। সাধারণী চ সর্বেষা। পাণ্ডবানাসীনিন্দিতা। ২। ৬৮। ২৩

১১। অকামানাং চ সর্বেষাং সুহৃদামর্থদর্শিনাম্।
অকরোৎ পাণ্ডবাহবানং ধৃতরাষ্ট্রো সুতপ্রিয়ঃ॥ ২। ৭৪। ২৭

১২। বনপর্ব দ্রষ্টব্য

করলেন। তাতেও ফল হল না। পিতা-মাতা সহ হিতাকাঙ্ক্ষীদের সকল অনুরোধ প্রত্যাখ্যাত হল। শেষে যুধিষ্ঠির আত্মীয়দের মধ্যে সংঘর্ষ নিবারণের জন্য পাঁচ ভ্রাতার ভরণ-পোষণের জন্য মাত্র পাঁচটি গ্রামের অধিকার চাইলেন। দুর্যোধন তাঁকে ভুল বুঝলেন, ভাবলেন যুধিষ্ঠির ভয় পেয়েছেন, তাঁর সৈন্য বল এবং প্রতিপত্তি তাঁকে সন্ত্রস্ত করেছে। (১৩) তাই আরও দৃঢ়তার সহিত সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন। সুতরাং কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের মধ্য দিয়েই পাণ্ডবদের ন্যায়সঙ্গত দাবীর মীমাংসা হল।

যুদ্ধের শেষ দিকে কর্ণের মৃত্যুর পর কৃপাচার্য দুর্যোধনকে সন্ধি করতে বললেন; কিন্তু তিনি সম্মত হলেন না। মনে হয় এইখানেই তিনি একবার মাত্র মহৎ বংশের ঐতিহ্যের প্রতি সম্মান দেখিয়েছিলেন। তিনি বললেন, দীর্ঘজীবন ভরে ত বহু ভোগ করেছি, এখন আর সন্ধি করে যুধিষ্ঠিরের দাস হয়ে থাকতে চাই না। (১৪)

সুতরাং উপরের বিশ্লেষণ হতে দেখা যাবে বাল্য হতে দুর্যোধনের আচরণ নিয়ন্ত্রিত হয়েছে একটিমাত্র উদ্দেশ্য দ্বারা: পাণ্ডবদের বিনাশ করা বা বিকল্পে সর্বস্বান্ত করা। তার প্রেরণা জুগিয়েছে তাঁর তীব্র ঈর্ষাবোধ। কাজেই তাঁকে 'মন্যুময় মহাবৃক্ষ' বলা অসঙ্গত হয় না।

অপরপক্ষে যুধিষ্ঠির তাঁর আচরণে আজীবন ন্যায়নিষ্ঠা ও উদারতা দেখিয়ে এসেছেন। এই প্রসঙ্গে কয়েকটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করা যেতে পারে। যৌবরাজ্যে অধিষ্ঠিত হবার পর দুর্যোধনের প্ররোচনায় ধৃতরাষ্ট্র যুধিষ্ঠিরকে বারণাবতে গিয়ে বাস করতে

১৩। যুধিষ্ঠিরঃ পুরং হিত্বা পঞ্চগ্রামান্ স যাচতি।
ভীতো হি মামকাৎ সৈন্যাৎ প্রভাবাচ্চৈব মে বিভোঃ ॥ উদ্যোগ পর্ব। ৫৫। ৩০

১৪। ভুক্তাশ্চ বিবিধা ভোগাস্তিবর্গঃ সেবিতো মরা
যুধিষ্ঠিরং কথং পশ্চাদনুযাস্যামি দাসবৎ ॥ শল্যপর্ব। ৪। ২৬

অনুরোধ করলেন। যুধিষ্ঠির আপত্তি করলেন না, তখনি সম্মত হলেন। বললেন, ধৃতরাষ্ট্র যখন নির্দেশ দিয়েছেন নিশ্চয় যাব। (১৫) সেখানে গিয়ে যখন আবিষ্কার করলেন তাঁদের মাতা সহ অগ্নিদগ্ধ করে মারার চক্রান্ত হয়েছে তখন নিরাপত্তার জন্য মাতা সহ ভ্রাতাদের নিয়ে আত্মগোপন করলেন।

দ্রৌপদীর সহিত বিবাহের পর ধৃতরাষ্ট্র যখন যুধিষ্ঠিরকে খাণ্ডবপ্রস্থের রাজপদে অধিষ্ঠিত করলেন, তখন তিনি অনুগত ভ্রাতৃগণের বীর্যবলে রাজসূয় যজ্ঞ অনুষ্ঠান করে এতখানি প্রতিষ্ঠা লাভ করলেন যে দুর্যোধনের তা অসহ্য হয়ে উঠল। তিনি যুধিষ্ঠিরকে অক্ষক্রীড়ায় আহ্বান করলেন। যুধিষ্ঠির সে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন। অনেকের ধারণা, তিনি অক্ষক্রীড়ায় অত্যন্ত আসক্ত ছিলেন বলেই নিমন্ত্রণ গ্রহণ করে নিজেদের সর্বনাশ ঘটিয়ে ছিলেন। কিন্তু যা তথ্য পাওয়া যায় তা এই অপবাদ সমর্থন করে না। প্রকৃত তথ্য হল এ খেলায় অভিরুচি না থাকলেও কর্তব্যবোধে তাতে বিপদ আছে জেনেও তিনি খেলতে সম্মত হয়েছিলেন। এ বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে গেছে অর্জুনের মন্তব্য হতে।

বনে যাবার অব্যবহিত পরেই পাশা খেলতে সম্মত হবার জন্য ভীম যুধিষ্ঠিরকে ভৎর্সনা করেছিলেন অর্জুন তখন এই বলে তার প্রতিবাদ করেছিলেন ক্ষত্রিয়ের কর্তব্য হল দ্যূতক্রীড়ায় আহূত হলে তা প্রত্যাখ্যান না করা। যুধিষ্ঠির সে কর্তব্য পালন করেছেন; তা মহৎ কীর্তিস্বরূপ। (১৬) সুতরাং দেখা যায় ক্ষত্রিয়ের ধর্ম পালন করতেই যুধিষ্ঠির দ্যূতক্রীড়ায় সম্মত হয়েছিলেন।

দ্বিতীয়বার অক্ষক্রীড়ায় পরাজিত হবার ফলে পাণ্ডবদের বনবাসে যেতে হল। তাঁরা প্রথমে দ্বৈতবনে বাস করতে গেলেন। ভীম কিন্তু এইভাবে বনবাসের শর্ত মেনে নেবার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ

১৫। তত্র যাস্যামো ধৃতরাষ্ট্রস্য শাসনাৎ। আদিপর্ব। ১৭৩। ১৫

১৬। আহূতো হি পরৈঃ রাজা ক্ষাত্রংব্রত মনুস্মরন্।
দিব্যতে পরকামেন তন্নঃ কীর্তিকরং মহৎ॥ সভাপর্ব। ৬৮।৯

করলেন। তিনি বললেন, ধর্মপথে নয়, ঋজুভাবে নয়, অক্ষের জালে ফেলে দুর্যোধন আমাদের রাজ্য হরণ করেছে। (১৭) আর তুমি ধর্ম ধর্ম করে এই ক্লীবের মত আচরণ বরণ করলে। (১৮) আমাদের উচিত কৌরবদের বিনাশ করে সমস্ত রাজ্য জয় করে নেওয়া। (১৯)

যুধিষ্ঠির তখন প্রত্যুত্তরে দৃপ্ত ভাষায় বললেন, তুমি জেনে রাখ, আমার প্রতিজ্ঞা ঃ আমি সত্যকে, ধর্মকে, অমৃত বা জীবন হতে বেশী মূল্য দিই ; রাজ্য, পুত্র, যশ, ধন—এরা ধর্মের কণামাত্রেরও সমান মূল্যবান নয়। (২০) যুধিষ্ঠিরের জীবনবেদ এমন স্পষ্টভাবে আর কোথাও ঘোষিত হয়নি।

বনবাস কালে দুর্যোধন যখন পান্ডবদের দুর্দশা স্বচক্ষে দেখে উপভোগ করতে গিয়েছিল তখন গন্ধর্বরাজ চিত্রসেনের সহিত তাঁর বিবাদ হয়। চিত্রসেন তাঁকে পরাজিত করে বন্দী করেন। তখন দুর্যোধনের অমাত্যগণ যুধিষ্ঠিরের শরণাপন্ন হন। ভীম তাঁদের প্রত্যাখ্যান করেন, কিন্তু যুধিষ্ঠির তাঁকে সংযত করেন। যুধিষ্ঠির বলেন, "জ্ঞাতিদের মধ্যে কলহ থাকে, তা বলে কুলধর্ম বর্জন করতে নেই। (২১) দুর্যোধনকে উদ্ধার না করলে আমাদের কুলধর্ম নষ্ট হবে"। যুধিষ্ঠির নিরাসক্ত ভাবে একান্তই ধর্মবুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত, এই মন্তব্য তা প্রমাণ করে।

তারপর আমরা বনপর্বের একেবারে শেষে ৩১৪ তম অধ্যায়ে আসতে পারি। সেখানে স্বয়ং ধর্ম যক্ষের ছদ্মবেশে তাঁর চার ভ্রাতার প্রাণ হরণ করে স্বয়ং যুধিষ্ঠিরকে নানা ভাবে তাঁর প্রজ্ঞা ও নৈতিক সচেতনতা সম্বন্ধে পরীক্ষা করেছিলেন। যুধিষ্ঠির সকল

১৭। ৩। ৩৩। ৬

১৮। ভবান্ ধর্ম ধর্ম ইতি সততং ব্রতকর্শিতঃ।
কচ্চিদ্ রাজন্ ন নির্বেদমাপন্নঃ ক্লীব জীবিকাম্ ॥ বনপর্ব ৩৩।১৩

১৯। ৩। ৫৩। ১৮

২০। ৩। ৬৪। ২২

প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর দেওয়ায় তিনি সন্তুষ্ট হয়ে যুধিষ্ঠিরকে বললেন তিনি পুরস্কার স্বরূপ চার মৃত ভ্রাতার একজনের প্রাণ ভিক্ষা করতে পারেন। যুধিষ্ঠির প্রাণ ভিক্ষা চাইলেন বৈমাত্রেয় ভ্রাতা সহদেবের, সহোদর ভ্রাতার নয়। তখন ধর্ম সন্তুষ্ট হয়ে দ্বিতীয় বর দিতে চাইলেন। উত্তরে যুধিষ্ঠির যে ব্রাহ্মণের অরণি-কাঠ হরণ নিয়ে এই ঘটনার সূত্রপাত তাঁর কাছে সেই অরণি ফিরিয়ে দেবার প্রার্থনা জানালেন। যক্ষ তখন নিজের প্রকৃত পরিচয় জানিয়ে তৃতীয় বর দিতে চাইলেন। উত্তরে যুধিষ্ঠির বললেন, 'আপনি যা দেবেন তাতেই আমি সন্তুষ্ট থাকব। তবে আমি চাই আমাকে বর দিন আমি যেন লোভ, মোহ ও ক্রোধ জয় করতে পারি এবং দান, তপস্যা ও সত্যে যেন আমার মন নিবন্ধ থাকে। (২২) যুধিষ্ঠিরের জীবনের আদর্শ কি ছিল তা এখানে বর্ণিত হয়েছে।

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের সর্বাত্মক ধ্বংসের পরিণতি দেখে যুধিষ্ঠির নিজেকে তার জন্য দায়ী মনে করলেন এবং সন্ন্যাসগ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। ভীম, অর্জুন, কৃষ্ণ এবং সর্বশেষে স্বয়ং ব্যাসদেবের উপদেশে সে ইচ্ছা ত্যাগ করে রাজ্যভার গ্রহণ করতে সম্মত হলেন। কর্তব্যবোধে তিনি নিরাসক্ত মন নিয়ে রাজপদে অধিষ্ঠিত হলেন।

মহাপ্রস্থানিক পর্বের শেষে দেখি পথে যেতে যেতে একে একে দ্রৌপদী, সহদেব, নকুল, অর্জুন ও ভীম পথেই মৃত্যু বরণ করলেন। কেবল যুধিষ্ঠির তার ধর্ম নিষ্ঠার জন্য সশরীরে স্বর্গে প্রবেশের অধিকার পেলেন। কিন্তু তিনি তাঁর পথের সঙ্গী কুকুরটিকে সঙ্গে না নিয়ে প্রবেশ করতে চাইলেন না। তিনি বললেন ভক্তকে ত্যাগ করে তিনি একা স্বর্গে যাবেন না। (২৩) যুধিষ্ঠিরের আশ্রিত-

---

২২। জয়েহ হং লোভ মোহৌ ক্রোধং চাহং সদা বিভো।
দানে তপসি সত্যে চ মনো মে সততং ভবেৎ ॥ ৩।৩১৩।২৪

২৩। ১৮।২।১২

বাৎসল্য কত গভীর ছিল সেই আচরণ তা দেখিয়ে দেয়।

সর্বশেষে স্বর্গারোহণ পর্বে তাঁকে আরও এক পরীক্ষা দিতে হয়েছিল। সেখানে তাঁকে দেখানো হল তাঁর ভ্রাতারা নরকে বাস করছেন। তখন তিনি বললেন, সেক্ষেত্রে তিনি স্বর্গে থাকতে চান না। তিনি বললেন, ভ্রাতৃগণ হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বর্গবাস অর্থহীন, যেখানে ভ্রাতারা আছেন তাঁর কাছে তাই স্বর্গ। (২৪)

সমগ্র মহাভারতে এইভাবে যুধিষ্ঠিরের আচরণে কোথাও হীনতা, নীচতা, স্বার্থপরতা বা শঠতা লক্ষ্য করা যায় না। তবে তার একটি ব্যতিক্রম আছে। কাহিনীটি দ্রোণপর্বের ১৮৯ তম অধ্যায়ে পাই। সেদিন যুদ্ধ করতে করতে ভীম অশ্বত্থামা নামে একটি হাতীকে মেরে অশ্বত্থামা হত হয়েছে বলে চিৎকার করতে লাগলেন। উদ্দেশ্য, দ্রোণকে শোকে অভিভূত করে নিস্তেজ করে দেওয়া যাতে ধৃষ্টদ্যুম্ন তাঁকে অরক্ষিত অবস্থায় হত্যা করবার সুযোগ পায়। সে কথা দ্রোণের কাণে গেলেও তিনি ঠিক বিশ্বাস করতে পারলেন না। তিনি বললেন, যুধিষ্ঠির যদি সে কথার সমর্থন করেন, তবেই তিনি তা বিশ্বাস করবেন; কারণ যুধিষ্ঠিরের স্থিতা বুদ্ধি, তিনি মিথ্যা বলবেন না।'

তখন যুধিষ্ঠিরের ওপর প্রচন্ড চাপ এল ভীমের রটনার সমর্থন করার জন্য। এমন কি কৃষ্ণ তাঁকে পীড়াপীড়ি করলেন এই বলে যে যুদ্ধে অসত্যভাষণ মার্জনীয়। যুধিষ্ঠির তখন বিবেকের তাড়না সম্পূর্ণ এড়াতে না পেরে বললেন 'অশ্বত্থামা হত' কিন্তু নিম্নস্বরে বললেন, 'সেটি গজ'। তাই 'অশ্বত্থামা হত হত ইতি গজ' কথাটি তাঁর কলঙ্ক স্বরূপ হয়ে চিরজীবী হল। মূলে আছে যুধিষ্ঠির আগে 'অশ্বত্থামা হত' বলে পরে অস্পষ্ট ভাবে বললেন, 'হতঃ কুঞ্জরস্ত'। (২৫) তার থেকেই বাংলা প্রবাদটির উৎপত্তি। সে যাই হক, এটি এক রকম অনৃত ভাষণ হয়ে

২৫। দ্রোণপর্ব। ১৮৯। ৫৫

দাঁড়ায় যা যুধিষ্ঠিরের মত ধর্মপ্রাণ মানুষের আদৌ শোভা পায় না।

কৃষ্ণ অবশ্য তাঁকে কলঙ্কমুক্ত করতে একটি নূতন তত্ত্ব স্থাপন করেছেন। তিনি বলেছেন, যেখানে মানুষ এমন বিপন্ন যে প্রাণ সংশয়ের অবস্থা সেখানে মিথ্যাভাষণকে মিথ্যাভাষণ গণনা করা যায় না। মূল শ্লোকটি এই ঃ

স ভবাংস্ত্রাতু নো দ্রোণাৎ সত্যাজ্জ্যায়োঽনৃতং বচঃ।

অনৃতং জীবিতস্যার্থে বদন্ সন দৃশ্যতেঽনৃতঃ॥ (২৬)

অর্থাৎ তুমি দ্রোণ হতে আমাদের রক্ষা কর। এখানে অনৃত বলা সত্যের থেকে শ্রেয় ; প্রাণরক্ষারজন্য অনৃত কথা বললে, তা অনৃত বলে মনে হয় না। কিন্তু তা হলেও যুধিষ্ঠিরের পক্ষে তা কলঙ্কস্বরূপ। তাঁর মহৎ চরিত্রে চাঁদের কলঙ্কের মত তা স্থায়ী হয় না।

এই কলঙ্কের অবলেপন সত্ত্বেও বলতে হয় যুধিষ্ঠির এক আদর্শনিষ্ঠ মানুষ। তিনি ক্ষত্রিয় হিসাবে, রাজা হিসাবে নিজের যা ধর্ম তা পালন করে এসেছেন। সুতরাং যুধিষ্ঠিরকে যে ধর্ম ময় মহাবৃক্ষ বলা হয়েছে তা যথার্থ হয়েছে।

২

বিভিন্ন চরিত্রের মহত্ত্ব

মূল চরিত্র যুধিষ্ঠির ব্যতীত মহাভরেতের কাহিনীতে আরও কতকগুলি চরিত্র আছে যাদের আচরণে ও আদর্শে ঐকান্তিক মহত্ত্ব লক্ষ্য করা যায়। এদের মধ্যে পড়েন পিতামহ ভীষ্ম, পাণ্ডব সখা কৃষ্ণ, দুর্যোধন সখা কর্ণ, দুর্যোধনের মাতা গান্ধারী এবং কৃষ্ণ

২৬। দ্রোণপর্ব। ১৮৯। ৪৭

সখা অর্জুন। তাঁদের সম্বন্ধে একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ে।

ভীষ্ম সত্যই একটি অতুলনীয় মহান চরিত্র। তিনি শান্তনুর পুত্র, বয়সে নবীন, নাম সত্যব্রত। পিতা দাসরাজ কন্যা সত্যবতীকে বিবাহ করতে ইচ্ছুক; কিন্তু সত্যব্রত প্রতিবন্ধক। তিনি রাজ্যের দাবী ত্যাগ করে আজীবন অবিবাহিত থাকবেন প্রতিজ্ঞা করে সে বিবাহে সত্যবতীর পিতার সম্মতি আদায় করে পিতার অভিলাষ পূর্ণ করলেন। তাই তাঁর নাম হল ভীষ্ম। পুরুবংশের সন্তান হয়ে পিতা পুরুর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করলেন। তাঁর আত্মত্যাগের ফলেই ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডুর রাজ্যলাভ। তারপর তাঁর দীর্ঘ জীবনের ব্রত হয়ে দাঁড়িয়েছিল পৌত্রদের মানুষ করা এবং তাঁদের জীবনকে যতখানি সম্ভব সদুপদেশ দিয়ে সত্য পথে পরিচালিত করা। এমন স্বার্থলেশহীন জীবন ত সংসারে বড় একটা দেখা যায় না।

কৃষ্ণকে আমরা দুই ভূমিকায় পাই। একটি পাণ্ডব সখার ভূমিকা, অন্যটি প্রাজ্ঞ দার্শনিকের ভূমিকা। প্রথমটি তাঁর ঐতিহাসিক ভূমিকা। সেখানে দেখি উভয় পক্ষ আত্মীয় হলেও যে পক্ষের দাবী ন্যায়সঙ্গত তার সমর্থন করছেন। সেখানে পাণ্ডবদের সাফল্যের পথে পরিচালিত করতে তিনি গভীর ধীশক্তির পরিচয় দিয়েছেন। অপরটি তাঁর দার্শনিক তথা অবতারের ভূমিকা। সে ভূমিকায় তিনি শুধু ভক্তিবাদের মধ্যমণিরূপে প্রতিষ্ঠিত নন, অতিরিক্ত ভাবে এক উৎকৃষ্ট দার্শনিকের ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। তাঁর প্রবর্তিত ভক্তি ও নিষ্কাম কর্মের পথে মুক্তিলাভ করার তত্ত্ব একটি উৎকৃষ্ট সমন্বয়ধর্মী দার্শনিক তত্ত্ব। তাই এ বিষয় সম্বন্ধে আলোচনার জন্য একটি সমগ্র অধ্যায় নিবেদিত হয়েছে।

কর্ণের কৃতজ্ঞতাবোধের তুলনা হয় না। তাঁর শৌর্য অপেক্ষা সুদিনে দুর্দিনে দুর্যোধনের প্রতি আনুগত্য একটি দুর্লভ দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্বে কৃষ্ণ এবং

কুন্তী উভয়েই তাঁকে পান্ডবদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পদের মর্যাদার লোভ দেখিয়েছিলেন। তিনি তা প্রত্যাখ্যান করবার সময় বলেছিলেন, 'মৃত্যু ভয়, অর্জুনের ভয় বা লোভের বশে তিনি দুর্যোধনের প্রতি অনৃত আচরণ করতে পারবেন না।' (২৭)

গান্ধারীর পতিব্রত্যের তুলনা হয় না। তিনি যখন শুনলেন তাঁর পিতা যাঁর সঙ্গে তাঁর বিবাহ দিচ্ছেন তিনি অন্ধ, তখন তিনি কাপড়ের পট্টী দিয়ে দুই চোখ বেঁধে দৃষ্টিশক্তির ব্যবহার হতে নিজেকে আজীবন বঞ্চিত করলেন।

অর্জুনের চরিত্রটি অনন্যসাধারণ। মহাভারতের বহু ক্ষত্রিয় বীরের উল্লেখ আছে যাঁরা শৌর্যগুণে কীর্তিমন্ডিত; কিন্তু অতিরিক্তভাবে অর্জুনের আরও বহু গুণ ছিল যা তাঁকে অতুলনীয় রূপে চিহ্নিত করেছে। অগ্রজ ভ্রাতা যুধিষ্ঠিরের প্রতি তাঁর আনুগত্যের তুলনা হয় না। তিনি প্রজ্ঞাধনেও ধনী ছিলেন। যুদ্ধের আরম্ভে যুধিষ্ঠির যখন যুদ্ধের ফলাফল ভেবে উদ্বিগ্ন হচ্ছিলেন, তিনি অগ্রজকে উপযুক্ত উপদেশ দিয়ে শান্ত করেছিলেন। তিনি যা বলেছিলেন তা তাঁর নিজের জীবনদর্শনের সুন্দর পরিচয় দেয়। তিনি বলেছিলেন, অধর্ম ও লোভকে বর্জন করে ধর্মের আশ্রয় গ্রহণ করলে জীবনে সাফল্য অনিবার্য; কারণ যেখানে ধর্ম সেখানেই জয়। (২৮)

অতিরিক্তভাবে মহাভারতের বিরাট কলেবরের মধ্যে নানা মনীষীর মুখে বহু প্রজ্ঞাবচন স্থাপিত হয়ে তাকে সমৃদ্ধ করেছে।

২৭। বধাদ্, বন্ধাদ্, ভয়াদ্‌বাপি লোভাদ্‌বাপি জনার্দন।
অনৃতং যোৎ সহে কর্তুং ধৃতরাষ্ট্রস্য ধীমতঃ ॥ ৫। ১। ৪১। ১৭

২৮। জ্ঞাত্বা ধর্মমধর্মঞ্চ লোভং চোত্তম মাস্থিতাঃ।
হুন্দধধবমন্নহংকারা যতো ধর্মস্ততো জয়ঃ ॥ ভীষ্মপর্ব। ২১। ১১

এই প্রসঙ্গে ব্যাস, মার্কণ্ডেয় এবং স্বয়ং কৃষ্ণের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। বনপর্বের এক বিরাট অংশ জুড়ে মার্কণ্ডেয় ঋষির নানা সারগর্ভ বাণী পাওয়া যাবে। অশ্বমেধ পর্বের আশ্রয়ে গীতার অতিরিক্তভাবে অনুগীতা নাম দিয়ে কৃষ্ণের নানা মন্তব্য পাওয়া যায়। তবে উৎকর্ষ গুণে তা গীতার ধারে কাছে যায় না। ব্যাসের নানা সারগর্ভ উপদেশও মহাভারতের সর্বত্র ছড়ান।

বনপর্বের একেবারে প্রান্তে ধর্ম যুধিষ্ঠিরের নিকট যে সকল প্রশ্ন স্থাপন করেছিলেন তার উত্তরে যুধিষ্ঠির যে মন্তব্যগুলি করেছিলেন সেগুলিও প্রজ্ঞা ও মনীষার দীপ্ত হয়ে অমূল্য বাণীর আকার নিয়েছে। এই অংশটি মহাভারতের মাহাত্ম্য রীতিমত বর্দ্ধিত করেছে। এই প্রসঙ্গে তার কিছু দৃষ্টান্ত স্থাপন করা যেতে পারে।

যুধিষ্ঠির কতকগুলি মূল্যবান কথা স্থাপন করেছেন এই শ্লোকে

মাতা গুরুতরা ভূমেঃ খাৎ পিতোচ্চতর স্তথা।
মনঃ শীঘ্রতরং বাতাচ্চিন্তা বহুতরী তৃণাৎ ॥ (২৯)

অর্থাৎ পৃথিবী হতে মাতার গুরুত্ব বেশী, আকাশ হতে পিতার উচ্চতা বেশী, বায়ু হতে মন দ্রুততর গতিসম্পন্ন এবং তৃণের সংখ্যা হতে মানুষের মনের চিন্তার সংখ্যা বেশী।

যুধিষ্ঠির আরও বলছেন,

পুত্র আত্মা মনুষ্যস্য ভার্যা দৈবকৃতং সখা।
উপজীবনঞ্চ পর্জ্জন্যো দানমস্য রপায়ণম্" ॥ (৩০)

অর্থাৎ, পুত্রই মানুষের আত্মা, ভার্যা দৈবস্থাপিত বন্ধু, অন্নের জন্য পর্জ্জনই আশ্রয় এবং পরমকীর্তি হল দান। পুত্র হতে যে পিতা অভিন্ন এই মন্তব্যে উপনিষদের বচনের প্রতিধ্বনি পাই।

২৯। বনপর্ব। ৩১২। ৬০ ০। বনপর্ব। ৩৩২। ৭২

কৌষীতকি উপনিষদে আছে 'আত্মা বৈ পুত্রনামাসি'। পত্নী যে দৈবকৃত সখা তা ভারি সত্য তথা সুন্দর কথা। বৃষ্টি না হলে যে উপবাস করতে হয় বর্তমান প্রযুক্তি বিদ্যার যুগেও তা সমান সত্য। আর দানে দুটি মহৎ গুণের সংযোগ ঘটে ঃ আত্মত্যাগ ও অপরের হিতৈষণা।

অন্যত্র যুধিষ্ঠির বলছেন,

মানং হিত্বা প্রিয়ো ভবতি ক্রোধং হিত্বা ন শোচতি।
কামং হিত্বার্থবান্ ভবতি লোভং হিত্বা সুখী ভবেৎ ॥ (৩১)

অর্থাৎ, অহমিকাবোধ ত্যাগ করলে প্রিয়তা অর্জন করা যায়, ক্রোধ বর্জন করলে পরে অনুশোচনা করতে হয় না, বাসনা ত্যাগ করলেই (অধ্যাত্ম সম্পদে) ধনী হওয়া যায় এবং লোভ ত্যাগ করলে সুখী হওয়া যায়।

যুধিষ্ঠিরের চূড়ান্ত প্রজ্ঞার নির্দেশ মিলবে ধর্ম যে চারটি প্রশ্ন সর্বশেষে উত্থাপন করেছিলেন তার উত্তরে যুধিষ্ঠির যা বলেছিলেন তার মধ্যে, চারটি প্রশ্ন হল এই ঃ

কোন মানুষ সুখী;
কোন ব্যাপারটি সব থেকে আশ্চর্যকর;
জীবনে চলার পথে কোন পথটি প্রশস্ত;
কোন বার্তাটি চূড়ান্ত বার্তা।

যুধিষ্ঠির একে একে এই প্রশ্নগুলির যে উত্তর দিয়েছিলেন তা বর্তমান আলোচনাকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করবার জন্য এখানে স্থাপিত হল।

প্রথম প্রশ্নের উত্তরে যুধিষ্ঠির বলছেন,

পঞ্চমেগৃহনি ষষ্ঠে বা শাকং পচতিভস্ব গৃহে।
অনৃণী চা প্রবাসী চ স বারিচর মোদতে ॥ (৩২)

ৎ দিনের পঞ্চম বা ষষ্ঠভাগে নিজের গৃহে শাক পাক করে

৩১। বনপর্ব ৩১২। ৭৮
৩২। বনপর্ব। ৩১২। ১১৫

ঋণমুক্ত হয়ে এবং প্রবাসজীবন বর্জন করে যে জীবনযাপন করতে পারে সেই সুখী। অল্পে তুষ্টি এবং আত্মনির্ভরশীলতাই সুখের উপায়।

দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে যুধিষ্ঠির বলছেন,

অহন্যহনি ভূতানি গচ্ছন্তীহ যমালয়ম্।
শেষাঃ স্থাবরমিচ্ছন্তি কিমশ্চার্যমতঃ পরম্॥ (৩৩)

অর্থাৎ :প্রতিদিন কত মানুষ মরছে, অথচ অন্যেরা অমরত্ব ইচ্ছা করছে। এর থেকে অধিকতর আশ্চার্যর বিষয় কি হতে পারে? এমন কঠোর সত্য এবং নির্ভুল উত্তর যে মুগ্ধ হয়ে যেতে হয়।

তৃতীয় প্রশ্নের উত্তর যুধিষ্ঠির বলছেন,

তর্কোহি প্রতিষ্ঠঃ শ্রুতয়ো বিভিন্না।
নৈকো ঋষির্যস্য মতং প্রমাণম্।
ধর্মস্য তত্ত্ব নিহিতং গুহায়াং
মহাজনো যেন গতঃ স পন্হাঃ॥ (৩৪)

অর্থাৎ তর্ক ত কোনও নিশ্চিত সিদ্ধান্তে পেঁাছে দেয় না, এমন কোনও ঋষি নাই যাঁর মতকে অভ্রান্ত বলে গ্রহণ করা যায়। ধর্মের রহস্য অতি গভীর। সুতরাং মহান মানুষ যে পথে গিয়েছেন সেই পথই জীবনে অনুসরণ করা কর্তব্য। এটি একটি অনুপম প্রজ্ঞাবচন যা একটি উজ্জ্বল হীরকখণ্ডের সহিত তুলনীয়।

শেষ প্রশ্নের উত্তর হল এই ঃ

অস্মিন্ মহাবমাহময়ে কটাহে
সূর্যাগ্ননা রাত্রিদিবেন্ধ নেন।
মাসতুর্ দবী পরিঘটনেন
ভূতানি কাল পচতীতি বার্তা॥

অর্থাৎ বার্তা হল এই যে এই মহা মোহময় (সংসার রূপ)

৩৩। বনপর্ব। ৩১২। ১১৬
৩৪। বনপর্ব। ৩১২। ১১৬ ৩৫। বনপর্ব। ৩১২। ১১৬

কটাহে সূর্যরূপ অগ্নি দিয়ে এবং ঘাস ও ধাতুরূপ হাতা দিয়ে মহাকাল জীবদের পাক করছে। একটি মৌলিক সত্যকে উপমার সাহায্যে এমন সুন্দর ভাবে প্রকাশ করা হয়েছে যে মুগ্ধ হতে হয়। প্রাণী আসে, প্রাণী বিকাশ লাভ করে, পরিণতিতে ধ্বংস হয়, আবার নূতন প্রাণী আসে। প্রাণী যায়, কিন্তু প্রাণধারা অব্যাহত থাকে। মহাকালের এই পাচনক্রিয়া চিরকাল চলে। এর থেকে মৌলিক বার্তা আর কি হতে পারে।

মহাভারতের আরও একটি বৈশিষ্ট্য তাকে রীতিমত সমৃদ্ধ করেছে। তার বিস্তৃত বক্ষে নানা বিষয়কে উপলক্ষ্য করে নানা উপাখ্যান ছড়ান আছে। তাদের চরিত্রগুলি যেমন মহৎ আদর্শে অনুপ্রাণিত তাদের মুখের বাণীও তেমন উচ্চনৈতিক আদর্শ দ্বারা উদ্ভাসিত এই প্রসঙ্গে আলোচনাকে সীমিত রাখবার জন্য মাত্র দুটি কাহিনীর এখানে উল্লেখ করা হবে ; সাবিত্রী ও সত্যবানের কাহিনী এবং নল ও দময়ন্তীর কাহিনী। উভয় কাহিনীই বনপর্বের অন্তর্ভুক্ত।

নলের উপাখ্যান বর্ণিত হয়েছে বনপর্বের ৫২ হতে ৭৯তম অধ্যায় জুড়ে। এখানে দময়ন্তীর নলরাজাকে স্বেচ্ছায় পতিত্বে বরণ এবং দুর্ভাগ্যপীড়িত হয়ে নল তাঁকে বনের মধ্যে একাকী পরিত্যাগ করে আত্মগোপন করলে কি কৌশলে দময়ন্তী তাঁকে অনুসন্ধান করে আবিষ্কার করলেন এবং তাঁদের পুনর্মিলন ঘটল, তা বর্ণিত হয়েছে। পতিপ্রেমে নিষ্ঠা এবং ঐকান্তিকতার এটি একটি অনবদ্য দৃষ্টান্ত। যে পুরুষ এমন ভার্যা লাভ করে তার মত সৌভাগ্যবান কেউ নয়। তাই বৃহদশ্ব যুধিষ্ঠিরকে এই কাহিনী শুনিয়ে বলেছিলেন যে দুঃখের প্রতিষেধক হিসাবে ভার্যার সহিত তুলনীয় কোনও ভেষজ নাই। তাঁর উক্তিটি এত মূল্যবান যে এখানে উদ্ধৃত হবার অধিকার রাখে ঃ

ন হি ভার্যাসমং কিঞ্চিদ্ বিদ্যতে ভিষজাং মতম্
ঔষধং সর্বদুঃখেষু সত্যমের ব্রবীমি তে ॥ (৩৬)

অর্থাৎ ভিষকদের মতে সকল প্রকার দুঃখ হতে মুক্তি দিতে ভার্যার মত ঔষধ নাই ; আমি ঠিক বলছি জেন। এই কাহিনী এক পাশ্চাত্য মনীষীকে মুগ্ধ করেছিল তা তাঁর মন্তব্য হতে বোঝা যাবে। তিনি বলেছিলেন যে এই কাহিনী এত নীতিগর্ভ এবং মর্মস্পর্শী এবং হৃদয়ের কোমল বৃত্তিগুলি কতখানি শক্তি ধারণ করে তার এমন সুন্দর পরিচয় দেয় যা বিশ্বের সাহিত্যে দুর্লভ। (৩৭)

সাবিত্রী ও সত্যবানের কাহিনী বিশ্ব সাহিত্যে একটি সম্মানের স্থান অধিকার করেছে। প্রেমে নারী কতখানি দুঃসাহস এবং একনিষ্ঠতার পরিচয় দিতে পারে এই কাহিনীতে তা দেখা যাবে। সাবিত্রী রাজার মেয়ে। সত্যবান বনে বিতাড়িত এক রাজার পুত্র। সাবিত্রী মনে মনে তাঁকে পতিত্বে বরণ করেছিলেন। পিতা কিন্তু তাঁদের বিবাহে আপত্তি জানালেন, এই কারণে যে সত্যবান অল্পায়ু হবেন বলে জ্যোতিষীরা ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। সাবিত্রী কিন্তু পিতার নির্দেশকে প্রত্যাখ্যান করলেন। এই প্রসঙ্গে তিনি যে মন্তব্য করলেন তা যেমন দৃপ্ত ভাষায় বর্ণিত হয়েছে তেমন প্রেমে একনিষ্ঠতার মহৎ আদর্শে অনুপ্রাণিত। তিনি বলেছিলেন,

দীর্ঘায়ুরথবা স্বল্পায়ুঃ সগুণো নিগুর্ণোঽপিব।
সকৃৎ-কৃতে ময়া ভর্তা ন দ্বিতীয়ং বৃণোম্যহম্ ॥ (৩৮)

অর্থাৎ দীর্ঘায়ু হক বা অল্পায়ু হক নির্গুণ হক বা গুণবান হক একবার যাকে পতিত্বে বরণ করেছি তার পরিবর্তে দ্বিতীয়কে বরণ করব না।

৩৭। বনপর্ব। ৬১। ২৯
৩৮। The Nala episod.

৩

মহাভারতের প্রতিকূল সমালোচনা

এই সব কারণে মহাভারত বিশ্বের বহু মনীষীর নিকট প্রশংসা পেয়েছে। । দুর্ভাগ্যক্রমে তার একটি উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম দেখা যায়। মার্কিন ভারততত্ত্ববিৎ ওয়াশবার্ণ হপকিনস তার মধ্যে অনেক দোষ পেয়েছেন। (৩৯)

হপকিনসের ধারণায় মহাভারতের মধ্যে কোনও নীতিগর্ভ প্রজ্ঞাবচন শোনাবার পরিকল্পনা নাই। এই প্রতিপাদ্যের সমর্থনে তিনি কতকগুলি যুক্তি স্থাপন করেছেন। প্রথমত, তিনি বলেছেন, নারীর বহুবিবাহ নিন্দিত হওয়া সত্ত্বেও মহাভারতের মূল আলোচনাটি সেই দোষে দোষী। দ্বিতীয়ত, তিনি একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করে দেখিয়েছেন যে মহাভারতে হিন্দু মহিলার মদ্য পান করে মত্ত হয়ে প্রকাশ্য স্থানে অশালীন আচরণে উৎসাহ দেওয়া হয়েছে এবং মাংস ভক্ষণ নিন্দনীয় হলেও তাতে উৎসাহ দেওয়া হয়েছে।

পাশ্চাত্য সংস্কৃতির পরিবেশে মানুষ হয়েও হপকিনসের এই বিষয়গুলি সম্বন্ধে এতখানি স্পর্শকাতরতার কেন উচ্ছ্বাস হল তা বোঝা যায় না। মহাভারতের বিভিন্ন চরিত্রকে আশ্রয় করে যে মহৎগুণগুলি আত্মপ্রকাশ করেছে তাদের প্রতি তাঁর দৃষ্টি আদৌ আকৃষ্ট হল না। তিনি যেন একচক্ষু হরিণের মত ব্যবহার করেছেন। গুণের দৃষ্টান্ত পরিহার করে দোষের প্রতি যেন তাঁর মন চুম্বকের মত আকৃষ্ট হয়েছে। শুধু তাই নয়, যে তথ্যগুলি তাঁর মন্তব্যের সমর্থনে ব্যবহার করেছেন দেখা যাবে সেগুলিও অভ্রান্ত নয়। নিন্দা করবার আগ্রহ তাঁকে এমনি একদেশদর্শী

৩৯। The Great Epic of India Washburn Hopkins, PP. 76—77

স্বরূপ সূর্যের কন্যার সূর্যার নাসত্য ভ্রাতৃদ্বয়কে বিবাহের দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা যেতে পারে। (৪৩) কাজেই দ্রৌপদীর পঞ্চস্বামী থাকা বৈদিক রীতির সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে। মহাভারতের পরিবেশ বৈদিক যুগের পরিবেশ।

৪

মহাভারতের মর্মকথা

বিভিন্ন কালে বিভিন্ন দেশে সামাজিক রীতির পার্থক্য থাকতে পারে ; কিন্তু তার অতিরিক্তভাবে মানসিক মহৎগুণ বলে একটি পৃথকবস্তু আছে। তা হল সত্যের প্রতি আনুগত্য। সত্য কথাটি রামায়ণ ও মহাভারতে একটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। ঋগ্‌বেদে এই প্রসঙ্গে দুটি শব্দ ব্যবহার করা হত 'ঋত' ও 'সত্য'। ঋত হল সুনীতির সমার্থবোধক, 'সত্য' হল অনৃতের প্রতিশব্দ অর্থাৎ যা মিথ্যা নয়। এই দুই আদিকাব্যে সত্য একাধারে ঋত এবং সত্য। তা যেমন ন্যায় সঙ্গত আচরণ বোঝায় তেমন প্রতিশ্রুতি পালন ও সত্যভাষণ বোঝায়। মহাভারতের বনপর্বে মার্কণ্ডেয় ঋষি তার একটি সুন্দর সংজ্ঞা দিয়েছেন 'যদ্ভূত হিতমত্যন্তং তৎ সত্যমিতি মে ধারণা।' (৪৪) অর্থাৎ যে আচরণ মানুষের আত্যন্তিক কল্যাণ সাধন করে তাই হল সত্য। সুতরাং অন্যায়ের প্রতিরোধ

৪৩। এই প্রসঙ্গে ঋগ্‌বেদের ১০ম মণ্ডলের ৮৫ সূক্তের উল্লেখ করা যেতে পারে। এটি বিবাহ সূক্ত নামেও পরিচিত। তা আছে সূর্যের কন্যা সূর্যার বিবাহ হয়েছিল অশ্বিভ্রাতৃদ্বয়ের সঙ্গে (৮ম ঋক্)। আরও আছে যে সোম তাঁর পাণিপ্রার্থী ছিলেন পিতা তাঁকে নাসত্য ভ্রাতৃদ্বয়ের হস্তে সম্প্রদান করেন (৯ম ঋক্)

৪৪। নবপর্ব। ২০৪। ৪ ৪৫। ভীষ্ম পর্ব। ২১। ১৩

করাও সত্য। সেই অর্থেই অর্জুন বলেছেন 'যতো ধর্মস্ততো জয়ঃ।' (৪৫) যে কর্মের প্রেরণা হিতৈষণ। তাই হল সত্যপালন। অত্যাচার, অন্যায় আচরণ প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ প্রভৃতি কাজ যে সত্য পালনের ব্রত গ্রহণ করেছে তা বর্জনীয়। এই পথেই রাম পিতার প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি পালন করে সত্যের প্রতি নিষ্ঠা দেখিয়েছেন। এই অর্থেই উপনিষদেয় বাণীতে ঘোষিত হয়েছে 'সত্যমেব জয়তে'। (৪৬) মহাভারতের বহু চরিত্রে সত্যপালনে অগণিত দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে। মহাভারতে নানা মনীষীর প্রজ্ঞাগর্ভ বচনে এই সত্যের প্রতি আনুগত্যের উপদেশ দেওয়া হয়েছে। সুতরাং মহাভারত সত্যই মহৎগ্রন্থ। মহাভারতের মর্মকথা যুধিষ্ঠির তাঁর জীবনে যে আদর্শ দ্বারা পরিচালিত হয়েছিলেন তার দ্বারাই ঘোষিত হয়েছে। বনবাস গমনের অব্যবহিত পরে ভীম যখন যুধিষ্ঠিরের নিকট অনুযোগ করলেন যে তিনি ধর্মের অজুহাতে ক্লীবের মত আচরণ করছেন, তখন প্রত্যুত্তরে যুধিষ্ঠির বলছিলেন তুমি জেনে রাখ আমার প্রতিজ্ঞা আমি সত্যকে ধর্মকে অমৃত বা জীবন হতে বেশী মূল্য দিই না। (৪৭) রাজ্য, পুত্র, যশ, ধন—এরা ধর্মের কণামাত্রেরও সমান নয়। (৪৭) যুধিষ্ঠিরের জীবন দর্শন এমন স্পষ্ট ভাবে আর কোথাও ঘোষিত হয়নি। ব্যাপক অর্থে সত্য বলতে যা বোঝায় মহাভারতের সুদীর্ঘ কাহিনীতে তারই মাহাত্ম্য ঘোষিত হয়েছে। তাই হল মহাভারতের মর্মবাণী।

সেই কারণে এই দুটি আদিকাব্যের ভারতীয় সমাজ জীবনে একটি মহৎ ভূমিকা পালন করা সম্ভব হয়েছে। ভারতের পুণ্য ভূমিকে জল দিয়ে শস্যসমৃদ্ধ করেছে দুটি বিশাল নদী; উত্তরে গঙ্গা ও দক্ষিণে গোদাবরী। বংশানুক্রমে এই নদীদ্বয় ভারতের

৪৬। মুণ্ডক। ৩।১।৬

মানুষকে ক্ষুধার অন্ন জুগিয়েছে। অনুরূপভাবে রামায়ণও মহাভারত বংশানুক্রমে ভারতের মানুষকে আধ্যাত্মিক পুষ্টি জুগিয়েছে। তারা একাধারে চিত্ত বিনোদনের উপায় এবং নীতি-শিক্ষার বাহন হয়ে সাধারণ মানুষকে সমাজশিক্ষার মৌলিক নীতিগুলির সহিত পরিচিত করেছে। তাই ভারতের সাধারণ মানুষ নিরক্ষর হয়েও সুনীতির সহিত সংযোগ হতে কোনও দিন বিচ্ছিন্ন হয়নি।

—ঃ ঃ—